খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়ক
এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক
এস, এম, ওয়াহিদুজ্জামান
বি.সি.এস (শিক্ষা)
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ৫১৯
শিক্ষাবর্ষ - ১৯৯৫-৯৬

GIFT

ফেলোশীপ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল)

Dhaka University Library
382790

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ফোন-৮৬১২০২৬ (বাসা)

তারিখ ঃ ০৩ পৌষ, ১৪০৭ বাং
১৭ ডিসেম্বর, ২০০০ ইং।

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এস, এম, ওয়াহিদুজ্জামান (রেজিঃ নং ৫১৯/১৯৯৫-৯৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে **"খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ঃ একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেননি।

এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

প্রফেসর এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

382790

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী 'পিতা'

ও

আমার স্নেহময়ী 'মাতা'কে

382790

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কোর্স বিন্যাস

গবেষণা শিরোনাম ঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় ঃ	ভূমিকা	১
	(গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা কাঠামো, গবেষণা শূন্যতা এবং পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণা সীমাবদ্ধতা)	
	পাদটীকা	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস	১৩
	ক) পাকিস্তান আমল	
	খ) বাংলাদেশ আমল	
	পাদটীকা	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	গণতন্ত্র উত্তরণের বিকাশ ধারা ও খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় আগমন	৩৮
	ক) '৮২র সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংকট	
	খ) গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত	
	গ) খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আগমন ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়া	
	ঘ) এরশাদের পদত্যাগ ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ	
	ঙ) পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ ঃ বিএনপির ক্ষমতায় আগমন	
	চ) পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভের কারণ	
	পাদটীকা	
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পদক্ষেপ	৭৬
	ক) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস	
	খ) সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তন	
	পাদটীকা	
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	খালেদা জিয়ার শাসনকাল ঃ সমস্যা ও সংকট	৯২
	ক) গোলাম আজম প্রসংগ	
	খ) সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব	
	গ) বিরোধী দলের সংসদ বয়কট, পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন	
	ঘ) উপ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তি	
	ঙ) ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯৬	

382790

Dhaka University Institutional Repository

চ) সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস
ছ) খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন
জ) খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল ঃ একটি বিশ্লেষণ
পাদটীকা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ খালেদা জিয়ার শাসনামল ঃ মূল্যায়ন ১৮৩
ক) অর্থনৈতিক গতিধারা (১৯৯১-৯৬)
খ) সংসদীয় কার্যক্রম (১৯৯১-৯৬)
গ) নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম
ঘ) খালেদা জিয়ার সরকারের পতনের কারণ
ঙ) প্রশ্নমালা বিশ্লেষণ

সপ্তম অধ্যায় ঃ ২৫০
ফলাফল
উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি ২৫৩

পরিশিষ্ট ঃ
পরিশিষ্ট -১ শেখ হাসিনার কাছে খালেদা জিয়ার লেখা দ্বিতীয় চিঠি
পরিশিষ্ট -২ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল
পরিশিষ্ট -৩ হরতাল, অসহযোগ আন্দোলনম, ধর্মঘট ও অবরোধ (১৯৯১-১৯৯৬)
পরিশিষ্ট -৪ রাজস্ব বাজেট (১৯৮৫-৮৬ - ১৯৯৫-৯৬)
পরিশিষ্ট -৫ সংসদে গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত বিলের বিবরণী
পরিশিষ্ট -৬ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার
পরিশিষ্ট -৭ প্রশ্নমালা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সূচি

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায় ঃ

সারণী ঃ ঃ নাই

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

সারণী ঃ ২.১ ঃ দ্বিতীয় গণ পরিষদের দলগত অবস্থান ১৫

সারণী ঃ ২.২ ঃ ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ ২১

সারণী ঃ ২.৩ ঃ ১৯৫৫ সালে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সংখ্যা ২১

সারণী ঃ ২.৪ ঃ পাকিস্তানে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবহার ১৯৪৭-১৯৭০ ২২

সারণী ঃ ২.৫ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দুই প্রদেশকে দেয়া গ্রান্টস ইন এইড ১৯৬০-১৯৬৮ ২৩

সারণী ঃ ২.৬ ঃ পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয় এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ২৩

সারণী ঃ২.৭ ঃ ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন প্রকৃতির সরকারের শাসনকাল ৩৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

সারণী ঃ৩.১ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় অবস্থান ৪৭

সারণী ঃ৩.২ ঃ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ মার্চ ১৯৮৮ এর ফলাফল বিবরণী ৫০

সারণী ঃ৩.৩ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভাগ ওয়ারী প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীর সংখ্যা ৬১

সারণী ঃ৩.৪ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনর ফলাফল ও দলীয় অবস্থান ৬১

সারণী ঃ৩.৫ ঃ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩ থেকে ৯১ ৬৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

সারণী ঃ ঃ নাই

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

সারণী ঃ ৫.১ ঃ মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল ১০৮

সারণী ঃ ৫.২ ঃ মাগুরা উপনির্বাচন পর্যন্ত বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের পরিসংখ্যান ১১১

সারণী ঃ ৫.৩ ঃ সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার (বিভিন্ন দেশের) ১৩৫

সারণী ঃ ৫.৪ ঃ জাতীয় সংসদে আসন শূন্য হওয়া সম্পর্কিত (বিভিন্ন দেশের) ১৩৬

সারণী ঃ ৫.৫ ঃ ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত সময়ে পালিত হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিসংখ্যান ১৭১

সারণী ঃ ৫.৬ ঃ ১৯৯১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহের পরিসংখ্যান ১৭২

সারণী ঃ ৫.৭ ঃ হরতালের সময় ও স্থানভিত্তিক পরিসংখ্যান ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা নং

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

সারণী ঃ ৬.১	ঃ সমষ্টিক অর্থনীতি নির্দেশিকা, আর্থিক বছর ১৯৮০-৯৬	১৮৬
সারণী ঃ ৬.২	ঃ এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও দঃ এশিয়ার কয়েকটি দেশের তিন বছরের প্রবৃদ্ধি	১৮৭
সারণী ঃ৬.৩	ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও এডিবি অর্থায়নে দেশীয় সম্পদের পরিমাণ	১৯০
সারণী ঃ৬.৪	ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১৯৮১/৮২-১৯৯৮/৯৯ পর্যন্ত	১৯২
সারণী ঃ৬.৫	ঃ বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি	১৯৩
সারণী ঃ৬.৬	ঃ বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার	১৯৪
সারণী ঃ ৬.৭	ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	১৯৬
সারণী ঃ৬.৮	ঃ সাতটি শিল্পোন্নত দেশ ও সাতটি উন্নয়নশীল দেশের (সার্কভুক্ত) মূল্য স্ফীতির হার	১৯৮
সারণী ঃ ৬.৯	ঃ ১৯৯১/৯২ - ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ	১৯৯
সারণী ঃ ৬.১০	ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সামাজিক খাতে বরাদ্দ	২০০
সারণী ঃ ৬.১১	ঃ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যা	২০২
সারণী ঃ৬.১২	ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি (১৯৯০-৯৯)	২০৩
সারণী ঃ ৬.১৩	ঃ জন্ম মৃত্যু হার ও স্বাস্থ্য সেবা ১৯৯০ ও১৯৯৫	২০৫
সারণী ঃ ৬.১৪	ঃ কৃষিঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি	২০৯
সারণী ঃ ৬.১৫	ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি উত্থাপিত ও পাশকৃত বিলে সংখ্যা	২১৪
সারণী ঃ ৬.১৬	ঃ প্রথম থেকে সপ্তম (১৯৯৯ পর্যন্ত) জাতীয় সংসদের কার্যাবলীর সারাংশ	২১৬
সারণী ঃ ৬.১৭	ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন ও প্রশ্নত্তোর	২১৯
সারণী ঃ৬.১৮	ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে বেসরকারী সদস্যদের কয়েকটি প্রস্তাবের নোটিশ ও গৃহীত ব্যবস্থা	২১৩
সারণী ঃ৬.১৯ থেকে সারণী ৬.৩৬ প্রশ্নমালা বিশ্লেষণ-		২৩৮-২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৩ টি রাজনৈতিক দল ৫টি পর্যায়ে এবং দু'টি সামরিক সরকার দুটি পর্যায়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত ছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার বি এন পি সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। স্বৈরাচার মুক্ত পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে খালেদা জিয়ার সরকার নব প্রেক্ষাপটে যে সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু করে ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। ঘটনা বহুল খালেদা জিয়ার শাসনকালের রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে অনেকের কাছেই আমি ঋনী হয়ে পড়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র কাছে যার ইচ্ছায় আমি এই গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে যাচ্ছি। আমার মরহুম পিতা যাকে আমি এই গবেষণা কার্যকালে হারিয়েছি। যার পরম স্নেহ উৎসাহ ও সহযোগিতায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পেয়েছি, আমি আমার জান্নাতবাসী সেই পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

গবেষণার কথা আসলেই যার নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় তিনি হলেন স্বনামধন্য সদালাপী শ্রদ্ধাভাজন বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ এম, নজরুল ইসলাম স্যার। যিনি আমাকে গবেষণার কর্মে আসার উৎসাহ যুগিয়েছেন অনুপ্রেরনা দিয়েছেন এবং গবেষণা কর্মের প্রতিটি পর্যায়ে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন। এই মহান শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর এম সাইফুল্লাহ ভুইয়া স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। যার সহযোগিতা পেয়েছি গবেষণার প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যতটুকু সময় ব্যয় করা প্রয়োজন তার চেয়ে ও অধিক সময় ব্যয় করেছেন তিনি আমার জন্য। যখন তখন সময় দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের এ উদার সহযোগিতা না পেলে এ গবেষণা আমার পক্ষে সমাপ্ত করা সম্ভব ছিল না। কেবল মাত্র গবেষণার ব্যাপারেই নয়, আমার এ গবেষণার সাথে জড়িত ছিল কিছু প্রশাসনিক কাজ কর্ম। আমি ছিলাম সরকার মনোনীত ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ফেলোশীপ প্রাপ্ত গবেষক। ফলে আমার প্রেষন মঞ্জুরী, স্কলারশীপ প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়কে বিরক্ত করতে হয়েছে অহরহ। কিন্তু তার অমায়িক ব্যবহারে আমি শুধু বিস্মিত হইনি, অনেক কিছুই শিখেছি। এমনি একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

বিভাগীয় শিক্ষক ফেরদৌস হোসেন স্যার এবং বাবু গোবিন্দ চক্রবর্তী আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দু'জন সিনিয়র গবেষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণার কাজকে অনকেখানি সহজ করে দিয়েছেন। এই দু'জন গবেষক জনাব আশরাফ উদ্দিন এবং জনাব অরুন কুমার গোস্বামী। আমি তাদের প্রতি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণার প্রথম পর্বে সাহপাঠী বন্ধুদের কাছ থেকে অজস্র সহযোগিতা পেয়েছি যার জন্য তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলোশীপ প্রাপ্তির পর প্রেষণ মঞ্জুরীর জন্য জামিনদার হয়ে আমার প্রাক্তন সহকর্মী খুলনা বি,এল কলেজ এর অধ্যাপক জনাব সুধীর কুমার বিশ্বাস আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কথা স্মরণ করেতে চাই। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাকে ফেলোশীপ প্রদান না করলে এই গবেষণা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। একই সাথে এই প্রতিষ্ঠানের দু'জন কর্মকর্তা জনাব হারুনর রশীদ এবং জনাব রেজাউল করিমের প্রতি ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমার প্রতিটি কাজে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করেছে।

গবেষণার কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ফিল, পি এইচ ডি, সেকশন ও একাউন্ট সেকশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতাও ছিল প্রশংসনীয়। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ছাড়াও আমি কেন্দ্রীয় পাবলীক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন নায়েম লাইব্রেরী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং সচিবালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের লাইব্রেরী সহ প্রভৃতি স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আকুন্ঠ সহযোগীতা পেয়েছি, আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করার জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিতর্ক সম্পাদক জনাব কামরুল ইসলামের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও গবেষণার শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই জনাব রফিকুল ইসলাম এবং প্রতিবেশী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী শিল্পীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণা কর্মটি সার্থক করে তুলতে একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে ১০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। উত্তরদাতাগণ ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সাথে এই দীর্ঘ প্রশ্নমালাটির উত্তর প্রদান করে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

পরিশেষে আমার পরিবারের কয়েক জন সদস্য বিশেষ করে আমার অগ্রজ এস এম মনিরুজ্জামান বাবুল যার উৎসাহ এবং সহযোগিতায় আজ আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আমার স্ত্রী সানজিদা খানমের উৎসাহ আগ্রহ, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা এ গবেষণা কর্ম দ্রুত সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। আমার দুই শিশু পুত্র সাদিদ আল ওয়াহিদ ও সাকিদ সাদনান, তাদের প্রতি ও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এ গবেষণার ১ম পর্ব পরীক্ষার পূর্বে সাদিদ (৪) যে ভাবে অভিভাবকের মত পড়া লেখায় উৎসাহ যুগিয়েছে যা সত্যিই আমার গবেষণার অগ্রগতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সাকিদ যার বয়স মাত্র এক বছর, যে শিশুটি আমাকে কাছে পাবার জন্য লেখার টেবিলের পার্শ্বে ঘুর ঘুর করে আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে ও আমার স্নেহও আদর থেকে সাময়িক ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তাই এদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো।

এস, এম, ওয়াহিদুজ্জামান
৩০ নভেম্বর, ২০০০ইং।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে খালেদা জিয়ার শাসনকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ নয় বছর সামরিক শাসনের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদের অধীন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেন। খালেদা জিয়ার এই ক্ষমতা পাওয়ার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ নয় বছরের আপোষহীন নেতৃত্ব ও সংগ্রামের ইতিহাস। কেননা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে বি এন পির কাছ থেকে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ যে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ছিল ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পি'র জয়লাভের মাধ্যমে হারানো সেই ক্ষমতা পুনরায় ফিরে পান। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি এন পি) এই ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পিছনে রয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব যা দলটিকে পুনরায় ক্ষমতা লাভে সাহায়তা করেছে। জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতালাভের পর প্রথমেই যে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হয় তা হল সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তন। যে সংসদীয় গণতান্ত্র ১৯৭৫ সালে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে কবর রচিত হয়ে ছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলের সর্বশেষ যে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হয়ে ছিল তাহলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে সংবিধানে সংযোজন। যদি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিরোধীদলের ব্যাপক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত স্বল্পস্থায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাধ্যমেই করা হয়েছিল। তবুও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে এবং গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছড়া ও ১৯৯১ এর ১৯ মার্চ থেকে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতি, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ গভীরভাবে পর্যলোচনা ও অনুসন্ধান করা হয়েছে এ গবেষণায়।

বিষয় বস্তুঃ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ যখন নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর পর থেকেই বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমুহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং বামপন্থী দল সমূহ (১৫ দল, ৭ দল জোট ভূক্ত হয়ে) এক যোগে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রথমে জেঃ এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারই নিয়োগকৃত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ, এফ, এম, আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে অপসারন করে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহন করেন। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে এরশাদ রাজনীতির কৌশল বিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলীর দর্শন অনুসরণ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রলোভনের মাধ্যমে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে ভাঙ্গন, নির্বাচনের টোপ নতুন রাজনৈতিক দল গঠন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিরোধীদলের আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেন। মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের অনৈক্যের কারণেই এরশাদ তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়াস পান। একজন স্বৈরশাসক হিসেবে এরশাদ তার ক্ষমতাকে ব্যবহার কাছেন নিজের ইচ্ছা মত। সংবিধানকে চার বার পরিবর্তন করে নিজের মত সাজিয়েছেন এত কিছু করার পরও এরশাদ ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেন নাই। ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বরের তিন জোটের রূপ রেখা[১] এরশাদের পতনের মাইল ফলক হিসাবে কাজ করেছে। তিন জোটের সম্মিলিত আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপনিলে এরশাদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ এরশাদের পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তিনজোটের রূপ রেখা অনুযায়ী ও প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে অস্থায়ী সরকারের প্রধান হলেন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। অস্থায়ী

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত নিরপেক্ষ নির্দলীয় সর্বদল মনোনীত অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার প্রধান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অধীন অনুষ্ঠিত এই ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ৭৫টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যদের অংশ গ্রহনে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৪০ টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখার জন্য এবং স্থিতিশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে বি এন পি কে নিঃশর্ত সমর্থন দেন, এর ফলে বি, এন, পি'র সরকার গঠন সহজ হয়ে পড়ে। ১৯ মার্চ (১৯৯১) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পার্লামেন্টারী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হলেও খালেদা জিয়া সরকার প্রধান ছিলেন না কারণ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্বাহী সরকার প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রপতি। ইতোমধ্যে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদীয় সরকারের দাবী তুলে। বি এন পি দলীয় গঠণতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থার পক্ষে ছিল। অবশ্য নির্বাচনের পূর্বে ২৮জানুয়ারী (১৯৯১) অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সমাবেশে বি এন পি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ভাষণে বলে ছিলেন, "(দেশের) সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে সংসদেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।"[২] তাই বিরোধী দলের দাবি এবং গণমতের প্রতি সম্মান জানিয়ে বি এন পি সংসদীয় গণতন্ত্রে সম্মত হলে ৬ আগষ্ট (১৯৯১) জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে সৈহাদ্য পূর্ণ পরিবেশে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস করে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তন করে সরকার পদ্ধতির প্রশ্নটি মিমাংসা করেন। তবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় গণভোট ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ১৯ সেপ্টম্বর (১৯৯১) থেকে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকরী হলে সেই দিনই বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে সরকার প্রধান হিসেবে পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহন করেন। সংসদীয় ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা লাভ করেন অক্টোবর (১৯৯১) রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহনের মধ্যদিয়ে।[৩]

ক্ষমতা গ্রহনের ১ বছর পরই খালেদা জিয়ার সরকার বিরোধী দল কর্তৃক জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকায় বিরোধী দলের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে নাই।

এরপর সরকার গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ও গণআদালত নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে আইনী লড়াইয়ে অবতীর্ন হন। পূর্বে গঠিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নামক সংগঠনের মাধ্যমে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার করা হয়, যা ছিল দেশের প্রচলিত আইন এবং সংবিধানের পরিপন্থী। গোলাম আযমের প্রশ্নটি আদালতের মাধ্যমে নিস্পতি হলো।

পরবর্তীতে মাগুরা -২ আসনের উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে বিরোধীদল ইতোপূর্বে বর্জন কৃত সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখেন। এবং পরবর্তীতে অবাধ ও নিরোপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবী জানিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকার এবং বিরোধী দলের এই সংকট নিরসনে কমনওয়েলথ মহাসচিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দুত স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনের মধ্যস্থতায় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে ২৮ডিসেম্বর (১৯৯৪) বিরোধীদলের সংসদ সদস্যগণ একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। স্পীকার কর্তৃক পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হলেও একাদিক্রমে ৯০ কর্ম দিবস সংসদে অনুপস্থিতির কারণে বিরোধীদলীয় ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হলে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় । রাজনৈতিক সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে বেশ কয়েকটি পত্র বিনিময় হয় এবং পাঁচ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সহ বিভিন্ন দুতাবাসের কুটনৈতিক বৃন্দ ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান কিন্তু বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সরকারের পদত্যাগ প্রশ্নে অনমনীয়তা প্রদর্শন করেন। সরকার সংবিধানের বাইরে বিরোধী দলের দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করে যার ফলে সংকট সমাধানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে বিরোধীদলের শূন্য আসনে উপনির্বাচন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নির্বাচন কমিশন প্রকৃতিক দুর্যোগ ও দৈব দুর্বিপাকের কারণে আরও ৯০ দিন উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় সীমা বৃদ্ধি করে নির্ধারিত সময়ে উপনির্বাচনের আয়োজন করেন। কিন্তু উপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ফলে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের আর

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন পড়ল না। পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার অব্যবহিত পূর্বে জাতির উদ্দেশ্য রেডিও টেলিভিশনের এক ভাষণে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'আসুন যে গণতন্ত্রের ধারা আমরা সুচনা করেছি তা বজায় রাখার জন্য সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মুক্ত মনে আলোচনা করি। সবাই মিলে দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থে আসন্ন নির্বাচনকে সফল করি গণতন্ত্রকে শক্তি শালী করি।"[৪] ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হলে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী তফসীল কয়েক বার পরিবর্তন করে সর্ব শেষ ১৫ ফেব্রুয়ারী(১৯৯৬) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। বিরোধী দলের দাবির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে পদত্যাগে সম্মত হন। সংবিধানের আওতায় সরকার এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়ে সরকারী দলের যে কোন একজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব ও করা হয়। "৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে '৯৫ এর শেষ সপ্তাহটিতে ক্ষমতাসীন দল তিন বিরোধী দলের সঙ্গে তত্ত্বধায়ক সরকার ও নির্বাচন প্রশ্নে সমঝোতায় পৌছতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালায়। সে সঙ্গে বিদেশী কুটনীতিকরা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও তৎপড়তা চালান"।[৫] কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। অবশেষে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ১৫ ফেব্রুয়ারী '৯৬ প্রধান প্রধান বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে ১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন "বিরোধী দল সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে রাজি হয়নি। ভবিষ্যৎ নির্বাচনে সব দলের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করার জন্য এই নির্বাচন" তিনি আরও বলেন, "সাংবিধানিক সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এই নির্বাচন।"[৬] ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের ১টি মাত্র অধিবেশন বসে এবং এর স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৪টি দিন।"[৭] বিতর্কিত এই স্বল্প স্থায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বহু প্রতিক্ষিত " তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল" পাস করা হয়। এই বিল পাসের মধ্যে দিয়ে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবি বাস্তবায়ন ঘটে। এই বিল পাশের পর পরই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ মার্চ (১৯৯৬) খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সংশোধিত সংবিধানের ৫৮গ(১) ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় বারের মত (সাংবিধানিকভাবে প্রথম বারের মত) ১২ জুন (১৯৯৬)৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আর একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বি এন পি'কে পরাজিত করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) এর সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়ার ৫ বছরের ঘটনা বহুল সরকারের পতন ঘটে। খালেদা জিয়া তার শাসনামলে বিরোধী দল কর্তৃক তত্ত্বধায়ক সরকার প্রশ্নে ব্যাপক গণ আন্দোলন সত্ত্বেও সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়নি। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। পদত্যাগের পর এ প্রসঙ্গে খালেদা জিয়া বলে ছিলেন", আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসে ছিলাম এখন জনতার দাবী মেনে নিয়েছি। গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার স্বর্থে সারে দাড়িয়েছি'।[৮]

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

উল্লেখিত গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল খালেদা জিয়ার শাসনামলে যে সমস্ত রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা অনুসন্ধান করা। কিন্তু গবেষণার মূল উদ্দেশ্য আলোচনার পূর্বে রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বুঝি সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারনত রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে একটি রাষ্ট্রের ইতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝায় যার মাধ্যমে একটি আধুনিক সমাজ কিংবা রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্যগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সাধিত হয় তাকেই বুঝায়। তাত্ত্বিকগণ আধুনিকীকরন এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখেন নাই। নিম্নে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্য থেকে রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যাবে।

James S. Coleman সম্পাদিত "Education and Political Development" গ্রন্থটি শুরু করা হয়েছে। "Education is the key that unlocks the door to Modernization",[৯] আধুনিকতার বন্ধ দরজা খুলে দেয়ার চাবি হল শিক্ষা। শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে উক্ত বইয়ে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "Education has acquired such high visibility in the developing Countries not only because it has been an important Criterian for political elite recruitment of the present generation and is regarded as the prime mover in economic growth, but also because it is, quite tautologically highly visible."[১০] উক্ত সংজ্ঞার আলোকে দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশে এলিট শ্রেণী তৈরীতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

Daniel Lerner এর " The passing of Traditional society" গ্রন্থের উদ্বৃতি দিয়ে S.P Huntington তার বই" Political Order in Chaging Societies"তে উল্লেখ করেন", The principal aspects of modernization, urbanization, industrialization, Secularization, democratization, education, media participation do not occur in haphazard and unrelated fashion."[১১] অর্থাৎ Lerner আধুনিকীকরণ বা রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নগরায়ন, শিল্পায়ন, সম্পাদায়িকতাকরণ, গণতন্ত্রায়ণ, শিক্ষা ও গণমাধ্যমে অবাধ অংশ গ্রহনের উপর জোর দিয়েছেন। এছাড়াও Hunytington তার উল্লেখিত গ্রন্থে আধুনিকায়ন তথা রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য Mobilization এবং Economic Development এর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, "Social Mobilization involves changes in the aspirations of individuals, groups, and societies, economic development, involves changes in their Capabilities Modernization requires both"[১২]

V.D. Mahajan তার Political Theory" গ্রন্থে Max Waber এবং Talcott persons এর অভিমত ব্যক্ত করে উল্লেখ করেন যে," Political development is intricately linked up with the legal and administrative order of the Community."[১৩]

Professor M. Sayefullah Bhuyan তার এক নিবন্ধে পুঁজিবাদী উন্নয়ন তাত্ত্বিকদের বিশেষ করে W. W. Rostow এবং অন্যান্যদের মত অনুযায়ী উন্নয়ন বলতে বুজিয়েছেন, development with growth measured insuch terms as GDP GNP or Per-Capita national income socio-economic development, in fact, encompasses a broader concept that trancends the narrow quantitative perspective"[১৪].

ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া তাঁর "সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপ রেখা" পুস্তকেও রাষ্টোর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। W.W.Rostow'র মতে" অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে পরেই রাজনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক উন্নয়ন মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলশ্রুতি"[১৫] একই পুস্তকে ডঃ ভূইয়া Philips Cutright রাজনৈতিক উন্নয়নের যে সমস্ত সূচক নির্ধারন করেছেন যে গুলো তুলে ধরেছেন। Cutright এর মতে,"রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণসংযোগের ব্যবস্থা, শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের সংখ্যা শ্রমিকদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ প্রভৃতির ওপর। অর্থাৎ কাটরাইট মনে করেন, রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল নিহিত রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর।"[১৬]

তবে রাজনৈতিক উন্নয়নের সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন Lucian W. Pye তাঁর Aspects of Political Development গ্রন্থে Pye রাজনৈতিক উন্নয়নের কোন সংজ্ঞা প্রদান না করে কতগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন," It may therefore be helpful to elaborate some of the Confusing meanings frequently associated with the expression "political

Dhaka University Institutional Repository

development.''[১৭] Pye বর্নিত বৈশিষ্ট্য সমূহ হলঃ[১৮]

1. Political Development as the political prerequisite of Economic Development.
2. Political Development as the politics Typical of Industrial Societies.
3. Political Development as political Modernization.
4. Political Development as the Operation of a Nation-state.
5. Political Development as Administrative and Legal Development.
6. Political Development as Mass Mobilization and participation.
7. Political Development as the Building of Democracy.
8. Political Development as stability orderly and Change.
9. Political Development as Mobilization and Power.
10. Political Development as one Aspect of a Multi-Di-mensional of Social Change.

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা Pye রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়িত সমাজের অনুরূপ রাজনীতি, রাজনৈতিক, আধুনিকীকরণ, জাতীয় রাষ্ট্রের কার্যকারিতা, প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়ন, গণসমাবেশ করণ এবং অংশ গ্রহন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকরণ, স্থিতিশীলতা ও সুশৃংখল পরিবর্তন, ক্ষমতা ও সমাবেশ করণ এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন।

তাত্ত্বিকদের উল্লেখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, James S Coleman রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলেছেন; Daniel Lerner নগরায়ন, শিল্পায়ন, গনতন্ত্রায়ন, শিক্ষা ও গণ মাধ্যমের উপর জোর দিয়েচেন; Huntington সামাজিক গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছেন; Rostow সহ অন্যান্যরা জাতীয় আয় বৃদ্ধিও আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা বলেছেন; এ ছাড়া ও Rostow অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রাজনৈতিক উন্নয়নের মাপ কাঠি ধরেছেন; ফিলিপ কাটরাইট শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শহরায়ন, প্রভৃতির কথা বলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর জোর দিয়েছেন। Lucian W. Pye অন্যান্যদের মতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়িত সামাজিক রাজনীতি, গণতন্ত্রায়ন, শৃংখলা পরিবর্তন, রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মে ব্যাপক অংশগ্রহন, সামাজিক পরিবর্তন সহ বিবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন।

অতএব রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিম্মলিখিত সিদ্বান্তে উপনীত হওয়া যায়, অর্থাৎ রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে বুযায়,

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
(খ) শিক্ষার প্রসার;
(গ) নগরায়ন;
(ঘ) শিল্পায়ন;
(ঙ) গণতন্ত্রায়ন;
(চ) স্থিতিশীলতা ও সুশৃংখল পরিবর্তন এবং
(ছ) সামাজিক পরিবর্তন।

রাজনৈতিক উন্নয়নের উল্লেখিত মানদন্ডের সাথে James S. Coleman W.W. Rostow. Philips Cutright, S.P. Huntington এবং L.W. Pye এর মতামতের সঙ্গে মিল রয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত মানদন্ড সমূহকে সামনে রেখেই আমাদের খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নকে পর্যালোচনা করতে হবে। অর্থাৎ খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখিত ক্ষেত্রে সমূহে অগ্রগতি সাধিত হলেই আমরা বলতে পারব উক্ত সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিরোধীদলের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করা সত্ত্বে ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজার ছিল। উল্লেখিত সময়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। শিক্ষায় সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষার বিনিময় খাদ্যকর্মসূচী উপবৃত্তি প্রকল্প এবং মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দারিদ্র বিমোচন ও দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিল্পায়ন নগরায়ন যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যৌক্তিক মাত্রায় উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান করে গণতন্ত্রায়নের পথ সুগম করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করলেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে স্থিতিশীল ও সুশৃংখল পরিবর্তনের সকল অন্তরায় দুর হয়েছে। এ ছাড়া ও মানব সম্পদ উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন , স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন যুব উন্নয়ন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত সময়ে মহিলা ও শিশু কল্যান নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে, প্রভৃতি আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়।

সুতরাং খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই উক্ত গংবেষনাকে অর্থবহ করতে হলে রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের বক্তব্য ও নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো সামনে রেখে গবেষণা করতে হবে।

১. বেগম জিয়া কি ভাবে ক্ষমতায় আসলেন এবং এর পিছনে তাঁর অবদান সমূহ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

২. ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এ সম্পর্কিত শাসনতাত্ত্রিক অগ্রগতি পর্যালোচনা আবশ্যক।

৩. বেগম জিয়ার শাসনামলে তিনি কি কি সমস্যায় সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই সমস্ত সমস্যা তিনি কিভাবে মোকাবেলা করেছেন তা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৪. খালেদা জিয়ার শাসনামলে প্রশাসনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন। এ প্রসঙ্গে খালেদা জিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৫. নির্বাচনী ওয়াদা অর্থাৎ নির্বাচন পূর্ববর্তী যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন তার কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছে এবং কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারে নাই এ বিষয়টি ও অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৬. খালেদা জিয়ার শাসনামলের উল্লেখ যোগ্য একটি ঘটনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গণতন্ত্র উত্তরনে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে সন্দেহ নেই। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৭. সংসদীয় গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের অপরিহার্য্য উপাদান। খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রে পূনঃ প্রবর্তনের পর বিগত ৫ বছরের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সংসদে গৃহীত ব্যবস্থাদির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

৮. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বে ও বেগম খালেদা জিয়া ৫ বছর ক্ষমতা ছিলেন। এই পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ ছিল হরতাল ধর্মঘট অবরোধ ও অসযোগ আন্দোলন। এ ব্যাপরে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

৯. সর্বোপরি খালেদা জিয়ার সরকারের পতনের পিছনে কি কি কারণ নিহিত ছিল তাও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

উল্লেখিত বিষয়ে ব্যাপক তথ্য অনুসন্ধান এর মাধ্যমে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রাজনৈতিক অগ্রগতির পর্যলোচনাই আমার গবেষনার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা কাঠামোঃ

আলোচ্য গবেষণাটিকে ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা রাখা হয়েছে। ভূমিকার মধ্যেই গবেষণার বিষয়-বস্তু; উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের মধ্যে রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক দিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ণ সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা শূণ্যতা বা পুস্তক পর্যালোচনা, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা এ অধ্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কারণ সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গভঙ্গ এবং লাহোর প্রস্তাবের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ কথা সত্য যে, পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না তাই পাকিস্তান সৃষ্টির পাশাপাশি পাকিস্তানের শাসনকালে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ৭০-এর নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধের উপরও সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সরকার গুলোর ওপর সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ সরকারে উপর এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এ অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হয়েছে কারণ পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে গণতন্ত্র উত্তরণের বিকাশধারা ও খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় আগমন শিরোনামে এ অধ্যায়ে খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আগমন দীর্ঘ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার ভূমিকা। তিন জোটের রূপ রেখা '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান এরশাদের পতন ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও খালেদা জিয়ার সরকার গঠনও এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে বিএনপি'র ক্ষমতার আগমনের কারণ সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

চতর্থ অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন ও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্য্যধারা তুলে ধরে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে খালেদা জিয়ার শাসনকালে যে সমস্ত সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ও গণ-আদালত প্রসংগটি আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও বিএনপি সরকারের মেয়াদ ১ বছর পার হওয়ার পর বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। বিরোধী দলের সংসদ বয়কট, গণ পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিরোধীদলের পঞ্চম জাতীয় সংসদে একাধিক্রমে ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে সৃষ্ট সাংবিধানিক জটিলতা নিরসনে সুপ্রীম কোর্টে রাষ্ট্রপতির পাঠান রেফারেন্স ও সুপ্রীম কোর্টের মতামত ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য ঘোষণা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এর প্রেক্ষাপট এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে উন্নয়ণের প্রধান অন্তরায় ছিল হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন। আমরা পত্রিকায় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় জানতে পারি খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিরোধী দল ১৭৩ দিন হরতাল পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে কতদিন হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে এবং যে সমস্ত কারণে এ গুলো সংঘটিত হয়েছে তার একটি বিবরণ পর্যালোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে খালেদা জিয়ার শাসনামলের ওপর সার্বিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সরকারের সার্বিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে। তাই অর্থনৈতিক গতিধারা পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সংসদীয় কার্যক্রমের উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ১৭৩টি সরকারী ও বেসরকারী বিল পরিশিষ্ট-৫এ দেয়া হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে দেয়া বিএনপি'র নির্বাচনী ওয়াদা বা Manifesto কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হয় নাই। তাও আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে খালেদা জিয়া সরকারের পতণের কারণ সমূহ ও আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে খালেদা জিয়া সরকারের ওপর একটি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে ১০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং

সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা শূণ্যতা এবং পুস্তক পর্যালোচনা ঃ

"খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন" শিরোনামে এ পর্যন্ত কোন গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়নি। এটি একটি সাম্প্রতিক বিষয়। বিভিন্ন লেখক কর্তৃক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু লেখা হলেও একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়নি। নিম্নে খালেদা জিয়ার সরকারের ওপর রচিত পুস্তক সমূহ পর্যালোচনা করলেই এ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রথমেই যে বইটি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই সেটি হল আবদুল মতিন রচিত "খালেদা জিয়ার শাসনকাল একটি পর্যালোচনা"। এ বইটি মূলতঃ একটি সমালোচনা ধর্মী পুস্তক। এ বইয়ে লেখক খালেদা জিয়ার শাসনামলের কয়েকটি বিষয়ের ওপর সমালোচনা মূলক নিবন্ধ ও ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন মাত্র। তিনি যে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন কোন কোন ক্ষেত্রে সে সমস্ত বর্ণনা অসম্পূর্ণ। তিনি খালেদা জিয়ার সরকারকে স্বৈরাচারের সাথে তুলনা করেছেন কিন্তু এর সমর্থনে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি উল্লেখ করেন, "সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রধান মন্ত্রীকে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছিল। বেগম জিয়া স্বেচ্ছাচারীর মতো সেই ক্ষমতা ব্যবহার করেন।"[১৯] তিনি মিরপুর এবং মাগুরা উপ-নির্বাচনের কথা আলোচনা করেছেন কিন্তু এই দুটি নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় সংসদের আরও ১৫টি আসনে উপ-নির্বাচন এবং চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নাই। তবে উক্ত বইয়ে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে; এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে, "১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস নোটে নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন জানাতে বলা হয়। বহু স্বাধীনতা বিরোধীকে নাগরিকত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও জনরোষের ভয়ে জেনারেল জিয়ার আমলে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। জেনারেল এরশাদের আমলেও এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।[২০]

দীনেশ দাস সম্পাদিত বেগম জিয়ার ৫ বছর বইটি খালেদা জিয়ার শাসনামলের উপর রচিত এটিও একটি সমালোচনা মূলক পুস্তক। এই বইয়ে তিনি খালেদা জিয়ার শাসনামলের কতিপয় দিক সমালোচনা করেছেন, কিন্তু উক্ত সমালোচনার পক্ষে তিনি কোন তথ্য সূত্র কিংবা প্রমাণ পত্র এমনকি উপযুক্ত কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। কাজেই উক্ত পুস্তককে কোন গবেষণা গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না এবং গবেষণা কার্য ব্যবহারও করা চলে না।

হাসানুজ্জামানের- 'নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা' বইটি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর পর সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তনের পরবর্তীতে রচিত। এ বইয়ে তিনি পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩টি অধিবেশনের কার্যক্রম সহ নব প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু সমস্যা এবং বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তরায় ও রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীর গণতান্ত্রিক আচার আচরণের উপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এ বইয়ের মাধ্যমে খালেদা জিয়া সরকারের রাজনৈতিক উন্নয়নের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

মোস্তফা কামাল রচিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা" পুস্তকে শেখ মুজিবের শাসন থেকে বর্তমান ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। ডায়েরী আকারে রচিত এ বইয়ে খালেদা জিয়ার শাসনকাল (১৯৯১-৯৬) শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সেখানে লেখক মূলতঃ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আন্দোলনের বিবরণ তুলে ধরেছেন মাত্র। খালেদা জিয়ার শাসনামলের রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করেন নাই।

এম.এ. ওয়াজেদ মিয়া রচিত-"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-কে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ" পুস্তকে ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সালের তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিবরণ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। উক্ত পুস্তকের একাদশ পরিচ্ছেদে "১৯৯১-৯২" সাল এ নির্দলীয় নিরপেক্ষ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের তত্ত্বাবধানে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে শেষাংশে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গটিও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে কিন্তু খালেদা

Dhaka University Institutional Repository

জিয়ার শাসনামলের পরবর্তী ঘটনাবলী বা সরকার সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ ধারণা এ পুস্তকে নেই।

এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া রচিত অন্য একটি পুস্তক "বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চাল চিত্র" এ পুস্তকে খালেদা জিয়ার শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি উক্ত পুস্তকে খালেদা জিয়ার গৃহীত বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় সংসদে সরকারী ও বিরোধীদলের নেত্রীদ্বয়ের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এই পুস্তকে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাস দমন আইনের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং এ আইন সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সন্ত্রাস দমন আইন সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তা তুলে ধরেন, "আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত এবং আমার হুকুম যদি পালিত হতো, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে সন্ত্রাস নির্মূল করতে পারতাম।"[২১] বিরোধীদলীয় নেত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী সন্ত্রাস দমন আইনের কোনো প্রয়োজন ছিলো না, প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব ছিল । বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঐ বক্তব্যের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। উক্ত পুস্তকে খালেদা জিয়ার শাসনের ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। উক্ত বিবরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় কিন্তু গবেষণা ধর্মী পুস্তক কিংবা গবেষণা কর্ম বলে বিবেচনা করা চলে না।

এস, আব্দুল হাকিম রচিত "আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়া" বইটি খালেদা জিয়াকে কেন্দ্র করে রচিত। এ বইয়ে খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে পদার্পণ সহ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের কিছু ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ বইয়ে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিকে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। একটি অধ্যায়ে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়ার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কিছু বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ। তাছাড়া লেখক তাঁর বর্ণনায় কোন তথ্য সূত্র উল্লেখ করেন নাই। তাই গবেষণা কর্ম হিসেবে এই বইটিও বিবেচনা করা যায় না। এছাড়া বইটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হওয়ায় খালেদা জিয়া সরকারের উপর চূড়ান্ত মূল্যায়ণ করা সম্ভব হয় নাই। তবে বইয়ের ভূমিকায় লেখক খালেদা জিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার মানসে তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বৈর শাসন আমলের শৃঙ্খলাহীন এবং ভঙ্গুর অর্থনীতিতে তিনি শৃংঙ্খলা ফিরিয়ে এনে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের উদ্যম অব্যাহত রেখেছেন।[২২] লেখকের এ মন্তব্যে বলা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বেগম জিয়া গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথ সুগম করে ছিল এবং খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনীতির গতিও ছিল উর্ধ্বমূখী।[২৩]

অতএব, উল্লেখিত পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, খালেদা জিয়ার শাসনের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্য পরিচালিত হয় নাই। যে সমস্ত পুস্তাকাদি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও অসম্পূর্ণ এবং তথ্য সমৃদ্ধ নয়। কাজেই খালেদা জিয়ার শাসনের ওপর একটি তথ্যনির্ভর গবেষণা একান্ত আবশ্যক। এর ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা পিপাসুদের গবেষণার খোরাক যোগান সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ভান্ডারকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

উল্লেখিত গবেষণা কার্যটি পদ্ধতিগত থেকে একদিকে যেমন অভিজ্ঞতাভিত্তিক, ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আবার অপরদিকে তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

অভিজ্ঞতা ভিত্তিক (Empirical Method) ঃ

মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কখনও লিপিবদ্ধ করা হয় না। অভিজ্ঞতা ব্যতীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহকে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method)ঃ

ইতিহাসের মধ্যেই মানুষের সাফল্যের সম্পূর্ণ যথাযথ ও অর্থপূর্ণ বিবরণ লাভ করা যায়। ইতিহাস শুধু কতগুলি ঘটনার বিবরণ মাত্র নয়। ইহা এমন সঠিক ও সংঘবদ্ধ বিবরণ যেখানে মানুষ ও ঘটনাবলীর একটি বিশেষ স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। [২৪] ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহই হচ্ছে ঐতিহাসিক পদ্ধতি। খালেদা জিয়ার শাসনকাল এখন ইতিহাস। কাজেই ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি এই গবেষণার প্রধান উপজীব্য বিষয়। কাজেই এ ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিকল্প নাই।

বর্ণনা মূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ঃ

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অনেক সমস্যা রয়েছে এবং এই সমস্যা সমূহ বেশ জটিল প্রকৃতির। আর এই সমস্যাকে অতিক্রম করতে হয় সরকারকে। সরকারের প্রধান হিসাবে খালেদা জিয়ার সরকারকেও নানা সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার প্রকৃতি, কারণ, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সরকারের ঐ সব সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ এবং এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব। আলোচ্য গবেষণায় তাই বর্ণনা মূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

ক) প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)ঃ

গবেষণা কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৌলিকভাবে গৃহীত উপাত্ত সমূহকে প্রাথমিক উপাত্ত বলা হয়। অর্থাৎ যে উপাত্ত সংগ্রহের পর প্রকাশিত কোন গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলা হয়। আলোচ্য গবেষণা কর্মে প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা উক্ত বিষয়ের উপর এখনও পর্যাপ্ত গবেষণা প্রকাশিত হয় নাই। তাই তথ্য সংগ্রহের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত তৎকালীন ঘটনাবলী বিশেষ করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে তথ্যাবলী জানা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও উপাত্ত সংগ্রহ সহজতর হয়েছে। এছাড়াও গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী একটি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে অসংখ্য ব্যক্তির কাছ থেকে উত্তর আহ্বান করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির দু'টি দিক যা গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশ্নমালাটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যার মধ্য থেকে উত্তরদাতা যে কোন একটি উত্তর বেছে নিতে পারে। পক্ষপাতিত্ব এড়ানোর জন্য একটি 'খালি ঘর' বা 'অন্য কারণ' রাখা হয়েছে। কিছু প্রশ্নে একটি উত্তর না চেয়ে সাম্ভাব্য উত্তর থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েকটি পছন্দ করতে বলা হয়েছে।

খ) মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources)ঃ

উল্লেখিত গবেষণাটি একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত বিধায় প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে সকল উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে কোন গবেষণা কার্য সম্পাদন করলে বা কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হলে ঐ প্রাথমিক উপাত্ত কিংবা প্রকাশিত গবেষণা থেকে কোন উপাত্ত অন্য কোন গবেষণায় ব্যবহৃত হলে তাকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে। আলোচ্য গবেষণায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেল প্রকাশিত পুস্তাকাদি এবং কখনও কখনও কোন গবেষণা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ

আলোচ্য গবেষণার সীমাবদ্ধতা অনেক। সদ্য সমাপ্ত একটি সরকারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। কেননা খালেদা জিয়ার সরকারের উপর এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় নাই। যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে সে গুলো দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত। গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত কোন প্রকাশনা নেই বললেই চলে। তাই এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের প্রধান উপাদান দৈনিক ও সাপ্তাহিক

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা সমূহ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। নিরপেক্ষ পত্রিকা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। অধিকাংশ পত্রিকাই তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধা মতাবলম্বী হওয়ায় সরকারের সমালোচনাকেই বেশী করে তুলে ধরেছে। কেবলমাত্র দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক ইনকিলাব সরকার সমর্থক পত্রিকা। কিন্তু উক্ত পত্রিকা দু'টিও এক পেশে বিধায় এ পত্রিকা দুটি থেকে ব্যাপক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহে বিরত থেকেছি, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী দৈনিক ইনকিলাব থেকে কিছু তথ্য নেয়া হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা কিছুটা নিরপেক্ষ হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে উক্ত পত্রিকার ধারাবাহিকতা ছিল না। অর্থাৎ এক মাসের পত্রিকা পাচ্ছিতো আর এক মাসের পাচ্ছি না। ফলে আজকের কাগজকেই তত্ত্ব সংগ্রহের প্রধান উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছি। আজকের কাগজ সরকারের সমালোচনা করলেও সরকারের উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলীও তুলে ধরেছে। তাছাড়া খালেদা জিয়ার সরকারের উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত হয়েছে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আজকের কাগজ পত্রিকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উপর ব্যাপক তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাহলো কিছু কিছু অসাধু পাঠক/গবেষক পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পাতা চুরি করে ছিড়ে নিয়েছে যার ফলে অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। লাইব্রেরীর রেফারেন্স সেকশন থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই অশিক্ষিত। প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তত্ত্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক উত্তর দাতা উত্তর প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছে। কারণ গবেষণা কর্মে সহায়তা করা যে নৈতিক দায়িত্ব একথা তারা উপলব্ধি করতে পারেন নাই। তাছাড়া প্রশ্নের ভাষা ও অর্থ অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অবোধগম্য বলে তারা সঠিক তত্ত্ব দিতে অপারগ। তাই কেবল মাত্র শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের উপরই সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়েছে।

খালেদা জিয়ার সরকারের উপর একটি মৌলিক গবেষণা হিসেবে হরতালের উপর একটি প্রতিবেদন দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণার ৫ম অধ্যায়ে। হরতাল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বেশ বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়েছে। কারণ বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্রিকায় হরতালের তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। হরতালের কারণ সম্পর্কেও কখনও কখনও কোন পত্রিকা সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। হরতালের আওতা (ব্যাপী) ও কারণ ও ছিল বহুবিধ যেমন, দেশব্যাপী, রাজধানী কেন্দ্রীক বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায়, পৌরসভা কেন্দ্রীক এমনকি থানা পর্যায়ও হরতাল ডাকা হয়েছে। তাই এই বিভিন্ন প্রকার হরতাল সম্পর্কে সঠিক তথ্যটি বের করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। থানা, পৌরসভা, এমনকি জিলা পর্যায়েও কিছু কিছু গৌন হরতালকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তবে জাতীয় এবং বিভাগীয় হরতাল সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য দেয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরও যে ত্রুটিমুক্ত প্রতিবেদন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

মাগুরা উপ-নির্বাচন ছিল সরকার পতনের একটি টার্নিং পয়েন্ট এবং তত্ত্বধায়ক সরকার দাবীর প্রধান ইস্যু। সেই মাগুরা উপ-নির্বাচন সম্পর্কে তত্ত্ব সংগ্রহ করতে গিয়েও বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়েছে। তৎকালীন সরকার সমর্থক পত্রিকায় মাগুরা উপ-নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ অস্বীকার করে নির্বাচন সুষ্ঠ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সরকার বিরোধী পত্রিকা সমূহে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। তাই এ সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও বেশ কঠিন ছিল।

একটি সরকারের ওপর সুষ্ঠভাবে গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সচিবালয় ও জাতীয় সংসদ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু উক্ত দুটি স্থানে সর্ব সাধারণের প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও আনুষ্ঠানিকতা থাকায় প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও সরকারের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে উক্ত দুটি স্থান থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নাই।

পেশাগত দিক থেকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে ফেলোশীপ প্রাপ্তিতে কোন সমস্যা না হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের ব্যবহারে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে।

আমার এ গবেষণা কার্যকালে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দিক থেকে কিছু সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিলাম যার ফলে যথাসময়ে গবেষণা কার্য সমাপ্ত করতে পারি নাই। প্রথমতঃ আমার পুত্র উক্ত সময়ে কঠিন অসুখে ভুগতে থাকায় দেশের সকল পর্যায়ে চিকিৎসা শেষে তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে প্রেরণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতার অসুস্থতা এবং পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুতে দীর্ঘদিন গবেষণা কার্য স্থগিত থাকে। এছাড়াও আমার এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারিত না থাকায় অনেক সময় রাতের বেলা তথ্য সংগ্রহে যেতে হতো, আবার কখনও কখনও তথ্য সংগ্রহ শেষে রাতের বেলায় বাসায় ফিরতে হতো। একদিন (সেপ্টেম্বর, ২০০০) রাত ৯ টায় তথ্য সংগ্রহ শেষে বাসায় ফেরার পথে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে একটি মূল্যবান ঘড়ি ও সঙ্গে থাকা টাকা পয়সা অস্ত্রের মুখে ছিনতাইকারীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে সঙ্গে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট গুলো আমাকে ফেরত দিয়ে যথেষ্ট উপকার করেছে। দেশের আইন শৃঙ্খলা যে কতটা ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়।

সর্বোপরি বলা যায় একটি সরকারের ৫ বছরের কর্মকান্ডকে এই ক্ষুদ্র পরিসরে স্থান দেয়া সত্যিই বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক বিষয় এড়িয়ে যেতে হয়েছে। আবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারি নাই।

পাদটীকা

প্রথম অধ্যায়

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকাঃ ২০নভেম্বর-১৯৯০ইং।
২. এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৬১।
৩. মোস্তফা কামাল, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা*, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃঃ ১০৮।
৪. *আজকের কাগজ*, ঢাকাঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৯৫ইং।
৫. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকাঃ ২৪ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৫ জানুয়ারী, ১৯৯৬ইং পৃঃ ২২।
৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকাঃ ২৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ইং, পৃঃ ১২।
৭. মোস্তফা কামাল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৭।
৮. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকা, ৩১ মার্চ, ১৯৯৬ইং।
৯. James S. Coleman [Edited] *Education and Political Development*, NewJersey: Princeton, Princeton University Press, 1965, P-3.
১০. *Ibid*, P-5.
১১. Samuel P. Huntington, *Political Order in Chinging Societies*, New Haven and London: Yale University Press, 1968, P-32.
১২. Ibid, P-34.
১৩. V.D. Mahajan, *Political Theory*, New Delhi: Pub: S. Chand & Company Ltd, 1988, P.218.
১৪. Sayefullah Bhuyan, *Under development of Bangladesh: An Analysis of Socio-Economic Policy Implication*, Journal of The Asiatic Society of Bangladesh (Humanatics) vol. 35 No. 2, December 1990, P-11.
১৫. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপ রেখা*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো (দ্বিতীয় প্রকাশ) ১৯৯৮, পৃঃ ২৩
১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২
১৭. Lucian W. Pye, *Aspects of Political Development*, Boston: Little, Brown and Company, 1966, P-33.
১৮. *Ibid*, P-33-44.
১৯. আব্দুল মতিন, *খালেদা জিয়ার শাসনকালঃ একটি পর্যালোচনা*, ঢাকাঃ র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ ইং, পৃঃ-৪০।
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬০।
২১. এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র*, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৭ইং, পৃঃ ৯৭।
২২. এস,আব্দুল হাকিম, *আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়া*, ঢাকঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৪ইং (ভূমিকা)
২৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে *অর্থনৈতিক গতিধারা (১৯৯১-৯৬)* উপাধ্যায়ে।
২৪. নাজমির নুর বেগম, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, ঢাকাঃ নলেজ ভিউ, (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯৮৪ইং, পৃঃ-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এই দেশের জন্ম। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর থাকলেও এদেশের গণতন্ত্র আজও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নাই। তবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সংগ্রাম অবিরত চলছে। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পেলেও একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবেই বাংলাদেশের পরিচয়। এদেশের ভাষা দিবস আজ "বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে রয়েছে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি। তাইতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আমাদের একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এক সময় বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ফলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করলে ও সত্যিকারের স্বাধীনতা আসেনি। পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর(২৬ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতা দিবস) বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের ফলে কার্যত স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হলেও প্রকৃত পক্ষে " ১৭৬৩ সালে বক্সারের রণ ক্ষেত্রে মীর কাসিমের পরাজয়ের ফলে বাংলায় বৃটিশদের রাজনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত হয়। অবশ্য মেকি নবাবী শাসন ১৭৯০ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। কিন্তু কনর্ণওয়ালিস (১৭৯০-১৭৯৩) প্রশাসনিক ও আইনগত সংস্কার দ্বারা এই নাম মাত্র নবাবি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনকে একটি সুশৃঙ্খল ও প্রথা বদ্ধ রূপ দান করেন।" [১] ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার না থাকলেও ১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ নাগরিক এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম এর প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীকার আন্দোলনের পথ সুগম হয়েছিলে। কংগ্রেসের পথ ধরে ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় দু'টি সম্প্রদায় হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথকভাবে স্বাধীকার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভুমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ শাসনামলে 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে এমন দুটি ঘটনা হল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯৪০ সারের লাহোর প্রস্তাব। মূলতঃ ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসমকে নিয়ে যে প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, আসাম ব্যতীত সেই পূর্ব বাংলাই আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনগন বিশেষ করে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়ে ছিলো। "বঙ্গভঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমান এলিট গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে দু'টি গুনগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলো। শিক্ষিত মুসলমানরা এই বিভক্তিকে স্বাগত জানায়। কারণ এই পদক্ষেপ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অনেক সুবিধার পথ সুগম করেছিলো। অন্যদিকে শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকে যথার্থই আশংকা করেছিলেন যে এ বিভক্তির কারণে তাদের সুযোগ সুবিধার ক্রম সংকোচন ঘটবে।" [২] এরই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে। ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে পূর্ব বাংলার জনগণের আশার প্রদীপকে নিভিয়ে দিয়েছিলো। তাই ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর মন্তব্য করেন, "বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবেচনায় অবহেলিত পূর্ব বঙ্গের জন্য এটা মঙ্গল জনক ও সম্ভাবনাময় প্রকল্প ছিল মনে হয়। শিল্প-বানিজ্য ও শিক্ষা দীক্ষায় এই অঞ্চলের বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়" [৩] বঙ্গভঙ্গের রদের মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ বিশেষ করে মুসলিম জনগণের এই উপলব্ধি জাগে যে হিন্দু নেতৃবর্গ বা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসবেনা। তাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং নিজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে অবিরত সংগ্রাম করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান সৃষ্টি ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে লাহোর প্রস্তাবকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। বলা হয়ে থাকে যে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। ১৯৪০

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (২৭তম বার্ষিক সম্মেলন) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির মূল বক্তব্য হলো - " ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল সমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হবে। এই প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন তৎকালীন বাংলার মূখ্য মন্ত্রী এ.কে ফজলুল হক এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেন উত্তর প্রদেশের চৌধুরী খালেকুজ্জামান"।[৪] এই প্রস্তাবের ফলে পূর্ব বাংলা একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়েছিলে। কিন্তু পরবর্তীকালে এ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে নাই। এক পর্যায়ে সমগ্র বাংলা এবং আসামকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ প্রসংগে "হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাসিম প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতারা বাঙ্গালি হিন্দু মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। এই প্রয়াসের অন্য দু'জন শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণ শংকর রায়। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশ সরকারের বিভেদ নীতি, মুসলিম লীগের বিরোধীতা প্রভৃতি কারণে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৫] ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীর এ্যাংলো অ্যারাবিক কলেজে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের সভায় এক পাকিস্তান প্রস্তাব করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর প্রস্তাবে বলেন, " Whereas the Muslims are Convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope soverign independent state comprising Bengal and Assam in the North East zone and the Punjab, North-West Frontier Provinces, Sind and Baluchistan in the North West Zone."[৬] সোহরাওয়ার্দীর এই প্রস্তাবের ফলে ১৯৪০ সালে গৃহিত লাহোর প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়। লাহোর প্রস্তাবে " States of Pakistan" বা একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়ে ছিলো। কিন্তু এই প্রস্তাবের মাধ্যমে "States " শব্দ পরিবর্তন করে " State" শব্দ ব্যবহার করে একটি মাত্র রাষ্ট্র 'পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

" ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন উপমহাদেশের তৎকালীন বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন এক ঘোষনায় জেলা ওয়ারীভাবে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দু'টোকে ভাগ করে ভারত ও তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্গত হিসেবে চিহ্নিত করেন।"[৭] এই ভাবে দেখা যায় যে ৩রা জুনের পরিকল্পনা এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের সূত্র ধরে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট সৃষ্টি হলো পাকিস্তান নামক এক অদ্ভুত রাষ্ট্র যার দু'টি অংশ ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্নই ছিল না দুই অংশের জনগোষ্ঠির মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিগত বৈপরিত্য ছিল বিস্তর। পাকিস্তান সৃষ্টি সম্পর্কে শরিফ-আল-মুজাহিদীর উদ্বৃতি দিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর লেখা তুলে ধরেন রওনক জাহান তাঁর বইয়ে, "Pakistan was established on the premise that Indian Muslims needed a separate state, where" They could rule according to their own cultural growth tradition and Islamic laws."[৮]

ক) পাকিস্তান আমল ঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাঙ্গালীরা রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার স্বপ্ন দেখতে ছিলো। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণের সে আশা কখনও বাস্তবে রূপ লাভ করে নাই। ঐতিহাসিকভাবে একথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাস্তবায়নে পূর্ব বাংলার মানুষের অবদান অপরিসীম। মুসলিম লীগের সৃষ্ট ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক অন্ধকারচ্ছন্ন পরিবেশ বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র। একমাত্র ধর্মীয় ঐক্য ছাড়া পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মানুষের মাঝে কোন ক্ষেত্রেই মিল ছিলনা। "নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক জীবন ধারায় পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল পাকিস্তানীদের চেয়ে ভিন্ন"।[৯] এই ভিন্নতার কারণেই পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠির জাতীয় সংহতি গড়ে উঠে নাই। আর এই জাতীয় সংহতির অভাবই ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার প্রধান কারণ।

শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলেও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান কোন সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে নাই। সংবিধান প্রণয়ন করতে না পারার পিছনে রয়েছে পূর্ব বাংলাকে কিভাবে রাজনৈতিকভাবে

শোষনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। " ১৯৫৬ সালের মার্চে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অন্তবর্তী সংবিধান হিসেবে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী দেশ শাসিত হতো।" [১০] ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত গণপরিষদ ১৬টি অধিবেশন বসে এবং এই ১৬টি অধিবেশনের মোট স্থায়িত্বকাল ছিল ১২১ দিন। [১১] "১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ অধ্যষিত পূর্ব বাংলার গণপরিষদের কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি।"[১২] পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তিনটি মূলনীতি কমিটি গঠিত হলেও কোন কমিটির রিপোর্টই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে খুশি করতে পারে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে বাঙ্গালীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও ভাষার প্রশ্নকে সম্পূর্নভাবেই উপেক্ষিত করা হয়েছিল। তৃতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে সংখ্যা সাম্য এবং বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। এই তৃতীয় মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সংবিধান প্রনয়নে বাঙ্গালীদের যদিও আপত্তি ছিলনা তবে এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ করে পাঞ্জাবে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে এই রিপোর্ট ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন এবং পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে এক অধ্যাদেশ বলে পূর্ব বাংলা থেকে ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন সহ মোট ৮০ জন সদস্য নিয়ে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। "১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের 'মারী'তে গণপরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। এই অধিবেশনে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পাঁচ দফা সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হন।" [১৩] মারী চুক্তি নামে খ্যাত ঐ পাঁচ দফার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়েছিলো।

'মারী' চুক্তির পাঁচটি বিষয় ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশ থাকবে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট ও পূর্ব পাকিস্তান এক ইউনিট হিসেবে পরিগনিত হবে।

২. দু'টি প্রদেশ হবে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত এবং কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করবেন।

৩. সরকার পরিচালনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় সমূহে দুই অঞ্চলের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

৪. কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যে আসন সংরক্ষণ না করে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত হবে।

৫. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু।

সারণী ঃ ২.১

দ্বিতীয় গণপরিষদের দলগত অবস্থান

পাকিস্তান আইন পরিষদ ১৯৫৫-৫৬

রাজনৈতিক দল	আসন সংখ্যা
মুসলিম লীগ	২৬
ইউনাইটেড ফ্রন্ট	১৬
আওয়ামী লীগ	১৩
নূন গ্রুপ	৩
পাকিস্তান কংগ্রেস	৪
তফসিলী ফেডারেশন	৩
ইউপিপি	২
স্বতন্ত্র মুসলিম	১
অন্যান্য	১২
সর্বমোট	৮০

সূত্রঃ M. Nazrul Islam, *Pakistan and Malaysia A compertive study in National Integrantion*, New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, 1989, Page-130 (Table iv : 4)

Dhaka University Institutional Repository

মারী চুক্তির উল্লেখিত সমঝোতা দলিলের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হয়, তবে এই সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে। এই সংবিধানেও পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা করা হয়। শাসক গোষ্ঠী মুসলিম লীগ সংবিধানে অগণতান্ত্রিক পন্থায় ইউনিট পদ্ধতি চালু করে পূর্ব বাংলার স্বার্থহানি করার চেষ্টা করেছে। পূর্ব বাংলা নামকেও বিসর্জন দিয়েছিল এবং বাঙ্গালীদের পাকিস্তানী হতে বাধ্য করেছিল। অথচ পূর্ব বাংলার 'বাংলা' নাম ছিল বাঙ্গালীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সার্থে সামঞ্জস্য পূর্ণ, পূর্ববাংলার 'বাংলা' নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করলো। কিন্তু দীর্ঘ আট বছর পর পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা জনগোষ্ঠী যে সংবিধান পেয়েছিল, সেই সংবিধান পুরোপুরি কার্যকরী না হতেই ১৯৫৮ সালে আইউব খানের সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিলো ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। সামরিক শাসন জারি করে আইউব খান প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করে দীর্ঘ এক দশকের ও বেশী সময় পাকিস্তানের রাজনীতিতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হিসেবে অবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে জেনারেল আইউব খান ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে কেবল মাত্র স্থগিত বা অস্বীকারই করেন নাই, পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে শাসন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে এমন এক সংবিধান প্রণয়ন করেন যার মূখ্য ব্যক্তিত্ব আইউব খান। '৬২ সালের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইউবকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যা পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রপতির হাতে ছিলনা। ডঃ এম নজরুল ইসলাম তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "It was a constitution of Ayub, by Ayub and for Ayub"[১৪] ১৯৬২ সালের জুন মাসে গৃহীত আইউবের সংবিধানের মূল ভিত্তি ছিল ' মৌলিক গণতন্ত্র" (Basic Democracy)নামে এক অভিনব গণতন্ত্র। আইউবের এই গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যে পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ নির্বাচক মন্ডলী নির্বাচন করা হয় যারা মৌলিক গণতন্ত্রী নামে খ্যাত। ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারী এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সারা পাকিস্তানে ইউনিয়ন স্তরে উক্ত ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে ছিলো। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরাই আইউবের সংবিধান ও ক্ষমতার মূল উৎস। উক্ত মৌলিক গণতন্ত্রীরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি সহ জাতীয় পরিষদের জন্যে ১৫৬ জন সদস্য (পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৭৮+৭৮) নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছিল। আইউবের সৃষ্ট এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী এক গণভোটের মাধ্যমে আইউব খানকে পাঁচ বছরের জন্যে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ম্যান্ডেট দিয়েছিলেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আইউব খান কখনও আস্থাশীল ছিলেন না। পেশাদার রাজনীতিবিদদের তিনি কখনও বিশ্বাস করতেন না। রাজনৈতিক দলাদলিকে তিনি সব সময় ঘৃণার চোখে দেখতেন। "এভাবে দেশ থেকে রাজনীতি উচ্ছেদ করে আইউব শুরু করবেন তাঁর সামরিক একনায়কত্ব। রাজনৈতিক দলের স্থান দখল করল সামরিক বাহিনী, সেনা অধ্যক্ষরা হলেন রাজনৈতিক নেতাদের বিকল্প"। [১৫] আইউব খান রাজনীতি, গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের প্রতি আস্থাহীন থাকলেও ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক শাসন অবসানের পূর্বেই এপ্রিল মাসে জাতীয় সংসদ ও মে মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। উক্ত নির্বাচনে আইউব খানের সহযোগী ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সহ কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বরা উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নাই। এর পর ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইউব খান কনভেনশন মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক হিসেবে নিজের ক্ষমতাকে সংহত করেন। ক্ষমাতাকে স্থায়ী করার জন্য আইউব খান রাজনৈতিক চাতুরতার আশ্রয় নিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেন নাই। ৬ দফা দাবি নিয়ে যখন বাঙ্গালীরা দুর্বার স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি তুলে তখন প্রহসন মূলক আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে বাঙ্গালী রাজনীতিবিদদের দমন করার যে কৌশল নিয়ে ছিলেন তাতে সফলকাম হন নাই। যার পরিনতিতে শুরু হয়েছিল গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৮ সালে গড়ে উঠা ঐ গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৯৬৯ সালে। গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ফিল্ড মার্শাল আইউব খান বিদায় নিলেন। ইয়াহিয়া খান পুনরায় পাকিস্তানে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক শাসন জারি করলেন। গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা ইয়াহিয়ার আশ্বাসে আশ্বাস্ত হতে পারছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া খান LFO (Legal Frame work order) এর অধীনে ১৯৭০ এর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঙ্গালীদের আশ্বস্ত করেছিলেন। দেশে প্রথমবারের মত সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে অনুষ্ঠিত ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতার দাবিদার হন। ইয়াহিয়া খান গণরায়কে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাঙ্গালীদের দমন করার চেষ্টা করেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে বাঙ্গালীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া এক অবধারিত যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের শাসনাধীনে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ ঃ

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিলো। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানীদের কখন ও রাজনৈতিক অধিকার ছিলনা বললেই চলে। অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র ও ছিল বিচিত্র। ভাষা এবং সাংস্কৃতির দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তান মুক্ত ছিল না, সেখানে ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের আগ্রাসন ব্যপৃত ছিল ব্যাপকভাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কখনও জাতীয় ঐক্য বা সংহতি গড়ে উঠে নাই। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠা ও সম্ভব ছিলো না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের কখন ও সমকক্ষ জাতি হিসেবে ভাবতে পারে নাই। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এই শোষণের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পূর্ব পাকিস্তানীদের ওপর যে বৈষম্য মূলক আচরণ করেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

রাজনৈতিক শোষণ ঃ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত কয়েকটি প্রাদেশিক পার্লামেন্ট এবং একটি জাতীয় পার্লামেন্ট থাকলেও এদের কোন ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল।[১৬] আবার পাকিস্তানীদের শাসনাধীনে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক অধিকার দিতে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কখন ও প্রস্তুত ছিলেন না। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে পুর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক শাসিত হয়েছে। এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের উক্ত ২৩ বছরে যে ৬ জন রাষ্ট্র প্রধান দেশ শাসন করেছে তাদের মধ্যে ৪জনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং যে ২জন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করে ছিলেন তারাও মনে প্রানে পূর্ব পাকিস্তানী ছিলেন না।[১৭] আবার উক্ত ২২ বছরের মধ্যে আইউব খানের শাসন ছিল অর্ধেক সময় জুড়ে। অন্য ৫ জন করেছেন বাকী অর্ধেক সময়। অন্য দিকে অর্ধেকের ও বেশী সময় দেশে গণতন্ত্রের ছায়ামাত্র ছিল না, সামরিক শাসনাধীনে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বজায় ছিলো। ২ জন সামরিক শাসক মিলে পাকিস্তানের দুই তৃতীয়াংশ সময় শাসন করেছে। এক তৃতীয়াংশ ছিল বেসামরিক শাসন। পাকিস্তানের প্রথম দশকের এই বেসামরিক শাসনামলে দেখা যায় ৭ জন সরকার প্রধানের মধ্যে ৩ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। উক্ত ৩ জনের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যতীত বাকী ২ জন অর্থাৎ খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মোহম্মদ আলী বগুড়া কখন ও বাঙ্গালীদের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে আসেন নাই। ১৯৪৭ সারের ১৪ আগষ্ট থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ঐ সাত জন সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় ছিলেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, একজন প্রধানমন্ত্রী গড়ে ১ বছরের কিছু বেশী সময় ক্ষমতায় ছিলেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানিদের শাসন ক্ষমতায় প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই নগন্য।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেখা গেল মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষার পরিবের্তে পশ্চিম পাকিস্তনের স্বার্থ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন এবং মুসলিম লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবর্গ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী তাই পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ দেখল যে মুসলিম লীগের মত রাজনৈতিক সংগঠন দিয়ে পূর্ব বাংলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া মুসলিম লীগ ছিল একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। তাই বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে " ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

এক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ"। [১৮] প্রথম কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী। অপর দিকে ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের নূরুল আমীন বিরোধী গ্রুপটি এ, কে, ফজলুল হকের সাথে মিলে "কৃষক শ্রমিক পার্টি" গঠন করেন। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নামের সাথে মিল রেখে এই নতুন নামকরণ করা হয়। [১৯] এই দল গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় লীগের আধিপত্য খর্ব হয়।

যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন ১৯৫৪ ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল ১৯৫১ সালে। কিন্তু পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে শাসক গোষ্ঠীর অনীহাই ছিল এর মূখ্য কারণ। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনের জয়লাভের ব্যাপারে আশাবদী ছিল কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের সমন্বয়ে নির্বাচনী মোর্চা 'যুক্ত ফ্রন্ট' গঠনের মাধ্যমে মুসলীম লীগের সে আশা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশন দুটি কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ এই অধিবেশনে সর্বসম্মতি ক্রমে সমমনাদের নিয়ে ঐক্য বদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়ত ঃ এই অধিবেশনেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত ঐতিহাসিক '২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো' অনুমোদিত হয়। যুক্ত ফ্রন্ট মূলতঃ চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। দল চারটি হলো- আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নেজাম-এ-ইসলাম এবং হাজি দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আওয়ামী লীগের এই নির্বাচনী মোর্চা গঠন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে কৌশলগত পদক্ষেপ। ঐ সময় বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাওলানা ভাষানী সংশ্লিষ্ট দল গুলির একটি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী মোর্চা গঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পারন করেন। [২০] যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের ফলে শাসক গোষ্ঠী মুসলিম লীগের ভীত নড়বড়ে দূর্বল হয়ে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে ফ্রন্টের পক্ষে পূর্ব বাংলার জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। যুক্তফ্রন্টের যে ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা হয়েছিল তার মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা সহ পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল ফলে এই একুশ দফার ভিত্তিতে বাঙ্গালীরা পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দেয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। নির্বাচনী প্রচারনায় যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের শোষণের চিত্র, অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র, রাজনৈতিক অধিকার হরণের চিত্র, ভাষাকে কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র, পশ্চিম পাকিস্তানীদের দমন পীড়নের চিত্র এবং সর্বোপরি মুসলীম লীগের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। রওনক জাহান তার বইয়ে নির্বাচনী মেনিফেস্টো ২১ দফা সম্পর্কে মন্তব্য করেনযে, "Still it was a significant document, insofar as it was accepted by all the opposition groups and it contained the salient points on which a consensus was reached by the Bengali counterelite."[২১]

নির্বাচনী ফলাফলে বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্খার চিত্র ফুটে উঠে ছিল কিন্তু সেই আকাংখা খুব দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে নাই। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের কারণে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভাবনীয় সাফল্য লাভ করে। আইন পরিষদের ৩০৯ টি আসমের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট একক ভাবে ২২৩ টি আসন ল্যভ করে।[২২] অন্য দিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। মূখ্য মন্ত্রী নূরুল আমীন সহ মন্ত্রী সভার অধিকাংশ সদস্য পরাজয় বরণ করেন। শেরে বাংলা এ,কে,এম ফজলুল হক দু'টি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর ২ এপ্রিল (১৯৫৪) যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় এ,কে, ফজলুল হককে পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচন করা হয়। ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার

Dhaka University Institutional Repository

শপথ গ্রহন করে। অবশ্য মে মাসের মাঝামাঝি আওয়ামী লীগের দলীয় সদস্যদের মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভূক্তির মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ণতা লাভ করে। পাকিস্তান স্বাধীনতার প্রায় ৭ বছর পর পূর্ব বাংলার ক্ষমতা বাঙ্গালীদের হাতে অর্পিত হলেও এই ক্ষমতা খুব দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে নাই। কেন্দ্রের মুসলিম লীগ সরকার যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে কখনও মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই এবং এই সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করতে থাকে। ইতিমধ্যে নারায়নগঞ্জের আদমজী জুট মিলস্ এবং চট্টগ্রামের চন্দ্র ঘোনা পেপার মিলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙ্গালী ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাতময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এতে বহু শ্রমিক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রী সভাকে বাতিল ঘোষনা করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করে।[২৩] এবং সমগ্র পূর্ব বাংলায় জরুরী অবস্থা গোষণা করেন। পূর্ব বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। মাত্র দু'মাসের ও কম সময়ের এই সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলা এক দিকে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর উপর যে চপেটাঘাত পড়ে ছিলো তার প্রতিশোধ তারা ভালভাবেই নিতে পেরেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্তের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীদের আবারও বোদোধয় হলো যে, পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর অধীনে বাঙ্গালীদের রাজনৈতিক অধিকার কখনও ফিরে পাওয়া সম্ভব নয় এবং বাঙ্গালীদের আত্ম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অবিরত করতে হবে। তাই একথা বলা যায় যে বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তীতে পাকিস্তানীদের নিষ্ঠুর আচরণ এক মাইল ফলক হিসেবে কাজ করেছে।

আইউব খানের সামরিক শাসন ঃ

১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র শুরু হয়ে ছিল ঠিকই কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল ছিলো না। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সারের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তানে ৪ জন প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসন করেছিলো। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্র বজায় ছিলো কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে যে গণতন্ত্রের সূর্য অস্তমিত হয়ে ছিলো পাকিস্তানের বাকী জীবনে আর সে সূর্য উদিত হয় নাই। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে আইউব খান দীর্ঘ ১০ বছরের ও বেশী সময় ধরে দেশে সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলো। আইউব সর্বদাই সমরিক অভ্যুত্থানকে "বিপ্লব" (Revolution) বলে আখ্যায়িত করতেন।[২৪] রওনক জাহানএ সম্পর্কে আরও উল্লেখ করেন,

"The miliary takeover in Pakistan was neither a revolution not a revolutionary of a "reform coup" as defined by Sumuel P. Huntington. It was brought about by men who were already participants in the existing political system and who had institutional bases of power within that system."[২৫] দেশের 'পুনর্গঠনের কথা বললেও আইউব খান তাঁর দীর্ঘ সামরিক শাসনে নিজেরই পুনর্গঠন করে ছিলেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি, এরপর গণভোটে অনুমোদন প্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং সর্বশেষে আইউব খানের সৃষ্ট মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ শাসন করে Political Institution কে ধ্বংস করে দিয়ে ছিলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে আইউব খান নিজেকে একজন "লৌহ শাসক" হিসেবে 'পুনর্গঠিত" করতে পেরেছিলেন। অবশেষে বাঙ্গালীদের প্রবল গণঅভুত্থানের মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে আইউব খানকে বিদায় জানিয়ে ছিলো। দেশ পুনরায় সামরিক শাসনের জাতা কলে পিষ্ট হলেও সেই সামরিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নাই।

সামাজিক শোষণ ঃ

ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দু'টি অংশ নিয়ে সৃষ্টি হল পাকিস্তান। পাকিস্তানের দু'টি অংশ কেবলমাত্র ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্নই ছিলো না ভাষা এবং সাংস্কৃতিগত দিক থেকেও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি জাতি সত্তা।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙ্গালীদের নিজস্ব ভাষা এবং সাংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তানী ভাষা ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে চেয়ে ছিলো। কিন্তু বাঙ্গালীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সে আশা বাস্তবায়িত হতে পারে নাই। তবে ভাষা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের বৈষম্য বজায় রাখতে পেরে ছিলেন। সামাজিক মর্যদাগত দিক থেকেও পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের কখনও সমকক্ষ ভাবতে পারে নাই। বাঙ্গালীদের সব সময় নীচু জাতি হিসেবে ভাবতো। তাই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা দীক্ষা, চাকুরী বাকুরী সহ প্রভৃতি সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে বাঙ্গালীদের বৈষম্য ছিলো বিস্তর।

ভাষা আন্দোলন ঃ

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর উপর প্রথম আঘাত আসে ভাষার ক্ষেত্রে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। ঐ অধিবেশনের দ্বিতীয় সংশোধনীতে খসড়া নিয়ন্ত্রণ প্রনালীর ২৯নং ধারা ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব **"এই ধারায় বলা হয়েছিল 'পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে উর্দু বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে হবে''**। সংশোধনী প্রস্তাবটির - উপস্থাপক পূর্ব বাংলার কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দূ ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলাকেও পরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব করেন।[২৬] কিন্তু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী এই প্রস্তাবের তুমুল বিরোধিতা করে, ফলে সংশোধনী প্রস্তাবটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাংলাভাষার দাবি গণ পরিষদে প্রত্যখান হলেও ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। এবং আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করে এদেশের তরুন ছাত্র সমাজ। অবশ্য 'তমুদ্দিনে মজলিস' নামক একটি সংগঠনের মাধ্যমেও ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় "সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ" এই পরিষদের নেতৃত্বেই আন্দোলন চলতে থাকে। বাঙ্গালীরা বুঝতে পারে যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে 'বাংলা'কে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে কখনও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী রাজী হবে না। এ কথা স্পষ্ট হয় জিন্নাহর ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চের বক্তৃতায়। ডঃ এম নজরুল ইসলাম তার বইয়ে জিন্নাহর বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে "The view of the Government become more clear when Jinnah, The first Governor General of Pakistan, declared to Bengali audience at Dhaka on March 21, 1948, that "Urdu and no other language "was going to be the state Language of Pakistan. He further warned the Bangalis, that anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan"[২৭] ২৪ মার্চ ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সমাবর্তন উৎসবে যখন জিন্নাহ বাংলাভাষার প্রশ্নে পুর্নব্যক্ত করে বলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্টভাষা"। জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিবাদ সেদিন সভাস্থল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং এই প্রতিবাদ আন্দোলন ধর্মঘট, হরতাল ও বিক্ষোভ আকারে চলতে থাকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীই এই আন্দোলন চুড়ান্ত রূপ নেয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্টভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) প্রদেশ ব্যাপি সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী মুসলিম লীগ ২০ ফেব্রুয়ারী থেকেই ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্র সমাজ সেদিন শাসক গোষ্ঠীর ১৪৪ ধারা অমান্য করে ভাষার দাবীতে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন, সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক সহ নাম না জানা আরও অনেক তাজা প্রাণ। এই জঘন্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২২ ফেব্রুয়ারী (১৯৫২) স্বতস্ফুর্তভাবে ঢাকা শহরে হরতাল পালিত হয়। এই ঘটনার পর শাসক গোষ্ঠী বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। ভাষা আন্দোলনে যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এ দেশের ছাত্র সমাজ সেই আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরবর্তী প্রতিটি ভাষা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে ছিল এ দেশের ছাত্র জনতা। ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ছিল '৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে। ভাষা আন্দোলনে চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে আইউব বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ ববং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের স্বাধীকার আন্দোলনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল বাঙ্গালী জাতি। তাই বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালীর এ ভষা আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইউনেস্কো "আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে (২১ ফেব্রুয়ারী) মহান ভাষা দিবসকে স্বীকৃতি দিয়েছে। [২৮]

অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যঃ

ভাষাগত দিক ছাড়াও পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পূর্ব পাকিস্তানীদের বিভিন্নভাবে শোষন করা হতো। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এবং সিভিল সার্ভিসে বাঙ্গালীদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সিমীত। ১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে দেখা যায় পাকিস্তানে সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন ১৯ জন, এর সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে। যুগ্ম সচিব ছিলেন ৪১ জন, এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন মাত্র ৩ জন, ৩৮ জনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী, উপ সচিব ছিলেন ১৩৩ জন এর মধ্যে ১০ জন মাত্র ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানীদের থেকে এবং ১২৩ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে ; নিম্ন পদস্থ সচিব ৫৪৮ জনের মধ্যে ৩৮ জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং ৫১০ জন পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে। শতকরা হিসেবে দেখা যায় এই সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের তথা বাঙ্গালীদের অংশগ্রহণ ছিল গড়ে মাত্র ৭% এর কম। (নিম্নের সারণী ২:২ দ্রষ্টব্য) অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে অর্ধেকেরও বেশী ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

সারণী ঃ ২.২

১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ ঃ

পদের নাম	মোট	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্বের হার
সচিব	১৯	-	১৯	-
যুগ্নসচিব	৪১	৩	৩৮	৭.৩২
উপ সচিব	১৩৩	১০	১২৩	৭.৫২
নিম্ন পদস্থ সচিব	৫৪৮	৩৮	৫১০	৬.৯৩
মোট	৭৪১	৫১	৬৯০	৬.৮৮

সূত্র ঃ *Constituent Assembly of Pakistan* Vol-1, January 17, page 1843-44

সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালদের অবস্থান ছিল গড়ে ৪% এর ও কম (সারণী- ২ঃ৩)।
সারণী ২ঃ৩ অনুযায়ী দেখা যায় যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৮৯৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল মাত্র ১৪ জন। নৌবাহিনীর ৫৯৩ জনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল ৭ জন মাত্র এবং বিমান বাহিনীর ৬৪০ জন কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল ৬০ জন মাত্র।

সারণীঃ ২-৩

১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সংখ্যা ঃ

বাহিনী	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট	পূর্ব পাকিস্তানের আনুপাতিক হার (%)
সেনা	১৪	৮৯৪	৯০৮	১.৫৪
নৌ	৭	৫৯৩	৬০০	১.১৭
বিমান	৬০	৬৪০	৭০০	৮.৫৭
	৮১	২১২৭	২২০৮	৩.৬৬

সূত্রঃ- Rounaq Jahan, *Pakistan : failure in national integration*, Table-11.9,page 25.

উপরোক্ত সারণী থেকে এ কথা স্পষ্ট যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাঙ্গালীদের তথা পূর্ব পাকিস্তানীদের অবদান কতটা নিম্নগামী এবং শোযণের চিত্র কত ভয়ানক। লেনিন আজাদ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে ছিল। দেশের উন্নয়নের সকল খাতকে ফেলে রেখে একমাত্র সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন বাজেটের প্রধান অংশকে ব্যয় করা শুরু হয়। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমান সামরিক সাহায্যের বদৌলতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এতটা প্রবল সামাজিক শক্তিরূপে আত্ম প্রকাশ করে যে, রাষ্ট্র প্রধান কিংবা সরকার অথবা কোন রাজনৈতিক দল শ্রেনী পেশার সংগঠন কারো পক্ষেরই সামরিক বাহিনীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি।"[২৯] ১৯৬৩ সালে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত কর্মকর্তাদের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার ছিল ৫% জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ছিল ৭.৪% এবং অন্যান্য পদবীর ছল ৭.৪%, বিমান বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার ছিল ১৭%, ওয়ারেন্ট অফিসার ছিল ১৩.২% এবং অন্যান্য পদবীর ২৮% নৌ বাহিনীতে ব্রাঞ্চ অফিসার ৫% চীপ পোর্ট অফিসার ১০.৪%, পোর্ট অফিসার ১৭.৩%, ল্যান্ডিং সীম্যান এবং নিম্ন পদস্থ ২৮.৮% ছিল।[৩০] কাজেই আইউবের শাসনামলে ও বাঙ্গালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। সর্বোপরি আইউব তার প্রশাসনে সামরিক ও বেসামরিক আমলা সমন্বয়ে এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেছিল যেখানে বাঙ্গালীরা ছিল সম্পূর্নভাবে উপেক্ষিত। আর এসমস্ত কারনেই পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে ছিল।

অর্থনৈতিক শোষণ ঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল পাহাড় সমান। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী, প্রশাসনিক কেন্দ্রীয় ইউনিট এবং সামরিক স্থাপনা সমূহ সহ শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তাছাড়া আমরা জানি রাজনীতি অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানীদের করায়ত্ত ছিল। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ এবং উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করতে তাদের কোন বেগ পেতে হয়নি। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য এতই প্রবল ছিল যে ক্ষুদ্র পরিসরে একে উপস্থাপণ করা প্রায় অসাধ্য; তবুও অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

নিম্নের কয়েকটি সারণী পর্যালোচনা করলে এ ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী ঃ ২.৪

পাকিস্তানে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবহার ১৯৪৭-৭০ঃ (মিলিয়ন ডলার)

প্রকার	পূঃ পাকঃ	পঃ পাক	কেন্দ্র	মোট
প্রকল্প ঋণ	৪১৭	৬০৮	১০৮	১১৩৩
প্রকল্প বহিভূত ঋণ	৪০৮	৬৭৩	৫৩	১১৩৪
পি এল ৪৮০ খাদ্য	৪৪৫	৭৯১	৫	১২৪১
গ্যারান্টিকৃত ঋণ	৩৫২	৬২৩	১১	৯৮৬
প্রকল্প অনুদান ও প্রযুক্তিগত সাহায্য	৫৬	১৪০	২০০	৩৯৬
পণ্য দ্রব্য অনুদান	২৬৩	৫৭৫	১৫	৭৯৩
সিন্ধু অববাহিকা তহবিল	০০	৭৫৬	০০	৭৫৬
মোট	১৯৪১	৪১৬৬	৩৯২	৬৪৩৯

সূত্র ঃ *প্রফেসর সালাহউদ্দিন* আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস - ১৯৪৭-১৯৭১*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃঃ ১১৯ (সারণী-১)

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানে ১৯৪৭-৭০ দীর্ঘ ২৩ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৬৪৩৯ মিলিয়ন ডলার এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ১৯৪১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের ও কম। কেন্দ্রে ব্যবহৃত অংশ ও ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে কারণ কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ২.৫

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দুই প্রদেশকে দেয়া গ্রান্টস-ইন-এইড ১৯৬০-৬৮ ঃ (বাজেট মিলিয়ন রুপীতে)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা হার %
১৯৫৯-৬০	৩.৪	৩১.২	৩৪.৬	৯.৮৩
১৯৬০-৬১	৪.১	২৩.৭	২৭.৮	১৪.৭৫
১৯৬১-৬২	১.০	২৪১.২	২৪২.২	০.৪১
১৯৬২-৬৩	২১.৫	২২২.৩	২৪৩.৮	৮.৮২
১৯৬৩-৬৪	৪২.৬	২১৯.২	২৬১.৮	১৬.২৭
১৯৬৪-৬৫	৫১.৬	২২২.৮	২৭৪.৪	১৮.৮০
১৯৬৫-৬৬	৩৬.১	১৯২.৯	২২৯.০	১৫.৭৬
১৯৬৬-৬৭	৪৪.৫	১৬১.৩	২০৫.৮	২১.৬২
১৯৬৭-৬৮	৩.৭	১৪৮.৪	১৫২.১	২.৪৩

সূত্র ঃ Rounq Jahan, *Pakistan : failure in national integration*, UPL, Dhaka, 1994, P-210 (Table - 8)

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত এই ৯ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক সরকার গুলোকে দেয়া গ্রান্টস-ইন-এইড এর সিংহ ভাগই দেয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত নয় বছরে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে শতকরা ১২.০৮ ভাগ গ্রান্ট দেয়া হয়েছে। কাজেই শোষণের মাত্রা কত ভয়াবহ ছিল সহজেই অনুমেয়।

সারণী- ২ঃ৬

পাকিস্তানে রাজস্ব ব্যয় এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (মিলিয়ন রুপীতে)

বছর	পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান(%)	পূর্ব পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান %
১৯৫০-৫৫	৮৯১০	৭২০০	৮০.৮১	১৭১০	১৯.১৯
১৯৫৫-৬০	১১৫২০	৮৯৮০	৭৭.৯৫	২৫৪০	২২.০৫
১৯৬০-৬৫	১৭১৮০	১২৫৪০	৭৪.৭৪	৪৩৪০	২৫.২৬
১৯৬৫-৭০	২৮৭১০	২২২৩০	৭৭.৪৩	৬৪৮০	২২.৫৭
মোট'	৬৬৩২০	৫১২৫০	৭৭.২৮	১৫০৭০	২২.৭২

সূত্র ঃ- প্রফেসর সালাহ উদ্দিন আহম্মেদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস- ১৯৪৭-১৯৭১*, পৃঃ ১২৪ (সারণী-৯)

পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্যটা প্রকট ছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ এই বিশ বছরে পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয়ের মধ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাগ্যে সর্বোচ্চ পড়েছে ২৫.২৬ ভাগ এবং সর্বনিম্ন ছিল ১৯.১৯ ভাগ এবং উক্ত বিশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ব্যয় বরাদ্ধ ছিল ২২.৭২ ভাগ পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে উক্ত সময়ে গড়ে ব্যয় করা হয়েছে ৭৭.২৮ ভাগ। পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে ছিল মোট বরাদ্ধের এক পঞ্চমাংশ মাত্র অথচ সংখ্যা গরিষ্ট জনগণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে কেবল মাত্র বৈদেশিক সাহায্য, গ্রান্টস-ইন-এইড কিংবা রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এ বৈষম্য ছিল সর্বব্যাপী। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও শোষণের আনুপাতিক হার ছিল একই। আর এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলে এবং এই স্বায়ত্বশাসনের দাবি স্বাধীকার আন্দোলনে রূপ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা অর্জন ঃ

পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর উল্লেখিত রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা ছিল বাচার দাবি। ব্যবসা বানিজ্যে অনগ্রসর, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বিমূখ, রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত এবং সর্বোপরি ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধে সামরিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত আর এ সমস্ত কারণে " ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটিতে "ছয় দফা" প্রস্তাব ও তার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ সময় শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন আহমদের দুটি ভূমিকা সহ ছয় দফা বিবৃত করে একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয় "।[৩১]

শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ৬ দফার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লিখেছেন, " ভারতের সাথে বিগত সতেরো দিনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে আজ নতুনভাবে চিন্তা করে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে বাস্তব যে সব অসুবিধা দেখা দিয়ে ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নাই যে, জাতীয় সংহতি অটুট রাখার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পই দেশকে এই খন্ডিত জরুরী অবস্থাতেও চরম বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষা করেছে। এই অবস্থার আলোকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে পাকিস্তানের দু'টি অংশ যাতে ভবিষ্যতে আরো সুসংহত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে পরিগনিত হতে পারে এই সংক্ষিপ্ত ইশতেহারটির লক্ষ্য তাই। এক কথা 'ছয়দফা' ছিল পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি।"[৩২] পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্যে ছয় দফার ব্যাপক প্রচার চালানো হয়।

আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা ঃ ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ঃ

দিনে দিনে ছয় দফার প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থনে শাসক গোষ্ঠী শংকিত হয়ে উঠে। শাসক গোষ্ঠী বাঙালীদের দমনের নতুন ফন্দি আটতে থাকে। আর এ কারণেই ১৯৬৮ সালের শুরুর দিকে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে একটি মিথ্যা মামলা বাঙ্গালী রাজনীতিবিদ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের জড়ানোর চেষ্টা করেন। "দৈনিক পাকিস্তান" পত্রিকার ৭ জানুয়ারী ১৯৬৮ সংখ্যায় এপিপি পরিবেশিত সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়, " একটি রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রটি গত মাসে উদঘাটিত হয়। ধৃত ব্যক্তিগণ পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।"[৩৩] আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথমে যে ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন না। ১৮ জানুয়ারী ১৯৬৯ এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়, "ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।"[৩৪] পরবর্তীতে শেখ মুজিবর রহমানকেই প্রধান আসামী করে শাসক গোষ্ঠী আগড়তলা ষড়যন্ত্র নামে প্রহসন মূলক মিথ্যা মামলার বিচার কার্য শুরু করে। এই মামলা শুরু হওয়ার পর গণ অসন্তোষ বাড়তে থাকে। '৬৮ এর শেষের দিকে গণ আন্দোলনের গতি বেড়ে গিয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় ছাত্রদের ১১ দফা দাবি ছয় দফার সাথে যুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোন চলতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারী পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পরিষদ যা 'ডাক' (Democratic Action Committee 'DAC') নামক একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করেন। উক্ত জোটে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), পাকিস্তান মুসলিম লীগ, এন ডি পি, জামায়াতে ইসলামী, পি ডি এম প্রভৃতি ৮টি দল যোগদান করে। তবে ভুট্টোর পিপলস পার্টি এবং ভাষানী পন্থী ন্যাপ এতে যোগদান থেকে বিরত থাকে। 'ডাক' গঠনের পর আন্দোলন জঙ্গী রূপ লাভ করে এবং রাজনৈতিক দল সমূহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ২০ জানুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকা সহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসদুজ্জামান মৃত্যুবরণ করলে ছাত্র এবং জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আছাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তিনদিনের শোক সহ ২৪ জানুয়ারী হরতালের ডাক দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ জনায়ারী হরতালকে কেন্দ্র করে ঢাকা নগরীতে ছাত্র জনতা যে অভূতপূর্ব সাড়া দেয় এর ফলশ্রুতিতে এই আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ছাত্র জনতা শ্রমিক কর্মচারীদের মিছিলের ঢল নামে ঢাকা নগরীতে। পাকিস্তান সরকার দমন নীতি গ্রহণ করে। পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালায়। সেক্রেটারীয়েট ভবনের নিকট নবকুমার ইনষ্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান নিহত হন। আহত হন অনেকে। মারমুখী জনতার আচরণ সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। ফলে সরকার সেনাবাহিনী তলব করতে বাধ্য হয়। ২৪ জানুয়ারীতে (৬৯) ঢাকায় গণ অভ্যুত্থানের পর আন্দোলন এক দিনের জন্য ও থেমে থাকেনি। এ আন্দোলনে সারা বাংলার জনগণ অংশ গ্রহণ করে ছিল" ।[৩৫]

১৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) ঢাকা শহরের সেনাবাহিনী সান্ধ্য আইন জারি করে যা ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে সেনাবাহিনীর হাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামসুজ্জোহা নিহত হলে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটলে আইউবের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। "২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখেই প্রেসিডেন্ট আইউব খান রেডিওতে ঘোষণা করেন তিনি আর পরবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না" ।[৩৬] ২২ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট " আগড়তলা-মামলা" সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল করে দিয়েছেন"[৩৭] ফলে শেখ মুজিবর রহমান সহ অন্যান্যরা এই মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। শেখ মুজিব কে মুক্তি দেয়া হল। শেখ মুজিবর রহমান বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হলেন ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের গণ সংবর্ধনা থেকে।

২৫ মার্চ (১৯৬৯) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উপর শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দেন। ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয় বারের মত দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তবে এই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ উঠেনি কারণ জনগণ আইউব খানের লৌহ শাসন অবসানের পর যে পরিবর্তন আশা করেছিল। এ ছিল তারই বাস্তবায়ন।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রশ্নে বলেন, দ্রুত সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য আইনগত কাঠামোর আওতায় (Legal frame work order) আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে। এ ভাষণে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের এক ইউনিট বতিল এবং সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে ৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করেন।

২৮ মার্চ (১৯৭০) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ২২ অক্টোবরের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে বলে ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৩১৩ টি হবে বলে ঘোষণায় উল্লেখ করেন এর মধ্যে ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই ঘোষণার মধ্যেই তিনি LFO এর রূপ রেখা তুলে ধরেন। ৩০ মার্চ (১৯৭০) সরকার আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন

"The Legal Frame Work Order, 1970 (President's Order No-2 of 1970) issued here to day by the president and chief Martial Law Administrator General A.M. Yehaya Khan"[৩৮] আইনগত কাঠামো আদেশের ২৫ ও ২৭ ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে একক ক্ষমতা ন্যাস্ত করায় রাজনৈতিক দলগুলো এর সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ এর সংশোধনের প্রস্তাব করেন। তবে বামপন্থী রাজনৈতিক দল সমুহ L.F.O' র তীব্র বিরোধিতা করে। মাওলানা ভাষানী L.F.O' র অধীনে নির্বাচনে যেতে প্রথমে অস্বীকার করেন পরবর্তীতে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এর পরে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যার অজুহাতে নির্বাচন না পিছানোর কারণে তিনি নির্বাচন বয়কট করেন। শেখ মুজিব নির্বাচন না পিছিয়ে পূর্ব বাংলার বন্যা উপদ্রুত এলাকায় নির্বাচন পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠানের পক্ষে মতামত দেন। সেই অনুযায়ী ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২ টি জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসণের মধ্যে ২৮২ টি আসনের নির্বাচন সমাপ্ত হয়। বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারী জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৮টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচন নির্ধারিত তারিখেই অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর (১৯৭০) এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। '৭০ এর এ নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের অবাধ

Dhaka University Institutional Repository

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ৯টি রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করে ছিল।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ৩১৩ আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদের মহিলা আসন সহ ১৬৭ টি (১৬০+৭) আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী-লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এক অবিস্মরনীয় বিজয় অর্জন করে, জাতীয় পরিষদে প্রাপ্ত সবগুলো আসনই তারা লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ উক্ত ১৬৭ টি আসন লাভ করে। বাকী ২টি আসনের মধ্যে একটি লাভ করে পিডিপি এবং অন্যটি স্বতন্ত্র। অপর দিকে পি পি পি পশ্চিম পাকিস্তানে ৫টি মহিলা আসন সহ ৮৮টি আসন পেয়ে জাতীয় পরিষদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেব আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদেও আওয়ামী লীগ অভাবনীয় ফলাফল লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত ১০টি আসন ও আওয়ামী লীগ লাভ করে। ফলে আওয়ামী লীগের আসন সখ্যা দাড়ায় ২৯৮ টি। প্রাদেশিক পরিষদে কার্যতঃ কোন বিরোধী দলই আত্মপ্রকাশ করে নাই। আওয়ামী লীগের পরেই স্বতন্ত্র সদস্যদের অবস্থান ছিল (৭জন)। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের এ সাফল্য ৬ দফার উপরই ম্যান্ডেট ছিল। নির্বাচনের প্রচারভিযানে শেখ মুজিব '৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফার ম্যান্ডেট হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নির্বাচনের ফলাফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি মানুষের অগনিত সমর্থনই প্রকাশ পেয়েছে। রওনক জাহান ও মন্তব্য করেছেন, " Since the six points were portrayed as a Magna Carta for the Bengalis."[৩৯] প্রকৃত পক্ষে ৬ দফাকে বাংলা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবেই ও চিহ্নিত করা হয়। ৬ দফার ভিত্তিতে বাঙ্গালীদের এই অভূত পূর্ব সাফল্য স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম করেছিল। এবং এ রায় ছিল স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জনের পক্ষে বাঙ্গালীদের ম্যান্ডেট।

নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে হতবাক করে দেয়। পক্ষান্তরে এ বিজয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণ এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের ক্ষোভেরও বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে।

'৭০ এর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের ফলে স্বভাবতই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রে সরকার গঠন করার কথা কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ইয়াহিয়া চক্র বাঙ্গালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার চক্রান্ত করতে তাকে। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জেড, এ ভুট্টো ১৯৭০ সালের ২০ ডিসেম্বর লাহোরে বলেন যে, " তাঁর পার্টির সহযোগিতা ছাড়া কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন চলবেনা। পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসতে সম্মত নয়। তাঁর পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য আরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে পারবে না। তিনি এ কথাও বলেন যে, তাঁর পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে আর পশ্চিম পাকিস্তান এ দুটো প্রদেশই প্রধান। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর পার্টির সহযোগিতা ব্যতীত চলতে পারবে না"।[৪০] পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করেছে তাদের ইচ্ছেমত সেই পূর্ব পাকিস্তানীদের আধিপত্য মেনে নিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রস্তুত ছিল না। তাই ভুট্টো আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা হযে দাড়ায়। ভুট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জনের হুমকি দেয়। চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ ঘটে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার মধ্য দিয়ে ৩ মার্চ (১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ১ মার্চ (১৯৭১) অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হলো। পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই যে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছিলো তা তাঁর বক্তৃতায় আভাস পাওয়া যায়। ১ মার্চ ইয়াহিয়া তাঁর ভাষনে বলেন ঃ

"The position briefly is that the major party of west Pakistan, namely, the Pakistan People's Party, as well as certain other Political Parties have declared their intention not to attend the National Assembly session on the third of March, 1971. In addition, the general situation of tension created by India has further complicated the whole

Dhaka University Institutional Repository

position. I have therefore, decided to Postpone the Summoning of the National Assembly to a later date." [৮১] অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সাথে সাথে ইতোপূর্বে স্থগিত আন্দোলনে আবার ঝাপিয়ে পড়ে বাঙ্গালীরা। পাকিস্তানীদের মনোভাব বুঝে ফেলে। মিছিলে মুখরিত হয় ঢাকা নগরী সহ প্রদেশ ব্যাপী। ৩ মার্চ (১৯৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের শীর্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হলো।

৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষনই ছিল স্বাধীনতার পথ নির্দেশক। ঐ দিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় নাই, তবে শেখ মুজিব 'স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলেছেন'। রেস কোর্সের সেই অবিস্মরণীয় ভাষণে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন, "-------- আমি প্রধান মন্ত্রীত্ব চাইনা। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিস্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে বাংলাদেশের কোর্ট কাছারি আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ------ আরো কিছু নির্দেশ দেবার পর সবশেষে ঘোষণা করলেন - " এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"[৮২] ৭ মার্চের ভাষণে এ কথা একেবারে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানীদের সাথে আর এক সাথে থাকা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার এক মাত্র পথ হল শান্তিপূর্ণ উপায় ক্ষমতা হস্তান্তর কিন্তু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত ছিল না। ৭ মার্চের ভাষণের পর পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। দেশ চলতে থাকে শেখ মুজিবের নির্দেশে।

৯ মার্চ (১৯৭১) পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ভাষন দান কালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী ঘোষণা করলেন, " ------------ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ও তাই বলি, অনেক হয়েছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নেই। লাকুম দীনুকুম ওয়ালইয়াদীন (তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার) এর নিয়মে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও। মুজিবের নির্দেশ মতো আগামী ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত হাত মিলাইয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিবো।" [৮৩]

সংকট নিরসনে ইয়াহিয়া আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। ১৬ মার্চ (১৯৭১) থেকে আলোচনা শুরু হলো। কিন্তু কোন অগ্রগতি হলোনা। শেখ মুজিব অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশা করেছিলেন। ২২ মার্চ শেখ মুজিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বললেন "যদি কোনো অগ্রগতি না হতো, তা হলে আমি কেন আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি" [৮৪] কিন্তু ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন নাই, এসে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দিতে যার প্রমান পাওয়া যায় ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া পাকিস্তান চলে যাওয়ার পর সেই রাতেই নিরস্ত্র নিরীহ বাঙ্গালীদের ওপর পাকিস্তানী জান্তাদের অতর্কিত হামলা। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। অসংগঠিত বাঙ্গালীরা সংগঠিত হয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তাদের মোকাবেলা করতে শুরু করলো।

স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ

২৫ মার্চ রাতেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দী হন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামে চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো। ২৭ মার্চ তৎকালীন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন ঃ

"DECLARATION OF INDEPENDENCE"

Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army here by Proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh."[৮৫]

শুরু হল সর্বাত্মক যুদ্ধ। ৩০ মার্চ(১৯৭১) মেজর জিয়াউর রহমান এক ঘোষণার মাধ্যমে পাক হানাদার কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যারোধে এগিয়ে আসার জন্যে জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তি বর্গের প্রতি আহবান

Dhaka University Institutional Repository

জানান।[৪৬] গ্রেফতার হওয়ার পর শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় থাকেন।

অস্থায়ী সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ঃ

১০ এপ্রিল (১৯৭১) মুজিব নগরে [৪৭] আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল। ঐ ঘোষণায় শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি করে একটি 'বিপ্লবী সরকার' গঠনের ঘোষণা হলো। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ সহ ৪ জন মন্ত্রী নিয়োগ করা হল। অবসর প্রাপ্ত কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করা হল। ১৭ এপ্রিল (১৯৭১) মুজিব নগরে আম্রকাননে বিপ্লবী সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী (অস্থায়ী) সরকারের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। মুজিব নগরকে অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার কথা বলা হয়। তবে অস্থায়ী সরকারের প্রধান কার্য্যালয় ভারতের কলিকাতা অবস্থিত থাকায় এ সরকারকে প্রবাসী সরকারও বলা হয়। মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সারা দেশে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মুক্তি যুদ্ধকে আরও জোরদার করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম,এ,জি, ওসমানী জুন মাস নাগাদ ব্রিগেট আকারে তিনটি ফোর্স গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুক্তি বাহিনীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের নাম অনুসারে এই তিনটি ফোর্সের নাম করণ করা হয়। 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স', এবং 'কে ফোর্স'। তিনজন কমান্ডার হচ্ছেন যথাক্রমে জিয়াউর রহমান, কে, এম, শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশাররফ।[৪৮] প্রবাসী সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ভারত মুক্তিযুদ্ধে শরনার্থীদের পূনর্বাসন ও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র শস্ত্র সহ সৈন্য প্রেরণ করে, যার ফলে বিজয় তরান্বিত হয়। দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপক যুদ্ধ, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময় এবং অগনিত মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার ইন-চীফ লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী'র আত্ম সমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামে একটি দেশ আত্মপ্রকাশ করে। এরই ফলে পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন শোষণ এবং বৈষম্যের অবসান ঘটে।

খ) বাংলাদেশ আমল ঃ

স্বাধীন বাংলাদেশ ঃ আওয়ামী লীগ সরকার

১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) মহান মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত সাফল্যের ফলশ্রুতিতে এ বাংলাদেশ। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পূনর্গঠনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি স্থায়ী সরকার গঠনের। ১০ জানুয়ারী (১৯৭২) শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান কারাগারে থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সমুহ নেতৃত্ব দিয়েছিল। যুদ্ধ করেছে সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, মজুর আপামর জনতা। "সায়িদ আতিকুল্লাহ এক রিপোর্টে জানিয়ে ছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে ছিলেন মোট ৮৫ হাজার জন যার মধ্যে ৫১ হাজার ৭৭০ জন ছিলেন বেসামরিক এবং বেশির ভাগই ছিলেন কৃষক পরিবারের। যুদ্ধ শেষে অধিকাংশ আবার ফিরে গিয়ে ছিলেন নিজ নিজ কাজে।" [৪৯] কিন্তু যুদ্ধ শেষে শেখ মুজিবর রহমান দেশে ফিরে একটি 'জাতীয় সরকার' গঠন না করে আওয়ামী লীগের সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। ১১ জানুয়ারী (১৯৭২) রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারী ('৭২) অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তেফা দিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এবং শেখ মুজিবর রহমান সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। '৭০ এর নির্বাচনের বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করা হল। ১০ এপ্রিল (১৯৭২) গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইন মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১২ অক্টোবর ১৯৭২ ডঃ কামাল হোসেন স্বাধীন বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান বাচাইয়ের পর ৪ নভেম্বর (১৯৭২) গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের সংবিধান

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদিত এবং ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) থেকে এই সংবিধান কার্যকর হবে বলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হলে, শেখ মুজিবর রহমান ১৭ ডিসেম্বর পুনরায় তাঁর মন্ত্রী পরিষদ সহ শপথ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের সাথে মত বিরোধের কারণে ছাত্রলীগের একাংশ মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম, এ জলিলের নেতৃত্বে ৩১ অক্টোবর (১৯৭২)জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার এই দল কর্তৃক প্রবলভাবে বিরোধীতার সম্মুখীন হন এবং এই দলের গোপন তৎপরতার কারণে আইন শৃংখলার ব্যাপক অবনতি ঘটে যা আওয়ামী লীগ সরকারকে এক বিব্রতকর অবস্থায় সম্মুখীন হতে হয়। নতুন সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সারে ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। "১৯৭৩ এর সাধারণ নির্বাচনে সংসদের ৩০০ আসনে ১৪টি রাজনৈতিক দল ও সংগঠসেসর ৯৫৯ জন এবং ১২১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে ১ হাজার ৮০ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৫০] নির্বাচনে শক্তিশালী কোন বিরোধী দল না থাকায় আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২ টি আসনে জয়লাভ করে। অবশ্য ৯টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে। বাকী ৮টি আসনের ৬টিতে জয় লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বাকী ২টি আসনে ২ জন প্রার্থী ২টি রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত হন। এরা হলেন জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান এবং জাসদের আব্দুস সাত্তার। তবে উপনির্বাচনে ১টি আসন জাসদ লাভ করলে রাজনৈতিক দলের আসন সংখ্যা দাড়ায় ৩ এবং বিরোধী দলের স্বতন্ত্র সহ ৯। নির্বাচন কারচুপি মুক্ত ছিল না। মওদুদ আহমদ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন " গোটা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েই জনমনে সন্দেহের সূত্রপাত ঘটেছে। সরকারী সংবাদ পত্র গুলোর রক্ষণশীল হিসেবে ও বিরোধী দল গুলোর অন্তত পক্ষে ৩০টি আসনে বিজয় ছিলো প্রায় সুনিশ্চিত।"[৫১] আওয়ামী লীগ শাসনামলে সবচেয়ে বেশী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা হল খাদ্য সমস্যা এবং আইন শৃংখলার চরম অবনতি। জাসদ এবং গুপ্ত রাজনৈতিক দলের তৎপরতায় আইন শৃংখলার মারাত্মক অবনতি ঘটে। খাদ্য সমস্যার কারণে ১৯৭৪ সালে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল বহুবিধ। "শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারের অযোগ্যত, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্ণীতিই নয় সরকার এবং ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীর অবহেলা ও উদাসীনাও ছিল এই দুর্ভিক্ষের জন্য বহুলাংশে দায়ী।[৫২] এই দুর্ভিক্ষে অনাহারে অর্ধাহারে বহুলোক মৃত্যুবরন করলো। কেবল মাত্র "সরকারীভাবে ঘোষিত তথ্য অনুসারে ২৭৫০০ জনের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়। তবে বেসরকারী হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা ১ লাখের ও বেশী।"[৫৩]

একদিকে গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপে আইনশৃংখলার চরম অবনতি অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। দলীয় নেতানেত্রীর আচরণে ও শেখ মুজিব সন্তুষ্ট ছিলেন না পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য শেখ মুজিব প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে আওয়ামী শাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী। ঐ দিন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণের সংবিধানের আমুল পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। উক্ত সংশোধণীর মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থারও আমুল পরিবর্তন করা হয়। দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে ১টি মাত্র জাতীয় দল গঠনের বিধান করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। শেখ মুজিব সংবিধানের এবং রাকজনৈতিক ব্যবস্থার এই পরিবর্তনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। চতুর্থ সংশোধনী বলে শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে এবং ক্ষমতার মোহে জাতীয় সংসদে কোন আলোচনা ছাড়াই এই ধরনের একটি সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করা গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবিধান অনুযায়ী একটি মাত্র দল "জাতীয় দলে'র নাম এবং এর কাঠামো ঘোষণা করলেন ২৪ ফেব্রুয়ারী (১৯৭৫) নতুন এ দলের নামকরণ করলেন " বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা 'বাকশাল'। দেশের সকল শ্রেণীর পেশা ও রাজনীতিবিদদের এই দলে যোগদানে বাধ্যতামূলক করা হলো। আওয়ামীলীগের দুই এম,পি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক ব্যরিষ্টার মইনূল হোসেন বাকশালে যোগদান থেকে বিরত থাকায় তাদের সংসদ সদস্যপদ হারাতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার সংবাদপত্র "ডিক্লারেশন নিষিদ্ধ করণ" আদেশ জারি করে ৪টি মাত্র সংবাদপত্র ছাড়া বাকী সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই চারিটি পত্রিকাও সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় যাতে করে সরকারের বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে কোন মতামত প্রকাশি হতে না পারে। চতুর্থ সংশোধনীর ম্যাদমে শাসনতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র ও একদলীয় স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে এবং সংবাদ পত্রের কণ্ঠ রোধ করে সরকার গণতন্ত্রের যে কবর রচনা করেছিলেন। যা পরবর্তীতে ১৫ আগষ্ট (১৯৭৫) সামরিক অভ্যুত্থানে সরকারের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আওয়ামীলীগের পতন ও সামরিক শাসন ঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় মধ্যম সারির কর্মকর্তঅ বাঙ্গালী জাতির একচ্ছত্র অধিপতি, বাংলা অবিসংবাদিত নেতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর পরিবার বর্গকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করে। অভ্যুত্থানকারীদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ নেতা ও শেখ মুজিব সরকারের বানিজ্য মন্ত্রী খোন্দাকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সামরিক বাহিনী কর্তৃক শেখ মুজিবর রহমান নিহত হলেও রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাকের মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন আওয়ামী লীগের। স্বাধীনতার পর দেশে প্রথমবারে মত সামরিক শাসন জারি করা হল। খোন্দকার মোশতাক আহমদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও নিজ হাতে রাখলেন। সেনা প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ আপাত বহাল থাকলেও ২৪ আগষ্ট (১৯৭৫) মেঃ জেঃ জিয়াউর সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল এম শফিউল্লার স্থলাভিষিক্ত হলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক খোন্দকার মোশতাক আহমদ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৫ আগষ্টের হত্যা কান্ডে জড়িতদের ক্ষমা করে উক্ত হত্যাকান্ডের পথ রুদ্ধ করলেন। খোন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং তার মন্ত্রী পরিষদ ৬ নভেম্বর (১৯৭৫) পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু ৩ নভেম্বর (১৯৭৫) বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্তৃক এক সামরিক অভ্যুত্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পদচ্যুত ও গৃহবন্দী হন। মোশতাক কার্যতঃ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লেন। ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত কার্যতঃ দেশে কোন সরকার ছিলো না। খোন্দকার মোশতাকের সরকারই নামে মাত্র ছিলো। ৩ নভেম্বর (১৯৭৫) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘটে যায় আর এক নৃশংস ঘটনা। ১৫ আগষ্টের পর বন্দী ৪ জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহম্মেদ, মোঃ মনসুর আলী এবং এইচ, এম, কামরুজ্জামান কে কারা অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়। ৭ নভেম্বর (১৯৭৫) (৬ নভেম্বর দিবাগত রাতে) সেনা বাহিনীতে এক সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। " ৭ নভেম্বর ভোরে ঢাকা রেডিও ষ্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয়" বীর বিপ্লবী সিপাহী, জনতা কৃষক, বিডিয়ার, পুলিশ, বিপ্লবী গণ বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এক মুক্ত করা হয়েছে।[৫৪] বিপ্লবী সৈনিকদের হাতে মেজর জেনালের খালেদ মোশাররফ নিহত হন। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান হন। বিচারপতি এ, এস, এম, সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পূর্বেই ইস্তেফা দিয়ে দিলেন। দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ, এস, এম, সায়েমের হাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি ও ন্যাস্ত করা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান মেঃ জেঃ জিয়াউর রহমান নৌ বাহিনী প্রধান কমোডর মোশারফ হোসেন এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শল এম, জি তোয়াবকে উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করা হয়েছিল কিন্তু সামরিক সরকার দেশে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করে। 'বাকশাল গঠনে মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ পুনরায় 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' নামে ৪ নভেম্বর (১৯৭৬) অনুমোদন লাভ করে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে প্রফেসর মোজাফফর আহমেদের ন্যাপ এবং কমরেড মনি সিং এর বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারের অনুমোদন লাভ করে ছিল। [৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতায় আগমন ঃ

২৯ নভেম্বর (১৯৭৬) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম এক ঘোষণায় "জাতীয় স্বার্থে" প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব তৎকালীন সেনাপ্রধান ও উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। [৫৬] কাজেই দেশের সামরিক শাসন বজায় থাকায় নির্বাহী প্রধান হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হন। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু রাষ্ট্রপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকা কালে (২১ নভেম্বর ১৯৭৬) নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে ছিলেন।

২১ এপ্রিল (১৯৭৭) তারিখে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ,এস,এম, সায়েম সি,এম,এল এ, ও সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট "রাষ্ট্রপতি"র ক্ষমতা হস্তান্তর করে অবসর গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়া ৩০ মে ১৯৭৭ তাঁর প্রতি এবং তাঁর অনুসৃত ১৯ দফা কর্মসূচির ও নীতির প্রতি এক গণভোটের আয়োজন করেন। উক্ত গণ ভোটে প্রদত্ত ভোটের 'শতকরা ৯৮.৮২ ভাগ' [৫৭] ভোটার তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করে 'হ্যা' বাক্সে ভোট প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৭৮ ঃ

১৯৭৮ সালের ৩ জুন সামরিক শাসনাধীনে দেশে প্রথম বারের মত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে 'জাতীয়তা বাদী ফ্রন্টের'[৫৮] পক্ষ থেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং 'গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের'[৫৯] মনোনীত মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অবঃ) এম,এ,জি, ওসমানী ছাড়াও আও ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান "৫৩.৩৪ ভাগ রেজিষ্টার্ড ভোটারের মধ্যে ৭৬.৩৩ ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী হলেন। [৬০] জেনারেল ওসমানী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি বলে অভিযোগ উত্থাপন করলেন । [৬১]

সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯ :

দেশে দ্বিতীয় বারের মত ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে ২৯ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ' বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী দল'[৬২] (বি,এন,পি) এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি, এন, পি প্রদত্ত ভোটের (৫০.২৪) ৪১.১৩ ভাগ ভোট পেয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭ টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে । এবং ৩০টি মহিলা আসন সহ বিএনপি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করে। বিরোধীদল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে ছিলেন কিন্তু জনগণ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে ছিল। সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আপাত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পূর্ণ বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য সামরিক আইন প্রত্যাহার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী ও সামরিক আইন প্রত্যাহার ঃ

১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এ সংশোধনীতে বলা হয়, "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের (উভয় দিন সহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে তাহা, এবং অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে তাহা, এবং অনুরূপ কোন

ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতাবলে, অথবা অনুরূপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়া বা অনুরূপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারা সমূহ, অথবা প্রণীত, কৃত, বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"[৬৩] সামরিক শাসনামলের যাবতীয় কার্যাবলীকে সংবিধানের অংশ হিসেবে পরিগনিত হওয়ায় সামরিক শাসন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এর ফলে ৬ এপ্রিল (১৯৭৯) দেশ থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের সাথে সাথে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিয়া হত্যা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১ ঃ

বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গণতন্ত্র যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে যাচ্ছিল তখনই ঘটে ১৯৮১ সালে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান। ৩০ মে (১৯৮১) চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ (অবঃ) জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি মেজর জেনারেল এম, এ, মঞ্জুরের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বিপদগামী সামরিক কর্মকর্তা কর্তৃক এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। ঐ সময় চট্টগ্রামে মেঃ জেঃ এম এ, মঞ্জুরের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করলেও ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঐ বিপ্লবী পরিষদের বিলুপ্তি ঘটে। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির প্রতি তিন বাহিনীর প্রধানগণ আনুগত্য প্রকাশ করে। ফলে জেনারেল মঞ্জুরের অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য হয়। জেনারেল মঞ্জুর গ্রেফতার অবস্থায় সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৫ নভেম্বর (১৯৮১) অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে ৩৯ জন প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রার্থীগণ হলেন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী উপরাষ্ট্রপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অবঃ) এম, এ, জি ওসমানী, মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টর কমান্ডার জাসদ প্রার্থী মেজর (অবঃ) এম এ জলিল সহ অনেকে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেনের চেয়ে, ৮৫,২২,৭১৫ ভোট বেশি পান।"[৬৪] ১৬ নভেম্বর (১৯৮১) নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে ডঃ কামাল হোসেন সাংবাদিক সম্মেলন করেন।[৬৫] বিচারপতি সাত্তারের জয়লাভের কারণ ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বি,এন,পি'র প্রতি জনগণের সহানুভূতি এবং দেশের রাজনৈতিক স্থিশীলতা বজায় রাখা।

এরশাদের সামরিক শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ঃ

রাষ্ট্রপতি জিয়ার মৃত্যুর পর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে সরকারের আইন শৃংখলার অবনতি দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি অজুহাতে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে ২৪ মার্চ (১৯৮২) রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়। দেশে সামরিক আইন জারি করে জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সি,এম,এল এ) হলেন। ২৭ মার্চ (১৯৮২) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি রূপে নিযুক্ত করেন। এরশাদ তাঁর শাসনামলে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দল নিয়ে অনেক খেলেছেন। কখনও ঘরোয়া রাজনীতি আবার কখনওবা প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দিয়েছেন। আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাকে ধরে রাখতে আবার সকল রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। ১৯৮৩ সাল থেকে এরশাদের

বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট এবং বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। এরশাদও তার রাজনৈতিক ভিত মজবুত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের প্রলোভন দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। প্রথমে জনদল তাঁর পর 'জাতীয় ফ্রন্ট' এবং পরে 'জাতীয় পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল। ১১ ডিসেম্বর (১৯৮৩) জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে এরশাদ জিয়াউর রহমানের অনুকরণে এক গণ ভোটের আয়োজন করেন। প্রধান সামরিক আই প্রশাসক এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর উপর জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী উক্তগণ ভোটে তিনি বিপুলভাবে জনগণের আস্থা অর্জন করেন। ১৫ দলীয় জোট এবং ৭ দলীয় জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। কয়েক দফা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে আন্দোলনের মুখে এরশাদ বারবার নির্বাচন পিছাতে থাকে। অবশেষে ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধান আন্দোলন রত দুই জোটের মধ্যে ভাঙ্গণ ধরাতে সক্ষম হন। এরশাদ ১৫ দলীয় জোটের ৮টি দলকে (আওয়ামী লীগ সহ) নির্বাচনে রাজি করান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তারিখে দেশে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে সরকারীদল 'জাতীয় পার্টি' ১৫৮ টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৯৬ টি আসন পেয়ে ৮ দলীয় ঐক্য জোট দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করে। ১৫ অক্টোবর (১৯৮৬) অনুষ্ঠত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। আওয়ামী লীগ, বিএনপি সহ প্রধান প্রধান বিরোধী দল এই নির্বাচন বর্জন করে। এরশাদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ২০ অক্টোবর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রূপে শপথ গ্রহন করেন। "১০ ই নভেম্বর (১৯৮৬) তারিখে সরকারী দল, আ, স,ম, আব্দুর রবের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), ক্ষুদ্র দলের কয়েকজন সদস্য এবং স্বতন্ত্র সদস্যদের সহযোগিতায় সংসদে পাস করিয়ে নেয় সংবিধান সপ্তম সংশোধনী" [৬৭] সপ্তম সংশোধনী পাশের সাথে সাথে এরশাদ ১০ নভেম্বর (১৯৮৬) সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেন। পুনরায় শুরু হয় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। আন্দোলনের মুখে এরশাদ ৬ ডিসেম্বর (১৯৮৭) তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ৩ মার্চ (১৯৮৮) সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাতে এরশাদ প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের অনুপস্থিতিতে ভোটার বিহীন ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। এক তরফা এই নির্বাচনে এরশাদের নিজ দল জাতীয় পার্টি ২৫১ টি আসন এবং আ,স,ম আব্দুর রবের সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) ১৯টি আসন লাভ করে। বিরোধী দলের অনৈক্যের কারণে এরশাদ তাঁর স্বৈর শাসন দীর্ঘায়িত করার প্রয়াস পান।

এরশাদ পতন

৮ দল , ৭ দল এবং ৫ দলের যুগপৎ আন্দোলনের ফলে দীর্ঘ ৯ বছর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চুড়ান্ত রূপ লাভ করে ৯০ এর শেষের দিকে ডাকসুর নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করলে । ১৯ নভেম্বর (১৯৯০) তিনজোট ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরশাদের পতনের লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে " তিন জোটের রূপ রেখা" নামে একটি সম্মিলিত 'মেনিফেস্টো' প্রণয়ন করেন এবং তিন জোট এই রূপরেখা অনুসরনে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবং ছাত্র জনতার উত্তাল গণ আন্দোলনের মুখে এরশাদ ২৭ নভেম্বর (১৯৯০) জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ও ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেন নাই। গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়; অবশেষে এরশাদ বাধ্য হয়ে ৪ ডিসেম্বর (১৯৯০) পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের রূপ রেখা অনুযায়ী এবং তিন জোটের মনোনীত নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ উপ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরশাদ উপ রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। এরশাদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে

জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায় সরকার গঠন করে।

প্রথমে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে এবং পরবর্তীতে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনের পর খালেদা জিয়ার সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়। খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও সরকারী এবং বিরোধী দলের আচরেণে সংসদীয় রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত ছিল। উক্ত শাসনামালের উল্লেখযোগ্য সময় সংসদীয় কার্যক্রম অতিবাহিত হয়েছে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে সরকার এবং বিরোধীদলের তিক্ততায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘটে ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ১৫ (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬) অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সহ প্রধান প্রধান সকল বিরোধী দল অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ভোটার বিহীন উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পাশ করা হয় বহু প্রতিক্ষিত " তত্ত্বাবধায়ক সরকার" বিল। এরপর ব্যাপক গণ আন্দোলনে খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ। একই দিন বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) পরাজিত করে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হন। শেখ হাসিনার সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের অগ্রযাত্রা বজায় থাকে।

উল্লেখিত বিবরণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অবিভক্ত ভারত ব্যতীত ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছরকে প্রথমত দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছর এবং বাংলাদেশ আমলের ২৬ বছরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির সরকার ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল। এর মধ্যে উভয় আমলেই সামরিক সরকার এক উল্লেখ যোগ্য সময় দেশ শাসন করেছে।

সারণী ঃ ২.৭

১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন প্রকৃতির সরকারের শাসনকাল দেখান হল ঃ

	গভর্নর জেনারেল / রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়)	সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে শাসন	পূর্ণ সামরিক শাসন	সামরিক শাসকের অধীনে গণতন্ত্র	অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার	মোট
পাকিস্তান আমল	৯ বছর (১৯৪৭-১৯৫৬)	২ বছর (১৯৫৬-১৯৫৮)	৬ বছর (১৯৫৮-১৯৬২) (১৯৬৯-১৯৭১)	৭ বছর (১৯৬২-১৯৬৯)	-	২৪ বছর
বাংলাদেশ আমল	২ বছর (১৯৭১-১৯৭২) (১৯৮১-১৯৮২)	৮ বছর (১৯৭২-১৯৭৫) (১৯৯১-১৯৯৬)	৯ বছর (১৯৭৫-১৯৭৯) (১৯৮২-১৯৮৬)	৬ বছর (১৯৭৯-১৯৮১) (১৯৮৬-১৯৯০)	১ বছর (১৯৯০-১৯৯০) এবং (১৯৯৬ সালে ৩ মাস)	২৬ বছর

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ ৪ জন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক শাসিত হয়েছে। পাকিস্তানে ২৪ বছরের মধ্যে সংসদীয় প্রকৃতির সরকার ছিল মাত্র ২ বছর ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত। পাকিস্তান আমলের উক্ত সময়ে পূর্ণ সামরিক শাসন ছিল ৬ বছর। প্রথম পর্যায় জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আউব খানের বিদায়ের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২ বছর সহ উল্লেখিত ৬ বছর সামরিক শাসনের অধীনে

ছিল সমগ্র পাকিস্তান। শুধু পূর্ণ সামরিক শাসন ছাড়াও পাকিস্তানে আইউব খান তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে গণতন্ত্রের লেবাসে শাসন করেছে ৭ বছর। ফলে পাকিস্তানের মোট ২৪ বছরের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী সময় অর্থাৎ ১৩ বছর সামরিক শাসক কর্তৃক শাসিত হয়েছে। এককভাবে সবচেয়ে বেশী ১১ বছর শাসন করেছে ফিল্ড মার্শাল আইউব খান এবং সবচেয়ে কম সময় ক্ষমতায় ছিল গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

বাংলাদেশ আমলেও সারণীতে প্রদর্শিত ৫ প্রকার সরকার/শাসক ২৬ বছর ধরে দেশ শাসন করেছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯ বছর দেশে পূর্ণ সামরিক শাসন বজায় ছিল। দুইটি পর্যায়ে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ এর ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত উক্ত ৯ বছরে ৪ জন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দেশ শাসন করেছে। এরা হল খোন্দকার মোশতাক আহম্মেদ, বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং লেঃ জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। উক্ত ৯ বছর ছাড়াও দুইজন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত এবং জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৬ বছর দেশে গণতন্ত্রের নামে সামরিক আইন ও সামরিক শাসকের অধীনে দেশ শাসন করেছে ১৫ বছর। বাংলাদেশে ১৯৭১ - ১৯৯৬ পর্যন্ত এই ২৬ বছরের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ সময়েরও কম অর্থাৎ ৮ বছর ছিল সংসদীয় সরকার। দুটি পর্যায়ে দুইটি রাজনৈতিক দল উক্ত ৮ বছর সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে দেশ শাসন করেছে।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ সরকার এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার উক্ত ৮ বছর ক্ষমতায় ছিলো। বর্তমানেও সংসদীয় সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে বেসামরিক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে দেশ শাসিত হয়েছে দুই বছরের কিছু বেশী সময়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯৭১-১৯৭২)। শেখ মুজিবর ররহমান ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ এবং বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের (১৯৮১-১৯৮২) এই ১ বছর সহ মোট দুই বছরের কিছু বেশী সময় মাত্র। উল্লেখিত প্রকৃতির সরকার ছাড়াও বাংলাদেশের দুইটি পর্যায়ে অন্তর্বর্তী সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য দুইটি সরকার ১ বছর দাযিত্ব পালন করেছে। এর মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে অন্তর্বর্তী সরকার রূপে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এবং সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিচারপতি হাবিবুর রহমান ১৯৯৬ সারের ৩০ মার্চ থেকে একই বছরের ২৩ জনু পর্যন্ত ৮৬ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। অতএব, পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৬ বছরের মধ্যে ৮ বছর সংসদীয় সরকার বাদ দিলে ১৮ বছরই এক ব্যক্তি শাসন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের শাসন বজায় ছিল। এককভাবে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সর্বোচ্চ ৯ ববছর দেশে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দেশ শাসন করেছে। এবং সবচেয়ে কম সময়ের জন্য ক্ষমতায় ছিল প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহম্মদ ৮৩ দিন।

অতএব, পরিশেষে বলা যায় যে খালেদা জিয়ার সরকারের মাধ্যমে দেশে আরও একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করলে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পূর্ণ স্বাদ পেতে আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে সেই গণতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে সকল প্রকার অপশক্তি কর্তৃক ক্ষমতা দখলের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। এখন সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে পারে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদ টীকা

তৃতীয় অধ্যায়

১. হোসেন জিল্লুর রহমান, *ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোঃ বাংলাদেশের ইতিহাস - ১৭০৯-১৯৭১* [সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত] ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলা সংস্করণ ১৯৯৩ ইং পৃঃ ১৬২।

২. জন, আর, ম্যাকলেন, *বঙ্গবিভাগ (১৯০৫) ঃ হিন্দু মুসলিম সম্পর্কঃ বাংলাদেশের ইতিহাস - ১৭০৪-১৯৭১*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৮

৩. ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস-১৯৪৭-১৯৫৮ ঃ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস - ১৯৪৭-১৯৭১*. [প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং.পৃঃ১৮।

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২০ ও ২১।

৬. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ. দলিল পত্রঃ প্রথম খন্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা ঃ ১৯৮২ইং, পৃঃ১৫ ও ১৬।

৭. এম, আর, আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স, (চতুর্থ মুদ্রন] ১৩৯১, বাং, পৃঃ ১৬৩।

৮. Rounaq Jahan, Pakistan : *Failure in national integration*, Dhaka,ঃ UPL[First Bangladesh Edition] 1994, p-14.

৯. ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

১০. M. Nazrul Islam, *Pakistan and Malaysia : A comparative study in National Integration, New Delhi* : Sterling Publishers Private Limited, 1989, P-110.

১১. ডঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর- *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭।

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

১৪. M. Nazrul Islam - *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৭।

১৫. ডঃ প্রীতিকুমার মিত্র, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস - ১৯৫৮-১৯৬৬ ঃ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস - ১৯৪৭-১৯৭১*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯২।

১৬. লেনিন আজাদ, *উন সত্তরের গণঅভ্যুত্থান ঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকাঃ ১৯৯৭ ইং, ইউ,পি, এল, পৃঃ ১৪৬।

১৭. পাকিস্তানের ৬ জন রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ২ জন রাষ্ট্র প্রধান হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং গোলাম মোহাম্মদ।

১৮. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* - ১৯৪৯-৭১, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩ইং, পৃঃ ১৫।

১৯. ডঃ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৩।

২০. কামাল উদ্দিন আহমেদ, *চুয়ান্ন সালের নির্বাচন ঃ স্বায়ত্ত শাসন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৭০৪-১৯৭১, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৬৯।] মূলঃ- M. Rashuiduzzaman, "*The Awami League in the politial Development of Pakistan Asian Survey* 1× ঃ 7 (1970), 576.]

২১. Rounaq Jahan -*Ibid*- P- 45.

২২. কামাল উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৪।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৪।

২৪. Rounaq Jahan --*Ibid*- P- 5.

২৫. *Ibid*- P- 51-52.

২৬. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধ ঃ প্রশাসনিক দলিল পত্র*, ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ ইং, পৃঃ ৭৮।

২৭. M. Nazrul Islam -*Ibid*- P- 114.

২৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮-১১-১৯৯৯ ইং।

[১৭ নভেম্বর (১৯৯৯) তারিখে ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ৩০ তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে]

২৯. লেনিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৪।

৩০. Rounaq Jahan - *Ibid*- P- 62.

৩১. ডঃ প্রীতিকুমার মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩।

৩২. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* [১৯৪৭-১৯৯০] ঢাকা, অবসর প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৯৫ ইং, পৃঃ ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ দ্বিতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত* পৃঃ ২৯৮।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১।
৩৫. আব্দুল হালিম, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৬-১৯৬৯ ঃ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস*- ১৯৪৭-১৯৭১, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭২।
৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭৫।
৩৭. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৩৪।
৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০২।
৩৯. Ronaq Jahan - *Ibid*- P-189।
৪০. সন্তোষ গুপ্ত, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস - ১৯৬৯- মার্চ ১৯৭১ ঃ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯৯।
৪১. *The morning News* March, 1997.
৪২. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৭।
৪৩. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইউ, পি, এল, ১৯৯৩ইং পৃঃ৭১।
৪৪. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৮।
৪৫. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্রঃ তৃতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ২।*
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ৩।
৪৭. "স্বাধীনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সময় মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (বৈদ্যনাথ তলা) নাম পরিবর্তন করে *'মুজিব নগর'* নাম করণ করা হয়।"
৪৮. *এম, আর, আখতার মুকুল, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪। ৪৯।
৪৯. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯।
৫০. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া,- *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫০।
৫১. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল*, ঢাকা ঃ ইউ,পি,এল, ঢাকা [প্রথম বাংলা সংস্করণ] ১৯৮৭ ইং, পৃঃ ১৮২।
৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭৮।
৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮১।
৫৪. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া-*প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬১-২৬২।
৫৫. *প্রাগুক্ত*, প্রঃ ২৭৯।
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮১।
৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮৫।
৫৮. "১লা মে (১৯৭৮) তারিখে, *জাগ দল, ভাষানী ন্যাপের মশিউর রহমান গ্রুপ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টির কাজী জাফর-হালিম গ্রুপ, মুসলিম লীগ, জাগমুই এবং বাংলাদেশ লেবার পার্টির সমন্বয়ে একটি ছয়-দলীয় "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট"* গঠন করা হয়। সূত্রঃ এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া- *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৯-২৯০।
৫৯. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত গনতান্ত্রিক ঐক্য জোটের শরীক দলগুলি হলঃ *আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো), বাংলাদেশ পিপলস লীগ, জাতীয় জনতা পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং বাংলাদেশ জাতীয় লীগ।* সূত্র ঃ- মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার- *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০২।
৬০. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ১০২।
৬১. *দৈনিক সংবাদ*, ৪ জুন ১৯৭৮ইং।
৬২. 'জাতীয়তা বাদী ফ্রন্ট' বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জন্মলাভ করে।
৬৩. গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, [১৯৯৪ সালের ৩০শে জনু পর্যন্ত সংশোধিত] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশ সরকার বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা ঃ ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ১৯৯৪ ইং, পৃঃ ১৭৫।
৬৪. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া - *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০৭।
৬৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের তারিখ*, ঢাকা ঃ ১৯৯৮ইং মাওলা ব্রাদার্স,, পৃঃ ১৭৭।
৬৬. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া- *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩১৮।
৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গণতন্ত্র উত্তরণের বিকাশ ধারা ও খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় আরোহন ঃ

ভূমিকা ঃ '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে একনায়ক এরশাদ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র উত্তরনের পথ সুগম হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদের এই ক্ষমতা দখলকে চ্যালেঞ্জ করে ছাত্র সমাজ সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূচনা করে ছিলো। পরবর্তীতে ৮,৭, ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের দুর্বার আন্দোলনে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পদত্যাগ ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে পরিসমাপ্তি ঘটে।

সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে বিএনপি এবং ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। জেনারেল এরশাদের পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদের অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালিত ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি,এন,পি) অভূতপূর্ব সাফল্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গণতন্ত্র উত্তরণ ও বিকাশ ধারায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেত্রী বেগম জিয়া এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

নিম্নে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ও গণতন্ত্রের বিকাশ ধারায় খালেদা জিয়ার অবদান সমূহ তুলে ধরা হল।

ক) '৮২ -র সামরিক শাসন ও রাজনৈতিক সংকট ঃ

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের আনুগত্য প্রকাশ করে সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়ে থাকে যে, ঐ সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল যা পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৩০ মে'র অভ্যুত্থানকারী দলের নেতা মেজর জেনালের মঞ্জুর সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যদের হাতে নিহত হলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার রহস্য অনুদঘাটিত থেকে যায়। যদি ও মঞ্জুর হত্যায় জেনারেল এরশাদকে আসামী করে একটি মামলা বর্তমানে বিচারধীন রয়েছে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি পদ পূরণের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার তার নিকটতম প্রার্থী আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেনকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের ফলে সাংবিধানিক ধারা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে তৎকালীন সেনা প্রধান এরশাদের কিছু বিবৃতি ও এরশাদের উদ্বৃতি দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলে জানা যায় এরশাদ দেশ শাসনে সামরিক বাহিনীর অংশীদারিত্ব চায়। যা ছিল দেশের রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত। ৭ অক্টোবর (১৯৮১) ' The Guardian' পত্রিকার উদ্বৃতি দিয়ে ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন যে, "The army [of Bangladesh] should be directly associated with the governance of the country so that the military might have their "Commitment" in administration and do their best "to arsest the tendency of up rising" with a view to fulfilling their ambition or the lust for power." [১] এর এক সপ্তাহ পর 'The New York Times' এ অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়, "That the military in Bangladesh should be accordet a constitutional role ensure the protection of the political system."[২] বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ২৯ নভেম্বর (১৯৮১) জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, " তিনি একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন এবং তার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাস নেই ----- সামরিক লোকজন রাজনীতিতে সামরিক অ্যাডভেঞ্চার কামনা করেনা। কিংবা সশস্ত্র বাহিনীতে তারা রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চার চায় না। তারা কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জনগণকে সাহায্য করতে চায়"।[৩] কিন্তু বাস্তবে এরশাদ সর্বদাই এই বিবৃতির পরীপন্থী কাজে লিপ্ত ছিল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করা এবং শাসন ক্ষমতা দখল করা। এরশাদ তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ঐ সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠনের কথা বলেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের গঠন সম্পর্কেও (অর্থাৎ কারা থাকবে) ইঙ্গিত দান করেন যে, উপ রাষ্টপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সাথে তিন বাহিনীর প্রধানদের ও উক্ত পরিষদের সদস্য করতে হবে। এরশাদের দাবি ও চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ১ জানুয়ারী (১৯৮২) দশ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেন। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ। কিন্তু এরশাদের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করলেও কমিটি গঠনের পর এত দীর্ঘ কমিটি এরশাদের মনপুত না হওয়ায় পরবর্তীতে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে কমিয়ে ৬ এ নির্ধারণ করা হয়। পুনর্গঠিত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণের বাইরে কোন সদস্য রাখা হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উক্ত কমিটিতে রাখা হয় নাই। জেনারেল এরশাদ এই ভাবে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে গণতন্ত্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে উদ্যত হলেন ২৯ নভেম্বর (১৯৮১) সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ সামরিক বাহিনীর কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস নাই এ কথা বলা সত্ত্বেও এর মাত্র ৪ মাস পর ২৪ মার্চ (১৯৮২) দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং সেনা বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ দেশে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক আইন জারি করে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সি,এম,এল,এ) হিসেবে ঘোষণা করলেন। ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি অস্ত্রের মুখে রেডিও এবং টেলিভিশনে বলতে বাধ্য হলেন, " দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি ও স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি তৎকালীন সেনা বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন।"[৪] অথচ স্বাস্থ্যগত বা অন্য কোন কারণে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হলে উপরাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা। কিন্তু অস্ত্রের জোরে এরশাদ অসাংবিধানিক উপায়ে সামরিক আইন জারি করে শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়। সামরিক আইন ঘোষণার কারণ প্রসঙ্গে এরশাদ বলেন, "দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। ভূত পূর্ব সরকারের অনুসৃত প্রাপ্ত নীতির দরুন দেশে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে"।[৫] অথচ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে এরশাদ যা বলে ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত পদক্ষেপ হল এই সামরিক শাসন। উক্ত সাক্ষাৎকারে এরশাদ উল্লেখ করে ছিলেন, ১. "৩০ মে'র ঘটনা বলিতে দেশকে যে দুর্যোগময় পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল তাতে নিয়মতান্ত্রিক সরকারের নির্দেশিত ভূমিকা পালনে সেনা বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি সেনাবাহিনীর প্রধান রূপে পরিতৃপ্ত সন্দেহ নেই। ----"

২. " সেনা-বাহীনির কখনও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া উচিত নয় -----"।

৩. "একজন সচেতন নাগরিক রূপে সেনাবাহিনীর একজন সদস্যের রাজনীতিতে সচেতনতা বাঞ্ছনীয় কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা নয় -----"।

৪. "সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা ও দেশের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অনুগত থাকাই আমি প্রতিটি সৈনিকের কর্তব্য বলে মনে করি----"।

৫. সেনা বাহিনীকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে। সেনা বাহিনী রাজনীতিতে মাথা ঘামাবে না। আমি মনে করি সেনা বাহিনী ক্ষমতায় আসার মতো দুঃখ জনক ঘটনা ঘটা উচিত নয়---।"[৬]

অথচ ঐ সাক্ষাৎকারের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এরশাদ তার প্রতিটি কথা ভ্রান্ত প্রমানিত করে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর নাক গলানো কিংবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ নয়, সরাসরি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত

Dhaka University Institutional Repository

করে গণতন্ত্রকে পদদলিত করে ; সংবিধান, মৌলিক অধিকার, সব কিছু স্থগিত রেখে এরশাদ কায়েম করেছিলেন সামরিক স্বৈরতন্ত্র। সংবিধান স্থগিত, রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত, মৌলিক অধিকার সহ সকল প্রকার অধিকার থেকে জনগনকে বঞ্চিত রেখে এরশাদ যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে ছিল সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এদেশের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। সামরিক শাসন জারিকালে এরশাদ যে বক্তব্য দিয়ে ছিলেন তার দীর্ঘ শাসন কালে। কেবল তার বরখেলাপই নয় বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরশাদ তাঁর বক্তব্যের পরিপন্থী কাজ করেছিলন। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলে গণতন্ত্রকে হত্যা করে ছিলেন তিলে তিলে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে এরশাদ ধ্বংস করে ছিলেন নিজ স্বার্থেই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চরিত্র হনন করে রাজনীতিকে রাজনীতির জন্যই কঠিন করে তুলে ছিলেন। হাসানুজ্জামান উল্লেখ করেন যে, "সংবিধান মৌলিক অধিকার ও জন স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগ, প্রচার মাধ্যমও সংবাদ পত্র, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, ধর্মীয় জীবন ও অর্থনীতি সব কিছু ছিল একচেটিয়াভাবে সামরিক বাহিনীর কুক্ষিগত। রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ কাজ থেকে শুরু করে শৌচাগার তৈরী পর্যন্ত সব কিছুতেই ছিল সেনা নিয়ন্ত্রণ এবং সেই একই কারণে প্রধান সেনা কর্তা জেনারেল এরশাদের চরম স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্র।"[৭] ১৯৮২ সালে এরশাদ সামরিক শাসনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে ছিলেন সেই রাজনৈতিক সংকটকেই পুঁজি করে রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এরশাদ তার ক্ষমতাকে দীর্ঘ স্থায়ী করে ছিলেন। কুট কৌশলের মাধ্যমে এরশাদ তার শাসন ক্ষমতাকে দীর্ঘ স্থায়ী করলেও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিরোধী দল কর্তৃক ব্যাপক আন্দোলনের ফলে এরশাদ কখনও সামরিক আইনের বিধি বিধান কঠোর করেছেন আবার কখনও নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের আবরণে ক্ষমতাকে সংহত করার চেষ্টা করেছেন। তাই এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরে বাংলাদেশে কখনও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিলো না।

খ) গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সুত্রপাত ঃ-

ছাত্র সমাজ সর্বদাই বিপ্লবে অগ্রসরমান। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ কর্তৃক সামরিক আইন জারির সাথে সাথেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহে বিক্ষোভ শুরু হলে সামরিক বাহিনী দ্রুত সেই বিক্ষোভ দমনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই ছাত্র সমাজ কর্তৃক সর্বপ্রথম এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তবে কঠোর সামরিক আইনের বিধি বিধানে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ থাকায় ছাত্র আন্দোলনও ছিল স্তব্ধ। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আব্দুল মজিদ খান বিতর্কিত শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। ঐ শিক্ষা নীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলামী ভাবধারা সমুন্নত রাখার জন্য আরবী ও ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা। ছাত্র সমাজ এর প্রতিবাদে সামরিক আইন উপেক্ষা করে ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৪টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঘেরাও কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল 'শিশু একাডেমী' পর্যন্ত অগ্রসর হলে সামরিক ও আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এতে বহু ছাত্র হতাহত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারী সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ঐ দিনও পুলিশ ঢাকা ও চট্টগ্রামে মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে নির্বিচারে ছাত্রদের হত্যা করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিহত হন জাফর, জয়নাল, মোজাম্মেল ও দীপালী সাহা সহ নাম না জানা অনেক শহীদ। ছাত্র সমাজের এই আন্দোলন পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে দারুন ভাবে প্রভাবিত করে মোহাম্মদ এ হাকিম তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন, " As political activities were banned the student movement "Was more symbolic, and was actually aimed at military rule"[৮] সামরিক শাসনাধীনে ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতেও মেরুকরণ শুরু হয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তথা এরশাদের পতন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত হয় দুইটি রাজনৈতিক জোট। অধিকাংশ বাম দল সমূহের সমন্বয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৫ দলীয় জোট। এ জোটের প্রধান প্রধান দল সমূহ হল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিবি, জাসদ, বাকশাল, একতা পার্টি, গণ আজাদী লীগ, ওয়ার্কাস পার্টি, সাম্যবাদী দল (তো) এবং মজদুর পার্টি। অন্য দিকে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশ জাতীয়াবাদী দল বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত হয় ৭ দলীয় জোট ; সাত দলের অন্যান্য শরিক দল

Dhaka University Institutional Repository

সমূহ হলো, ইউপিপি, ন্যাপ, জাতীয় লীগ, গণতান্ত্রিক পার্টি, কমিউনিষ্ট লীগ ও কৃষক পার্টি। ৭ দলীয় জোটে বাম ও ডান পন্থী দলের সম্মিলিত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৫ দলীয় জোট এরশাদের পদত্যাগ সামরিক আইন প্রত্যাহার সহ ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন সহ সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি করে। পক্ষান্তরে ৭ দলীয় জোট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এইচ, এম, এরশাদের পদত্যাগ সহ সামরিক আইন প্রত্যাহার ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রেখে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাবি করে। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে এরশাদ সামরিক শাসনাধীনে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিলে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বিরোধী দলকে সংলাপের আহবান জানালে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট উক্ত আহবান প্রত্যাখ্যান করে। ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্য জোটের মধ্যে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় জোট ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫ দফা ঘোষণা করেন। এই ৫ দফার ভিত্তিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন উভয় জোট। দফা গুলো হলো ঃ [৯]

১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
২. অবিলম্বে দেশে মৌলিক অধিকার সহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বাধা নিষেধ তুলে নিতে হবে।
৩. দেশে অন্য যে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই আগামী শীত মৌসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসাতে হবে, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সকল জাতীয় ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল মাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্য কারো নয়।
৪. রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।
৫. মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার বিচার, দোষীদের শাস্তি, নিহত-আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এই ৫ দফাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে সরাসরি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় ১৫ ও ৭ দলীয় জোট। ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে এরশাদ বিরোধী তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এর কারণ হল ১৪ নভেম্বর (১৯৮৩) থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়। মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এরশাদ তার ক্ষমতাকে সংরক্ষণ ও বিরোধী দল সমূহকে মোকাবেলা করতে ২৭ নভেম্বর (১৯৮৩) একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এরশাদের নির্দেশে ও সমর্থনে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসান উদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত নতুন এ সরকারী দলের নাম করণ করা হয় "জন দল"। বিভিন্ন সুবিধা ভোগী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দল ছুট কতিপয় নেতা এবং কোন কোন নেতা নিজ নিজ রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে সরকারী দল 'জন দলে' যোগদান করেন।

গ) খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আগমন ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়াঃ

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশে জাতীয়তা বাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা লেঃ জেঃ (অবঃ) জিয়াউর রহমান নিহত হলে তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ও জাতীয়তাবাদী দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ জীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ইমেজ ও সততার উপর ভিত্তি করে তারই প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি'র উত্তরাধিকারী হিসেবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ১৯৮৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে সামরিক বাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পর জেনারেল এরশাদ

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি'কে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন। আর এ কারণে সামরিক শাসক এরশাদ বিএনপি'কে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হবার পর দলীয় নেতৃত্ব কঠোরভাবে ধরে রাখতে পারেন নাই। বিচারপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব ও শাসক শ্রেণীর ইঙ্গিতে বিএনপি'র অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়। যদিও সামরিক শাসন জারির পূর্বেই উপদলীয় কোন্দাল শুরু হয়। এই উপদলীয় কোন্দলের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। বিচারপতি সাত্তারের বিরুদ্ধে কতিপয় বিদ্রোহী গ্রুপ এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, বিচারপতি সাত্তার মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করছেন না। এই অবস্থায় মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নী ও যোগ্য উত্তরসূরী বেগম খালেদা জিয়াকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও বেগম জিয়া রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। কেননা ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে বেগম জিয়াকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়নের আহবান জানানো হলে তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখান করেন এবং বিচারপতি সাত্তারের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে দলীয় আদর্শ সমুন্নত রাখা ও জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে রাজনীতিতে যোগদান করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন পদের নির্বাচনে 'চেয়ারপার্সন' পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। বিচারপতি সাত্তার বেগম জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বেগম জিয়াকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ খন্ডন করেন এবং বেগম জিয়ার প্রতি আস্থা স্থাপন করে এই বলেন যে "বেগম জিয়া যদি দলের চেয়ারপার্সন হতে ইচ্ছুক হন, সে ক্ষেত্রে তিনি নিজের মনোনয়ন পত্র বেগম জিয়ার অনুকূলে প্রত্যাহার করে নিবেন।" [১০] তিনি বেগম জিয়াকে এ বলেও আশ্বস্ত করেন যে, তিনি জিয়ার আদর্শের প্রতি অনুগত রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তার প্রতিটি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করবেন। এই প্রেক্ষিতে বেগম জিয়া বিচারপতি সাত্তারের প্রতি আস্থা স্থাপন করে এই পদে প্রতিদ্বন্দিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিচারপতি সাত্তার পক্ষান্তরে বেগম জিয়াকে উপরাষ্ট্রপতি বা উপদেষ্টা পদ গ্রহণের আমন্ত্রন জানান। কিন্তু বেগম জিয়া উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত দলীয় শৃংখলা ও নেতৃত্বের কোন সংকট সৃষ্টি না হলেও সামরিক শাসন জারির পর নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আমজাদ হোসেন তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "বিচারপতি সাত্তারের আমলে বিএনপি আভ্যন্তরীণ কোন্দল কলহে শক্তিহীন হয়ে পড়ে ছিল। জিয়াউর রহমানের স্থলে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দল পরিচালনায় যোগ্য ছিলেন না, উভয়ের ইমেজ ও একরকম ছিল না। বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ক্ষমতা থেকে সরে গিয়ে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পরেন দলটি বিপর্যস্ত হয়ে পরে।"[১১] বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দলীয় সুবিধা বাদী শ্রেণী সামরিক শাসকদের সঙ্গে আঁতাত করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। অবৈধ সামরিক কর্তৃপক্ষ বিএনপি কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিরোধের আশঙ্কায় বিএনপি'র সাংগঠনিক ভিত দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। বিএনপিকে নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে একদিকে নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার ও হয়রানির পথ বেছে নেয়। সামরিক শাসকদের রোষানলে পড়ে বিএনপি'র বহু সংখ্যক নেতাকর্মী অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন। অধিকাংশ প্রাক্তন মন্ত্রীদের গ্রেফতার করে তাদের সামরিক আদালতে বিচার কার্য শুরু করে। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক নেতা কর্মীদের দ্বারা উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করে দল ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। এমতাবস্থায়, "বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় জর্জরিত সাত্তার সাহেবের দুর্বল নেতৃত্বের কারণে চরম হতাশা গ্রস্ত বিএনপি'র নেতা ও কর্মীরা বেগম জিয়ার কাছে বিশেষ অনুনয় জানালেন ম্রিয়মান দলটির নেতৃত্বের হাল ধরার জন্য। তাদের আকুল অনুরোধ দলটিকে বাঁচাতে হবে, দলটির শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। দলের তৎকালীন ঘটনা প্রবাহে বেগম জিয়াও অসন্তুষ্ট ছিলেন।"[১২] উল্লেখ্য যে, এই অবৈধ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা বা প্রতিবাদ জানানোর মত এমন কোন নেতা বা সংগঠন ছিল না যার মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেত্রী, শেখ হাসিনা সবে মাত্র দীর্ঘ দিন বিদেশে স্বেচ্ছা নির্বাসন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে আওয়ামী লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও '৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক ভাবে তখন পর্যন্ত তেমন শক্তিশালী ভিত গড়ে তুলতে পারেন নাই। তাছাড়া বিএনপি'র কাছ থেকে সামরিক শাসক এরশাদ ক্ষমতা কেড়ে নেয়ায় আওয়ামী লীগ মনে মনে খুশীই হয়ে ছিল। কেননা বিএনপি ছিল আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন। কাজেই ঐ মুহূর্তে আন্দোলন কিংবা প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করেন নাই। ফলে একদিকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গড়ে তোলা সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী দলের (বি,এন,পি) অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও অন্য দিকে অবৈধ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দৃঢ় শপথ নিয়ে বেগম জিয়া গৃহবধু থেকে ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল এরশাদ কর্তৃক ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার পূর্বেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাজনীতিতে পদার্পন করেন। ১ এপ্রিল (১৯৮৩) বিএনপি'র কাউন্সিলের বর্ধিত সভায় দলের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে নব নিযুক্ত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শ ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শোষণ ও নিপীড়নহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার আদর্শ, আর এ জন্যই তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি দিয়ে ছিলেন। জিয়াউর রহমান উৎপাদনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। সেই মহান নেতার স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব হবে তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করা। আমি দেশ প্রেমিক ও প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী সমূহের প্রতি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহবান জানাই" [১৩] বেগম জিয়া রাজনীতিতে যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান নীতি নির্ধারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের 'চেয়ারপার্সন' মনোনীত হন ১৯৮৪ সালের ১২ জানুয়ারী। বেগম জিয়ার যোগ্য নেতৃত্ব ও আন্দোলনের ফলে বিএনপি বারবার ভাঙ্গনের কবলে নিপতিত হলেও দলীয় অস্তিত্ব অটুট রেখে আপোষহীন নেত্রী হিসেবে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ এর নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভে সহায়তা করেছিল।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানের পর বেগম জিয়ার উপর দ্বৈত দায়িত্ব অর্পিত হয়। একদিকে পার্টির শৃংখলা ফিরিয়ে আনা ও পার্টি পুনর্গঠিত করে শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়ন করা, অন্যদিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করা ও গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। যদিও বেগম জিয়ার রাজনীতিতে যোগদানের সময় ও পরবর্তীতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এরশাদের কুটনীতি ও প্রলোভনে বিএনপি'তে ভাঙ্গন দেখা দেয়। কিন্তু বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি'র "মূলধারা" কখনও বিচ্যুতি হয়নি বা পার্টির ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়নি।

বিএনপি'তে প্রথম ভাঙ্গন দেখা দেয় ১৯৮৩ সালে ১ এপ্রিল। বিএনপি'র সাবেক মন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন, শাসুল হুদা চৌধুরী ও জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সহ বেশ কিছু নেতা এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রথমে পৃথক গ্রুপ গঠন এবং পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে স্বৈরাচারের দোষরে পরিণত হয়। এরপর বিএনপি থেকে এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন সাবেক মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) হালিম চৌধুরী। উল্লেখ্য ক্যাপ্টেন (অবঃ) হালিম চৌধুরী এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্য জোটের লিয়াজোঁ কমিটির দায়িত্ব পালন করতে ছিলেন। ১৯৮৫ সালে এরশাদের অনুপ্রেরণা ও চক্রান্তে বিএনপি ছেড়ে নতুন গ্রুপ গঠন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে ব্যারিষ্টার সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, মাঈদুল ইসলাম ও আব্দুল আলীম এবং পরবর্তীতে শাহ আজিজ পৃথক বিএনপি গঠন করে এরশাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ফ্রন্টে যোগদান করেন এবং শাহ আজিজের অনুসারীগণ এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রীত্বের আশ্বাস দিয়ে বিএনপিকে ভাঙ্গার পরেও এরশাদ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। ১৯৮৮ সালে সরকারী ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বিএনপি'র মহাসচিব কে, এম,

Dhaka University Institutional Repository

ওবায়দুর রহমান ও প্রাক্তন মন্ত্রী ও ঢাকার মেয়ের ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাতকে বহিস্কার করেন। কে.এম. ওবায়দুর রহমান সরকারী দলে জায়গা না পেয়ে 'জনতাদল' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ১৯৮৮ সালেই মওদুদ আহম্মদ বিএনপি ছেড়ে এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী এবং উপরাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। শুধু বিএনপি নয় এরশাদ ৭ দলীয় জোটের অন্যান্য শরীক দল থেকেও নেতা ভাগিয়ে নিয়ে মন্ত্রী করে আন্দোলন স্তব্ধ করতে চেয়েছিলো। ১৯৮৫ সালে বিএনপি'র শরীক ৭ দলের কাজী জাফর আহম্মদ, সিরাজুল হোসেন খান ও আনোয়ার জাহিদ এরশাদের দলে যোগদান করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। বিএনপি থেকে এবং ৭ দল থেকে অধিকাংশ নেতা আন্দোলনে ছুরিকাঘাত করে এরশাদের দলে যোগদান করা সত্ত্বেও বেগম জিয়া ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রপথিক এবং এরশাদের আতঙ্কে পরিনত হয়ে ছিলো। প্রেসিডেন্ট এরশাদ খালেদা জিয়া এবং বিএনপি'র প্রতি এতটাই প্রতিহিংসা পরায়ন ছিল যার প্রমান পাওয়া যায় সাংবাদিক গাফফার চৌধুরীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে। গাফফার চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে এরশাদ বলেছিলেন, "আমি যা করতে চাইছি তা হচ্ছে বিএনপি'র ভেতর ফাটল ধরান; কারণ, এই দলটি আমার সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পায়তারা করছে। আমি দলটি ভেঙ্গে দিয়েছি। এখন আর বিএনপি নেই। এখন আছেন খালেদা জিয়া এবং শাহ আজিজ।"[১৪] স্বৈরশাসকরা যে কোন আন্দোলনকে বিপ্লব হিসেবেই দেখেন। এরশাদও তাই দেখেছিলেন। বিএনপি বলতে খালেদা জিয়া এবং শাহ আজিজ নয় এ ধারণাকে ভ্রান্ত করতে পেরেছিলেন বেগম জিয়া। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা যে উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ছিল তা প্রমান করে ছিল স্বৈরচারের পতনের পর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে। অন্য দিকে শাহ্ আজিজ বিএনপির কোন ক্ষতি করতে পারেন নাই, তার প্রমান মৃত্যুর পূর্বে শাহ্ আজিজ বেগম খালেদা জিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপিতে পুনঃপ্রবর্তনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। বেগম জিয়া উদারতার সাথে শাহ আজিজের সেই অন্তিম ইচ্ছার মূল্য দিয়ে ছিলেন।

বেগম জিয়া দল পুনর্গঠন করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে সপে দিয়ে ছিলেন। ১৯৮৩ সালে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের পাঁচ দফা প্রণয়নের পূর্বেই বেগম জিয়া শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকীতে মরহুম জিয়াউর রহমানের মাজার থেকে বিরাট শোভা যাত্রার নেতৃত্ব দিয়ে সামরিক আইন ভঙ্গ করেছিলেন। যদিও তখন সামরিক আইনে প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্ম ও শোভা যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। বেগম জিয়া সর্ব প্রথম সেই নিষেধ অমান্য করে ছিলেন। একই বছর ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের কর্মসূচি পালন কালে বেগম জিয়া বলেছিলেন, "সরকার যতদিন পর্যন্ত পাঁচ দফার দাবি মেনে না নেয় ততদিন এই আন্দোলন চলবে।"[১৫]

বেগম জিয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও স্বৈরশাসনের অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলনের পাশাপাশি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধানের প্রচেষ্টায়ও সাড়া দিয়েছিলেন। বেগম জিয়া ১৯৮৪ সালের ৯,১২ এবং ২০ এপ্রিল ৩ দফা ৭ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে এরশাদের সাথে সংলাপে অংশ নিয়ে ছিলেন। ৯ এপ্রিল সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনর সুযোগ ছিলোনা। তবে ৭ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে ৩৩ দফার একটি দাবি নামা সরকারের কাছে পেশ করা হয়ে ছিল। ২০ এপ্রিল বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট সংলাপে অংশ নিয়ে ৫ দফার পাশাপাশি নিম্ন লিখিত ৩টি প্রধান দাবি পেশ করেনঃ[১৬]

(১) সামরিক আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ব্যবস্থাদি ঘোষনা করতে হবে

(২) ২৭ মে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে : এবং

(৩) একটি সার্বভৌম সংসদের জন্য সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

সংলাপ কিংবা আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধানে এরশাদ বিশ্বাসী ছিলো না। এরশাদের এই কুট

কৌশল বুঝতে পেরে ২৪ এপ্রিল(১৯৮৪) রংপুরের এক জনসভায় বেগম জিয়া ঘোষণা করলেন, "আর কোন বৈঠক করা হবে না এবং এরশাদ সাহেবকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দিলেন। নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার কোন ঘোষণা না দিলে তিনি নিজেই কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।" [১৭] এর মধ্যে এরশাদ ১৯৮৫ সালের ৬ এপ্রিল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেন কিন্তু আন্দোলনের মুখে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচন স্থগিত করে গণভোটের আয়োজন করেন। ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্য জোটের যুগপৎ আন্দোলন পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক দুরদর্শিতা পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে এরশাদ '৭২ সালের সরকারের বৈধতার প্রশ্ন তুললে, বেগম জিয়া এক বিবৃতিতে বলে ছিলেন, " স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী জনগণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে নিজ নিজ পেশায় ফিরে গেছেন। অথচ এই সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন।" [১৮] গণতন্ত্র ও সংবিধানের প্রতি অবিচল আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করে বেগম জিয়া এরশাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারেন নাই।

সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬ ঃ

এরশাদ তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকেই রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেন। বিরোধী দলের বাধা ও আন্দোলনের মুখে একবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ৩ বার সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। স্থানীয় পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন ও একবার স্থগিত করতে হয় বিরোধী দলের বাধার কারণে। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ২৭ মে সর্বপ্রথম এরশাদ একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু বিরোধী দলের দাবি ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তাই বিরোধী দলের প্রবল আন্দোলনের মুখে এরশাদ ২৭ মে (১৯৮৪) ঘোষিত রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। এরপর ১৯৮৪ সালের ৮ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষনা করেন। কিন্তু বিরোধী দল সামরিক শাসনের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে ৮ ডিসেম্বরের নির্বাচন ও স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন, এরপর এরশাদ ২১ মার্চ (১৯৮৫) তারিখে তথা কথিত 'গণ ভোটের'র আয়োজন করে আপাতঃ ক্ষমতাকে সংহত করতে সক্ষম হন। এরশাদ পুনরায় ৬ এপ্রিল (১৯৮৫) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু এবারও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলে ৬ এপ্রিলের অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন ও স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। ১ জানুয়ারী (১৯৮৬) এরশাদের আর্শীবাদ পুষ্ট হয়ে ইতিপুর্বে গঠিত 'জাতীয় ফ্রন্ট' বিলুপ্ত ঘোষণা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সমন্বয় 'জাতীয় পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়। সরকারের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠা এই জাতীয় পার্টির মাধ্যমে এরশাদ রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। এ লক্ষ্যে এরশাদ ১৯৮৬ সালের ২৭ এপ্রিল তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্য জোট সম্মিলিত ভাবে ঐ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা এবং নির্বাচন প্রতিহত করার কথা ঘোষনা করেন। নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন অর্থাৎ ২২ মার্চ (১৯৮৬) ১৫ ও ৭ দল সকাল সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল আহবান করেন। নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিল ও বিরোধী দলের হরতাল কর্মসূচির ১দিন পূর্বে ২১ মার্চ (১৯৮৬) রাতে এরশাদ এক রেডিও টেলিভিশনের ভাষণে বিরোধী দলকে ১ দিনের মধ্যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানাতে বলেন। অন্যথায় নির্বাচন বিরোধী সকল প্রকার তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণে রাজি হলে তিনি কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এগুলো হলো ঃ [১৯]

(১) পবিত্র রমজান মাস শুরু হবার আগে কোন একটি উপযুক্ত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ২২ শে মার্চ থেকে শুরু করে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমাসহ নির্বাচনী তফসিল পুনর্বিন্যাসের জন্য নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দেয়া হবে।

(২) নির্বাচন-প্রার্থী মন্ত্রীবর্গ পদত্যাগ করবেন। ফলে মন্ত্রিপরিষদ স্বাভাবিকভাবে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

(৩) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক, উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক, জেলা সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও অফিস এবং সামরিক আইন আদালত বিলুপ্ত করা হবে।

(৪) উপজেলা চেয়ারম্যানসহ প্রশাসনের সাথে জড়িত কেউ কোন দল বা ব্যক্তিগত প্রচার কার্যে সরকারী সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলনেত্রী ও ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এরশাদের সকল ধমক ও চোখ রাঙ্গানিকে উপেক্ষা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ১৫ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ১৫ দলের ৮ দলকে সঙ্গে নিয়ে রাতারাতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আন্দোলনে ছুরিকাঘাত করেন। এবং এরশাদের ইচ্ছা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেন। যদিও এর মাত্র দু'দিন পূর্ব ১৯ মার্চ চট্টগ্রামের লাল দীঘি ময়দানে এক বিশাল জন সভায় আওয়ামী লীগ নেত্রী ও ১৫ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করে ছিলেন, "সামরিক আইনকে গণতন্ত্রের লেবাস পরানোর নির্বাচনী নাটক যে কোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে।" শুধু তাই নয় এরশাদের অধীনে যারা নির্বাচনে যাবে তারা "জাতীয় বেঈমান" হিসেবে পরিচিত হবে।"[২০] শেখ হাসিনা নিজেই নিজের দেয়া ফাঁদে ধরা পড়লেন। জাতীয় বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত হলেন। এরশাদকে গণতন্ত্রের লেবাস পরাতে নিজেই উদ্যোগী হলেন। ১৫ দল ভেঙ্গে ৮ দলে পরিনত হলো। পক্ষান্তরে বেগম জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হলেন এবং ৭ দলীয় জোটের ঐক্য অটুট রাখলেন। বেগম জিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করা হলো, " Had Begum Zia been successful in forcing the rnoval of president Ershad, in gaining credit for the lifting at Martial law, BNP credibility would have been greatly enhanced,"[২১] আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণে রাজি হওয়ায় এরশাদের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদানের সম্ভাবনা দেখা দিল। বেগম জিয়া এরশাদের পরিকল্পনা পূর্বেই অনুধাবন করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে রাজি হন নাই। বেগম জিয়া এরশাদের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার নির্বাচনে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন যে, "২২ দলের যুক্ত বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যারা পাঁচ দফার দাবী অগ্রাহ্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তারা জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হবে। আজ জাতি বিশ্বাস ঘাতকদের চিহ্নিত করতে পারবে। আমারা একটা বে-আইনি সরকারকে আইনের সমন দেবার জন্য নির্বাচনে যোগদান করতে পারি না।" [২২] অথচ আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৪৮ ঘন্টা পূর্বে দেয়া নিজের বক্তব্য খন্ডন করে নিজের সাথে দলের সাথে এমন কি জাতির সাথে বেঈমানী করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ছিল। জামায়াতে ইসলাম ও আওয়ামী লীগকে অনুসরণ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলো। 'জামায়াতে ইসলামী' বাংলাদেশ বরাবরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুবিধা বাদী হিসেবে বিবেচিত। বেগম জিয়া এও আশঙ্কা করে ছিলেন যে এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচন সুষ্ঠ হবে না। এরশাদ তার ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়ার জন্যই নির্বাচনে বিরোধী দলকে রাজি করিয়েছে। এরশাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের দুই জোটের যে কোন একটি জোটকে নির্বাচনে রাজি করাতে পারলে একদিকে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে ও আন্দোলন বিনষ্ট করতে পারবে, অন্যদিকে নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ প্রশাসনকে গণতন্ত্রের লেবাস পরিয়ে নিজ ক্ষমতাকে বৈধ করতে পারবে। নির্বাচনের ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এরশাদের নবগঠিত জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লাভ করে মাত্র ৭৬টি আসন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ লাভ করে ১০টি আসন। উক্ত নির্বাচনে তৃতীয় বৃহত্তম আসন লাভ করে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যবৃন্দ তাদের প্রাপ্ত আসন ৩২টি। তবে দলগত ভাবে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় অবস্থানে থেকে বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য দল ২৯ টি আসন লাভ করে। (সারণী ঃ ৩.১)

সারণী ঃ ৩.১

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় অবস্থান ঃ

পার্টি/স্বতন্ত্র	বিজয়ী আসন সংখ্যা	বিজয়ী আসনের শতকরা হার (%)	মোট প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত মোট ভোটের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার (%)
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০০	১,২০,৭৯২৫৯	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	২৫.৩৩	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬
জামায়াত-ই-ইসলামী	১০	৩.৩৩	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৫	১.৬৬	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৫	১.৬৬	২,৫৯,৭২৮	০.৯১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(রব)	৪	১.৩৩	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪	১.৩৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	৩	১.০০	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	৩	১.০০	১,৯১,১০৭	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়ার্কস পার্টি	৩	১.০০	১,৫১,৮২৮	০.৫৩
ন্যাপ(মোজাফফর)	২	০.৬৬	২০,৩৩৬	০.৭১
অন্যান্য দল সমূহ	-	-	৪,৯০,৩৮৯	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯

সূত্র ঃ Muhammad A. Hakim, *Bangladersh Politics : The Shahuddin Interregnum*, Dhaka : UPL, 1993, P-25-26.

ব্যাপক ভোট ডাকাতি ও কারচুপি পূর্ণ এই নির্বাচনের গ্রহণ যোগ্যতা ছিল খুবই কম। Muhammad A. Hakim তার বইয়ে উল্লেখ করেন, "The third parliamentary election were held in an atmosphere of deadly violence and total lawlessness that lift at least fifteen perosns killed and 750 injured on the electiion day" [২৩] নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন, " এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই জাল ভোট প্রদান এবং সর্বোপরি, সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্রসহ নির্বাচন কমিশনকে ভীতি প্রদর্শনে সরকারের পক্ষে ব্যবহার করে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ৮ দলীয় ঐক্য জোটের (প্রকৃত) বিজয়কে নস্যাৎ করা হযেছে।" [২৪] এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ তাদের জনপ্রিয়তা অনেকটা হারিয়ে ছিলেন যা পরবর্তীতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের একটি অন্যতম কারণ ছিল। এরশাদ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ দ্বারা তার ক্ষমতাকে বৈধ করতে পেরেছিলেন। ৩০ জন মহিলা সাংসদ সহ জাতীয় পার্টির আসন সংখ্যা দাড়ায় ১৮১। এরশাদ কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করায় অধিকাংশ স্বতন্ত্র সাংসদ জাতিয় পার্টিতে যোগদান করায় জাতিয় পার্টির আসন সংখ্যা ২০০ এর কাছাকাছি পৌছায়। জাসদ (রব) সহ ছোট ছোট দলগুলির সমর্থন পেয়ে এরশাদ অনায়াসেই সংবিধানের ৭ম সংশোধনী পাস করিয়ে নেন। কাজেই দেখা যায় যে, এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের সামরিক আইন জারি সহ, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসক এরশাদ কর্তৃক সকল প্রকার সামরিক আদেশ, ফরমান ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবিধানের যে সকল পরিবর্তন এনেছিলেন তা

Dhaka University Institutional Repository

বৈধ করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ গ্রহণ না করলে ৭ দলীয় ও ১৫ দলীয় ঐক্য জোটের যে ঐক্য হয়েছিল সেই ঐক্য অটুট থাকলে এরশাদের পতনের জন্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না। ১৯৮৬ সালেই এরশাদের পতন ঘটানো সম্ভব ছিল। বেগম জিয়া এই উপলব্ধি করতে পারলেও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে মোহাম্মদ এ হাকিম আরও উল্লেখ করেছেন, " The arch critics of AL claimed that the guiding force behind the party's decision to participate in the 1986 election was an unwritten, "seat sharing agreement 'With the JP of Ershad and an unholy alliance with his regime" [২৫] তাই দেখা যায় যে এই আসন ভাগাভাগির নির্বাচন বেগম জিয়া সমর্থন করতে পারেন নাই। তাই বেগম জিয়া শুধু নির্বাচন বয়কট নয় নির্বাচন বিরোধী প্রচারণাও চালিয়েছেন। বেগম জিয়ার এই আপোষহীন মনোভাব এবং নির্বাচন বিরোধী কর্মকান্ডের কারণে সামরিক শাসনের রোষানলে পড়ে হয়রানির শিকার হতে হয়। বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনে ভোট না দেয়ার জন্য সভা সমাবেশ অব্যাহত রাখেন। ৩০ এপিল (১৯৮৬) বেগম জিয়া জামালপুরে এক জনসভা থেকে ঢাকা ফেরার পথে নিখোজ হন। এ সম্পর্কে ৪ মে বেগম জিয়া ঢাকা কোর্টের বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানান যে, " ৩০ এপ্রিল জামালপুর থেকে ঢাকা ফেরার পথে প্রায় রাত সাড়ে দশটায় তাঁরা দেখেন যে, রাস্তার উপর এক সারী ট্রাক রেখে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে তাঁরা রাস্তার উপর গাড়ী থামাতে বাধ্য হয়। সে সময় তাদেরকে কালিয়াকৈর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সঙ্গে পুরুষ সঙ্গীদের থানায় গ্রেফতার করে রেখে দেওয়া হয় এবং তাঁকে এবং মহিলা সঙ্গীদের চলে যেতে বলা হয়। উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ নিজেকে ড্রাইভার পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে থাকেন এবং ঢাকার পথে গাড়ী চালাতে শুরু করেন। কিছুক্ষন চলার পর আবার গাড়ী থামান হয়। তখন অন্য একটি গাড়ীতে করে তাদেরকে সাভার অঞ্চলের দিকে নেয়া হয় এবং একটি একতলা বাসায় উঠানো হয়। প্রায় ৪ দিন তাদেরকে সেই বাসায় রাখার পর কয়েকজন সাদা পোষাকধারী লোক তাদেরকে দুপুরের দিকে সাভার জাতীয় স্মৃতি স্তম্ভের কাছে এনে ছেড়ে দেয়। সেখান থেকে তারা একটি বেবীটেক্সি করে ঢাকা কোর্টে সোজা চলে এসেছেন।"[২৬] একথা কারো বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সরকারই তাঁর লোকজন দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয় বেগম জিয়ার অজ্ঞাত স্থান থেকে চলে আসার পরের দিন বায়তুল মোকাররমে একটি নির্বাচন বিরোধী জনসভায় ভাষণ দেয়ার কথা ছিল কিন্তু সরকারের অনুগত বাহিনী বেগম জিয়াকে তার বাড়ীর বাইরে বের হতে দেয়া হয়নি, এমন কি তার বাড়ীর টেলিফোন সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়ে ছিল। পুলিশ বিএনপি আহূত এই জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেয় নাই। বেগম জিয়া অন্তরীণ থাকার কারণে ৮ মে (১৯৮৬) বিএনপি নেত্রী ফরিদা রহমান একটি হেবিয়াস কার্পাসের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৯ মে (১৯৮৬) থেকে বেগম জিয়ার অন্তরীণ তুলে নেয়া হয়। [২৭]

তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করেন ৮ দলীয় জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে যে ভুল করেছিল পরবাঁতে এরশাদ আয়োজিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। ৭ দলীয় জোট নেত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পূর্ব থেকেই এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও অংশ গ্রহনে অস্বীকৃতি জানান। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৭ দল, বামপন্থী ৫ দলীয় ঐক্য জোট এবং জামায়াতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে। বিরোধী দল ও জোট সমূহের বর্জন সত্ত্বেও এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এরশাদ যাতে কোন রূপ বাধার সম্মুখীন না হন সেজন্য এক সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান বা এ ধরণের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকর কোন সংবাদ মতামত প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [২৮] কড়া সামরিক বিধি বিধানের মধ্যে অনুষ্ঠিত তৃতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এরশাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের স্বঘোষিত খুনী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ফারুকুর রহমান সহ কয়েকটি নাম সর্বস্ব দলের মনোনীত প্রার্থী। যার ফলে অনেকটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরশাদ বাংলাদেশের তৃতীয় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিরোধী দলের অনুপস্থিতি এবং ভোটার বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের লেবাস পরাতে সক্ষম হলেও রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হন নাই। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের সমন্বয়ে গঠিত জোট এরশাদের ফাঁদে ধরা দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পর মাত্র এক বছরের মধ্যেই তাদের মোহমুক্তি ঘটে। আওয়ামী লীগ সহ ৮দলীয় জোট পুনরায় খালেদা জিয়ার সাথে রাজপথের আন্দোলনে শরীক হলেন। একনায়ক এরশাদ সামরিক স্বৈরতন্ত্র থেকে অনুগত সাংসদদের মাধ্যমে সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী পাসের পর ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) সংশোধনী বিল কয়েক মিনিটের মধ্যে পাস করিয়ে নেন। উক্ত বিলে সামরিক কর্মকর্তাদের জেলা পরিষদে সম্পৃক্ত করার বিধান ছিল। বিল পাসের ১দিন পূর্বে টঙ্গীর এক বিশাল জনসভায় ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করলেন, " জেলা পরিষদে সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি গ্রহণ সহ প্রশাসনের সামরিকীকরণ সরকারের কোন উদ্যোগ সহ্য করা হবেন।" [২৯] বিল সংসদে পাস হওয়ার পর জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দল সমূহ সংসদ ত্যাগ করে রাজপথের আন্দোলনে শরীক হন। বিরোধী দলের আন্দোলন ও দাবির মূখে এরশাদ ১ আগষ্ট (১৯৮৭) 'জেলা পরিষদ বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরৎ পাঠান। এই ঘটনার পর পুনরায় ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদের পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিরোধী দল এক দফার দাবিতে অবতীর্ণ হন, তা হল এরশাদের পদত্যাগ। যদিও পূর্ব থেকেই ৭ দলীয় জোট এবং ১৫ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসা ৫ দলীয় জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রেখে ছিলেন। আওয়ামী লীগ সহ ৮ দল ১৯৮৬ সালে ৭ দলীয় জোট ও ৮ দলের শরীক ৫ দলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সত্ত্বেও ১ বছর পর ১৯৮৭ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় রাজপথে প্রত্যাবর্তন করার পর বেগম জিয়া গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং স্বৈরতন্ত্রের পতনের লক্ষ্যে ৮ দলের আহবানে ঐক্যবদ্ধ যুগপৎ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। বেগম জিয়ার রাজনৈতিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ এম, এ, ওয়াজেদ মিয়ার আনবিক শক্তি কমিশনের সরকারী বাসভবনে এক শীর্ষ বৈঠকে যোগদান। এবং উক্ত বৈঠকে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর এক যৌথ ঘোষণায় রাজী হওয়া। উক্ত যৌথ ঘোষণা বলা হয়েছিল, " স্বৈরাচারী (এরশাদ) সরকারের পতন ঘটানোর জন্যে আমরা ১লা ও ১০ই নভেম্বর সহ আন্দোলনের সকল কর্মসূচীর সাফল্যের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবো। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭১ এর চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের লক্ষ্য। এরশাদ (স্বৈরাচারী) সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা আহবান জানাই।" [৩০] ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের ঐক্য বদ্ধ আন্দোলনের মূখে সরকার দিশেহারা হয়ে যায়। ১০ নভেম্বর (১৯৮৭) বিরোধী দল ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এর ১ দিন পর ১১ নভেম্বর এরশাদ ঢাকা পুর্বানী হোটেল থেকে বেগম খালেদা জিয়াকে এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে নিজস্ব বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে নিজ নিজ বাড়ীতে অন্তরীণ রাখেন। দুই জোট নেত্রী অন্তরীণ হলেও এরশাদ বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত করতে পারে নাই বরং আন্দোলন আরো জঙ্গীরূপ ধারন করলে ২৭ নভেম্বর (১৯৮৭) এরশাদ সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। জরুরী অবস্থা দিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে না আনতে পেরে ৬ ডিসেম্বর (১৯৮৭) এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১০ ডিসেম্বর এরশাদ ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনাকে নিজ নিজ অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি দেন। এবং কারাগারে আটক অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে ও মুক্তি দেয়া শুরু হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৮ ঃ

১৯৮৭ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর বিভিন্ন মহল থেকে ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটের নেতৃবৃন্দকে নূন্যতম ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের আহবান জানান। ৮ দলীয় জোট তখনও নির্বাচনে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত ছিল যদি বেগম জিয়ার ৭ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে ডঃ এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া নিজেই স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ৭ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে কিনা প্রশ্ন

উথাপন করলে বেগম জিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে ছিলেন, " এরশাদের পদত্যাগের পূর্বে ৭ দলীয় ঐক্য জোটের কোনও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না।"[৩১] এমনকি ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটত্রয়ের নূন্যতম ঐকমত্য ও কর্মসূচির ভিত্তিতে ও তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। বেগম জিয়ার অনমনীয়তা এবং আপোষহীন মনোভাবের কারণে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে পুনরায় ঝুকি নিলেন না। ৮ দলীয় জোট ৭ ও ৫ দলীয় জোটকে অনুসরণ করে আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেন। এরশাদ বিরোধী দল সমূহকে বাদ দিয়েই ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভোটার বিহীন ও কারচুপি পূর্ণ ঐ নির্বাচনে এরশাদের নির্বাচনী সহযোগী ছিল জাসদ (রব) নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী দল (COP), যাদেরকে সরকার অনুগত বিরোধী দল বলা হতো। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই নির্বাচন, সবচেয়ে জঘন্যতম, কারচুপি পূর্ণ, ভোট ডাকাতি, ভোটার বিহীন ও প্রহসন মূলক নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় কালিমা লেপন করে ছিল মোহাম্মদ এ হাকিম ঐ নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, " The fourth Jatiya Sangsad election were marked by unprecedented rigging" [৩২] নির্বাচনের ফলাফল পূর্বেই প্রস্তুত করে রাখা ছিল। ৩০০ আসনের মধ্যে ২৫১ টি আসন জাতীয় পার্টি নিজেদের জন্য রেখে বাকী আসন সমূহ জাসদ রবের, নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সমূহকে বন্টন করে দেয়। আসন ভাগাভাগিতে 'COP' ১৯টি আসন লাভ করলে ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ২৫টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্র সদস্যগণ। অন্যান্য ক্ষুদ্র দল গুলো পায় ৫টি আসন (সারনী ৩.২)। জাতীয় পার্টির ২৫১ জনের মধ্যে ১৮ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

সারণী ঃ ৩.২

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ মার্চ ১৯৮৮ এর ফলাফল বিবরণী ঃ

দল/স্বতন্ত্র	বিজয়ী আসন সংখ্যা	বিজয়ী আসনের শতকরা হার (%)	সর্বমোট প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত মোট ভোটের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার (%)
জাতীয় পার্টি	২৫১	৮৩.৬৬	১,৭৬,৮০,১৩৩	৬৮.৪৪
সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)	১৯	৬.৩৩	৩২,৬২,৩৪০	১২.৬৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সিরাজ	৩	১.০০	৩,০৯,৬৬৬	১.২০
ফ্রিডম পার্টি	২	.৬৬	৮,৫০,২০৪	০.*৪
অন্যান্য দল সমুহ	-	-	২,৪২,৫৭১	০.৯৪
স্বতন্ত্র	২৫	৪.৩৩	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৫০

সূত্র ঃ Muhammad A. Hakim, *Bangladesh politics : The shahabuddin Interregnum,* Dhaka : UPL, 1993, P-30-31

নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য ৮,৭ ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচি দেয়া সত্ত্বেও নির্বাচন প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই। নির্বাচনের পরও দুই বৃহৎ জোটের ঐক্যের অভাবে ব্যাপক ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এম,এ, ওয়াজেদ মিয়া এই 'ব্যর্থতার জন্য দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে উল্লেখ করেন যে, "দেশের দুইটি বৃহৎ রাজনেতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে আদর্শগত এবং রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ এছাড়াও ঐ দল দুইটির নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পারিক অবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও অনেকাংশে দায়ী" ।[৩৩] কিন্তু রাজনৈতিক উদারতা ও ঐক্য অটুট রাখার প্রশ্নে বেগম জিয়ার আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলনা। তার প্রমান পাওয়া যায়, ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারী বেগম খালেদা জিয়া নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য ৮ দলীয় নেত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে উপস্থিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়ার এই আকস্মিক আগমনে শেখ হাসিনা বিস্মিত হয়ে বিদায় বেলায় বেগম জিয়ার কাছে আগমনের কারণ জানতে চাইলে বেগম জিয়া বলে ছিলেন, "আমি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর জন্যই এসেছিলাম।"[৩৪] বেগম জিয়া পারস্পারিক অবিশ্বাসও সন্দেহ দুর করার জন্যই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক সাংস্কৃতির জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিক। যা বেগম জিয়া অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তবুও দুই জোটের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাও সমঝোতা গড়ে উঠে নাই। ১৯৮৮ সালের পর থেকে ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত শীর্ষ জোট দ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ অব্যাহত থাকায় কোন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নাই। রাজনৈতিক ঐক্য ধরে রাখার জন্য বেগম জিয়ার প্রচেষ্টা কখনও কম ছিলনা। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারী চট্টগ্রামের লাল দিঘি ময়দানে ৮ দলীয় ঐক্য জোটের জনসভা পুলিশ গুলি চালালে ঘটানাস্থলে ১১ জন নিহত হন এবং ৫৬ জন আহত হন যাদের মধ্যে অধিকাংশ পরবর্তীতে বিভিন্ন হাসপাতালে নিহত হন। এরশাদের পুলিশ বাহিনীর এই বর্বরোচিত ঘটানায় দেশ ব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়াও আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য দলের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। চট্টগ্রামের ঐ পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারী (১৯৮৮) ঢাকায় একটি সর্বদলীয় প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ছিল। সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐ প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হবার কথা ছিল। শুধু উপস্থিত নয় সভাশেষে শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া যৌথ ভাবে সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিবেন। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিমের পরিচালনায় সভা শুরু হবার পর বেগম জিয়া নির্ধারিত সময়ে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হলেও কেবল মাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বেগম জিয়ার উপস্থিতির কারণে শেখ হাসিনা প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হন নাই মোহাম্মদ নাসিম পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে ছিলেন যে, শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া শোক মিছিলের নেতৃত্ব দিবেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে বেগম জিয়াকে এককভাবে সেই শোক মিছিলের নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। জনগণ এক মঞ্চ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রত্যাশা করেছিল কিন্তু বেগম জিয়ার একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ইর্শান্বিত হবার কারণে তা সম্ভব ছিলো না। এরপরও বেগম জিয়া ঐক্যবদ্ধ ও এক মঞ্চ থেকে আন্দোলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৮) বেগম জিয়া ঢাকায় এক জনসভা থেকে শেখ হাসিনাকে একমঞ্চ থেকে একটি যৌথ কর্মসূচি ঘোষণা করার আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, "আসুন আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনার থেকে যৌথভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করি।"[৩৫] কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা উক্ত আহবানে সাড়া দেন নাই। শেখ হাসিনা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এরশাদের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরিবর্তে '৭২ এর শাসনতন্ত্র ও সরকার পদ্ধতি প্রশ্নে ঐক্যমতের ওপর জোর দেন। সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৮) বেগম খালেদা জিয়া এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন, " জাতি আজ প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং তার সরকার পতনের পর একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে একত্রিত হয়েছে। নির্বাচনে যে দল বিজয়ী হবে তারা সরকারের ভবিষ্যৎ রূপ রেখা সংসদে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে আগে থেকে আলোচনা করা নিষ্ফল।"[৩৬] বেগম জিয়া জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করে ছিলেন এবং সরকার পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্র প্রশ্নে জনগণই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করণীয় নেই। বেগম জিয়ার এই উপলবদ্ধি রাজনৈতিক দুরদর্শিতার সাক্ষ্যবহন করে। কাজেই এরপর সরকার পদ্ধতির প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক থাকা বাঞ্চনীয় নয়। বেগম জিয়া এ কথাও প্রমান করেছিলেন যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প নেই। বেগম জিয়া তাই সকল দাবী অগ্রাহ্য করে একটি মাত্র দফার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনায় অবতীর্ণ হলেন। আর তা হল এরশাদের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন। কিন্তু শেখ হাসিনা এক দফার স্থলে ৭ দফা উপস্থাপন করে এক দফার দাবিকে হালকা করে ফেললেন।

এরশাদ বিরোধী চুড়ান্ত আন্দোলন ঃ

দীর্ঘ ৯ বছর স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে ' ৯০ এর শেষে। তবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্যায় উন্নীত করতে বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট বিশেষ ভূমিকা পালন করে । শেখ হাসিনার ৮ দলীয় জোট এক দফার আন্দোলন থেকে দুরে সরে গেলেও ৭ দলীয় জোট

Dhaka University Institutional Repository

একতরফা ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়। ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এরশাদ দুই প্রধান রাজনৈতিক জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখে ছিলেন। ১৯৮৯ সালের শেষের দিকে ৭ দলীয় জোটের নেতৃত্বে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়। ১ নভেম্বর (১৯৮৯) ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম জিয়ার প্রতীক অনশনের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আন্দোলন সূত্রপাত করেন। ৫ নভেম্বর ৭ দলীয় ঐক্য জোট একই দাবিতে সকাল সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি পালন করেন। ১১ নভেম্বর (১৯৮৯) ৭ দলীয় ঐক জোট একতরফাভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৭ দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২০ নভেম্বর সমাবেশ ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের চারিদিকে অবস্থান ধর্মঘট। ২৯ নভেম্বর পূর্ণ দিবস হরতার ও ৩০ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল কর্মসূচি পালন করেন। ৯০ এর শুরুতে ৭ দলের সঙ্গে ৫ দলীয় ঐক্য জোটও আন্দোলনে শরীক হলেন। ৪ ফেব্রুয়ারী ৭ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে সারা দেশে পালিত উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) ৭ দলীয় ঐক্য জোটের এক সমাবেশে " এরশাদ সরকারের সঙ্গে আওয়ামী লীগের (তাদের মতে) আঁতাত প্রতিহত করার আহবান জানানো হয়।"[৩৭]

৬ জুন (১৯৯০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডাকসু' ও ১৩টি হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠি হয়। উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ডাকসু সহ ১০টি হলের ছাত্র সংসদে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। এই নবগঠিত 'ডাকসু'র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনে নতুন গতি লাভ করে। যা জাতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ছিল। কেননা সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে 'ডাকসু'র উদ্যোগে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ছাত্র কনভেনশন থেকেই ডাকসু'র নেতৃত্বে এরশাদের পতনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় যা ছাত্র আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আন্দোনরত তিনটি জোটের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দেয়। দেশের পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন মহল থেকে ৭ ও ৮ দলীয় জোটকে একই মঞ্চ থেকে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করার আহবান জানানো হয়। ডঃ ওয়াজেদ মিয়া তার বইয়ে উল্লেখ করেন, " ৭ দলীয় ঐক্য জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও মঞ্চের ঐক্যের কথা বলেন। কিন্তু ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী ম্যাডাম হাসিনা বলেন," মঞ্চের ঐক্যের প্রয়োজন নেই, রাজপথের ঐক্যই স্বৈরাচারের পতন ঘটাবে।"[৩৮]

ইতোমধ্যে 'ডাকসু'র নব নির্বাচিত ভিপি ছাত্র দল সভাপতি আমানুল্লাহ আমানের নেতৃত্বে গণতন্ত্রকামী সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিছু কিছু ছাত্র সংগঠন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠনে আন্তরিক না হলেও ১০ অক্টোবর (১৯৯০) ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট গুলোর সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি পালন কালে পুলিশ ও ছাত্র সংঘর্ষে জেহাদ সহ ৫ জন ছাত্র নিহত ও ৪০ জন পুলিশ সহ তিনশত ছাত্র যুবক আহত হলে ঐ দিনই তাৎক্ষনিকভাবে ২২টি ছাত্র সংগঠনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ "সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে আন্দোলন পরিচালনার ঘোষণা করেন। "[৩৯] জেহাদের মৃত্যুদেহের সামনে তারা শপথ নিল যে, "স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন না ঘটান পর্যন্ত তারা রাস্তা ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে না।"।

মূলত ১০ অক্টোবর (১৯৯০) সালেই এরশাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণঅভ্যুত্থানের সূচনা ঘটে ছিল। সাত দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে অবস্থান করতে ছিলেন তখন সাত দলের নেতাদের উপর পুলিশ ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। স্বদেশ রায় তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, " .... ১২টা ২০ মিনিটে যখন বেগম জিয়া ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা কর হয় তখন পুলিশ বেগম জিয়া ও সাত দলের নেতাদের উপর লাঠি চার্জ শুরু করে। খালেদা জিয়া সহ অনেকে মাটিতে পড়ে যান। মীর শওকত আলী বেগম জিয়াকে লাঠি চার্জ থেকে আড়াল করে বায়তুল মোকাররম মার্কেটের ভিতর সরিয়ে নেন। পুলিশ মারমূখী হয়ে উঠে"[৪০] এরপরও বেগম জিয়া পিছপা না হয়ে পুনরায় কর্মীদের দুরে রেখে নেতাদের নিয়ে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হতে চান। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে বেগম জিয়া রাস্তার উপর বসে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাস্তার উপর অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বেগম জিয়া বলেন, "আসুন সবাই মিলে রাজপথে নেমে বেইমানদের উৎখাত করি।" [৪১]

সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচির ১ দিন পর অর্থাৎ ১১ অক্টোবর (১৯৯০) ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটত্রয়ের দেশ ব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি মিছিলে পুলিশ হামলা চালিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে মারাত্মক আহত করে। ঐ দিন পুলিশের বেপরোয়া লাঠি চার্জে 'ডাকসু'র ভিপি আমানুল্লাহ আমান সহ ডাকসুর জি.এস, খায়রুল কবীর খোকন, আওয়ামী-লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্র নেতা নাজমুল হক প্রধান, ডাকসু এ জি এস নাজিমুদ্দিন আলম ও ছাত্র নেতা গোলাম মোস্তফা সুজন সহ বহু সংখ্যক ছাত্র নেতা কর্মী আহত হন। আহত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে ছাত্র আন্দোলনের গতি প্রকৃতি দুর্বার আকার ধারণ করে। এর ফলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আহত নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এই প্রেক্ষিতে ১৭ অক্টোবর (১৯৯০) ছাত্র নেতৃবৃন্দ সুস্থ হয়ে শহীদ মিনারে একত্রিত হয়ে পুনর্ব্বার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে যে, "এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘরে ফিরে যাবে না" দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দল সমূহ সংকীর্ণ দলীয় আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলেও দেশের ২২টি ছাত্র সংগঠন সংকীর্ণ দলীয় আদর্শকে উপেক্ষা করে মূল দলীয় সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে 'ডাকসু'র নেতৃত্বে এরশাদের পতনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। যা এরশাদের পতনকে তরান্বিত করেছিল। ছাত্র সংগঠন সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনও একাত্মতায় জাতীয় রাজনৈতিকদল ও জোট সমূহকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগায়। ফলে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট এক মঞ্চ থেকে আন্দোলন পরিচালনা না করলেও যুগপৎ আন্দোলন পরিচালনা করেন। এরই প্রেক্ষিতে ২৩ অক্টোবর ও ১০ নভেম্বর (১৯৯০) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোটের আহবানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়। এর ফলে আন্দোলন ব্যাপক শক্তি অর্জন করে। এই শক্তিকে বহুগুনে বৃদ্ধি করে ১৬ নভেম্বর নারায়ন গঞ্জে আদমজী জুট মিলস্ চত্বরে অনুষ্ঠিত 'ছাত্র-শ্রমিক সংহতি' সভায় ছাত্র দল নেতা ও ডাকসু' ভিপি আমানুল্লা আমান ও ছাত্র লীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব এক মঞ্চে উপস্থিত হয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় উক্ত সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ পুনরায় ঘোষণা করেন, "জেহাদ-মনিরের লাশ ছুঁয়ে আমরা শপথ নিয়েছি। কাজেই এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবোনা।" [৪২]

তিন জোটের রূপরেখা ও গণ অভ্যুত্থান ঃ

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল, এই আন্দোলনের কোন লক্ষ্য ও উ দ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া আন্দোলনরত দল সমূহের মধ্যে অনৈক্য এরশাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করেছে ১০ অক্টোবর (১৯৯০) বায়তুল মোকাররমের সামনে রাস্তার উপর সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বেগম জিয়া রাজপথের আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহবান জানানোর ১ মাস পরেই আন্দোলনরত দল ও জোট সমূহ উপলব্ধি করে যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিহীন আন্দোলন কখনও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছান যায় না। সেই উপলব্ধি থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে আরও তীব্র বেগবান, গতিশীল ও জোরদার করার লক্ষ্যে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট সমূহ অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এরশাদের পতন ও পতন পরবর্তী করণীয় বিষয় সম্পর্কে একটি যুক্ত ঘোষণা প্রণয়ন করেন যা 'তিন জোটের রূপ রেখা" নামে খ্যাত। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই রূপ রেখা মূল্য সংবিধান সম। এই রূপ রেখা প্রণয়নের মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতন ঘটে ছিল। তিন জোটের যৌথ ঘোষণা বা রূপ রেখায় যা ছিল ঃ [৪৩]

"(১) হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তাঁর সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কল্পে ঃ (ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের ৩নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তাঁর সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করতঃ রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। (খ) এই পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম সংসদের অবাধ ও

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ, নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

(২) (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি বা সংসদ পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন মন্ত্রী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। (খ) অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পূনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুণর্বিন্যাস করবেন। (গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃ স্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। (ঘ) গণ-প্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও -টেলিভিশন সহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীনও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার প্রচারনার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

(৪) (ক) জনগনের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরংকুশ ও অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোন পন্থায়, কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। (খ) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ,বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে। এবং (গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।"

এই রূপ রেখার মাধ্যমে এরশাদের পতন পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকার গঠন ও অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ এ, হাকিম ৩ জোটের রূপ রেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "The joint declaration was a milestone in the movement for restoration of democracy. It came after a painstaking, and at times frustrating, drag over unity of the alliances"[৪৪] মূলতঃ ১৯ নভেম্বরের তিন জোটের রূপ রেখা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে সাহায্য করেছে। এর ফলে ২০ নভেম্বর থেকে বিরোধী দলের আন্দোলন কর্মসূচি আরও কঠোরভাবে পালিত হয়। ৬ দফা যেমন বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয় তেমনি ১৯ নভেম্বরে তিন জোটে রূপ রেখাকেও বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের 'ম্যাগনাকার্টা' বলা যায়। বিরোধী দলের ঐক্যের ফলে এরশাদের গদি নড়বড়ে হয়ে যায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। ২১ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট সমূহ ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে। এরশাদ এও উপলব্ধি করেছিল যে, ডাকসুর নেতৃত্বে ছাত্র সমাজের ঐক্য বদ্ধ আন্দোলনের ফলে এরশাদের পতন অবধারিত তাই তিনি ছাত্র আন্দোলন স্থিমিত করার লক্ষ্যে এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। এ উদ্দেশ্যে এরশাদ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কতিপয় বহিস্কৃত নেতাকে ভাড়াতে গুন্ডা হিসেবে ব্যবহার করে ২৫ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সমাবেশে হামলা চালান। ফলে ছাত্র ঐক্যের সাথে সরকারী শসস্ত্র গুন্ডাদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে শসস্ত্র গুন্ডা বাহিনী পলায়নে বাধ্য হয়। সরকারী মদদ পুষ্ট শসস্ত্র বাহিনী ছাত্র ঐক্যের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কোন রূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পেরে গুপ্ত হত্যার পথ বেছে নেয়। ২৭ নভেম্বর (১৯৯০) ঐ শসস্ত্র গুন্ডা বাহিনী এক চোরা গুপ্তা হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি চত্তরের কাছে বিএমএ'র যুগ্ম মহাসচিব ডাঃ মিলন কে নিহত করে। তরুন এই চিকিৎসকের অকাল মৃত্যুতে দেশব্যাপী আন্দোলনের অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। আন্দোলন গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। এরশাদ এই গণবিস্ফোরণ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এবং ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য সর্বশেষ বারের মত ঐ দিনই অর্থাৎ ২৭ নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারি করেন। জরুরী অবস্থা জারির পর আন্দোলনরত প্রধান দুই জোটের দুই নেত্রী, শেখ হাসিনা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক নিজ গৃহে অন্তরীণ থাকেন এবং বেগম খালেদা জিয়া আত্মগোপন করতে সক্ষম হন এবং তিনি অজ্ঞাত স্থান থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন। জরুরী অবস্থা জারি করে এরশাদ কারফিউ দিয়ে আন্দোলন দমন করতে চাইলেন কিন্তু জনতা

এরশাদের এ জরুরী অবস্থা ও কারফিউ উপেক্ষা করে ডাঃ মিলন হত্যার প্রতিবাদে শোভা যাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত রাখে। বলা যেতে পারে ডাঃ মিলন হত্যাকে কেন্দ্র করেই গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়ে যায়। ডাঃ মিলন হত্যার প্রতিবাদে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সকল শিক্ষক ডাক্তারগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও পদত্যাগের হুমকি দিলেন। ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র শিক্ষক সমাবেশে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[৪৫] সাংস্কৃতিক কর্মীগণ অর্থাৎ রেডিও টিভির শিল্পীবৃন্দ ও রেডিও টিভি বয়কট করলেন। জরুরী অবস্থা জারির পর এরশাদ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে ছাত্রদের হলও ছাত্রাবাস সমূহ ত্যাগের নির্দেশ দিলেও ছাত্ররা এরশাদের সকল নির্দেশ উপেক্ষা করে হল ও ছাত্রাবাসে অবস্থান করে গণঅভ্যুত্থানে যোগ দিলেন। দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়লো। রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতা ও পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হলো। এরশাদ তার ক্ষমতা কে সংহত করতে শুধু জরুরী অবস্থা জারী করে ক্ষান্ত হন নাই ; আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহের ওপর কড়া সেন্সর শীপ আরোপ করলেন। বিরোধী দলের সংবাদ বিশেষ করে আন্দোলন সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ফলে ২৮ নভেম্বর (১৯৯০) থেকে পত্রিকা সমূহের ধর্মঘটের কারণে দেশব্যাপী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকলো। সাংবাদিকদের এ ধর্মঘট ৫ ডিসেম্বর ('৯০) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। ৩০ নভেম্বর শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে যারা নিহত হয়েছেন তাদের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে জরুরী অবস্থা উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল বের করা হলে পুলিশ মিছিলে হামলা চালায় ফলে বহুলোক আহত হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও ঐ দিন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। জরুরী অবস্থা সত্ত্বেও ১ ডিসেম্বর (১৯৯০) ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে দেশব্যাপী সর্বাত্মক সকাল সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি পালন করে। এই হরতাল কর্মসূচি পালন কালে দেশের বিভিন্নস্থানে পুলিশ ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে ৮ জন নিহত ও অসংখ্য জনতা আহত হন। এ দিন আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে জাতীয় পার্টির সাংসদ ও সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম, এ, মতিন সহ ১৯জন সাংসদ পদত্যাগ করেন। ডাঃ মতিন ছাড়াও আরও ৩ জন মন্ত্রী ছিলেন উক্ত পদত্যাগের তালিকায়। ২৮ নভেম্বর থেকে দেশে কোন পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় বিরোধী দলের আন্দোলনের কর্মসূচি ও আন্দোলনের খবরাখবর প্রচারের একমাত্র মাধ্যমে ছিল বিবিস ও ভয়েস অব আমেরিকা এবং দলীয় প্রচার পত্র ও লিফলেট। বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ প্রেরণের ওপর যদিও সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল তবুও সাংবাদিকগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংবাদ প্রেরণ অব্যাহত রেখে ছিলেন। ১ ডিসেম্বর বিএনপি'র মহাসচিব ব্যরিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার জরুরী অবস্থা ও আন্দোলন প্রসঙ্গে বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ৭ দল বিএনপি, ৮ দল, ৫ দল এবং আরো অন্যান্য আন্দোলনকারী যে সব দল রয়েছে তারা সকলেই এই জরুরী অবস্থা যাতে মানা না হয়। কারফিউ যাতে মানা না হয়, সেইভাবে আমাদের নেতা, কর্মীদের সকল পর্যায়ে আমরা নির্দেশ দিয়েছি এবং সেইভাবেই সারা বাংলাদেশে কর্মসূচি গুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ইমারজেন্সি কারফিউ, ছাত্র, জনতা কেউ মানছে না। প্রতি নিয়তই সমাবেশ মিছিল এই গুলি হচ্ছে"।[৪৬] এইভাবে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে গণআন্দোলনের খবর দেশব্যাপী প্রচার করা সহজ হয়েছে। ২ ডিসেম্বর সর্বদলীয় কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি না থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এক সমাবেশে সরকারের সহায়তাকারী টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের একটি কালো তালিকা প্রকাশ করে। উল্লেখ যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবানে ইতিপূর্বে রেডিও টেলিভিশনের শিল্পীবৃন্দ এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। ঐ দিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আইনজীবীদের এক সমাবেশ থেকেও এরশাদকে অবৈধ খুনী আখ্যায়িত করে অনতিবিলম্বে পদত্যাগের আহবান জানান। আন্দোলনরত দল ও অংগ সংগঠনের পক্ষ থেকে ঢাকার সর্বত্র " বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদকে"শিরোনামে গণ অভ্যুত্থানের বুলেটিন প্রকাশ করে।[৪৭] দেশ ব্যাপী এরশাদ বিরোধী সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ৩ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থান চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ঐ দিন

৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে ১ দিন বিরতির পর পুনরায় দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি পালন করে। এই হরতাল ছিল স্বতস্ফুর্ত। লাখ লাখ ছাত্র শ্রমিক, জনতা পেশাজীবি শ্রেণী রাজনৈতিক নেভা কর্মী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী মিছিল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমনের শিকার ছিল সরকারী দপ্তর ও সরকারী দল জাতীয় পার্টির আস্থানা সমূহ। আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, সরকারের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। ঐ দিন গণআন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ২০৫ জন কর্মকর্তা এক যোগে পদত্যাগ করেন। সরকারের দোসর ও সহায়তাকারী হিসেবে ব্যরিষ্টার মওদুদ আহম্মদ, ব্যারিষ্টার আবুল হাসনাত, ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া এবং আইনমন্ত্রী হাবিবুল ইসলামের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করা হয় সমিতির পক্ষ থেকে। বিভিন্ন এনজিও গুলো বিরোধীদলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আন্দোলনের ভয়াবহতায় জাতি সংঘের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় জাতি সংঘের সকল কার্যক্রম ও দফতর বন্ধ ঘোষণা করেন।

জরুরী অবস্থা অকার্যকর আন্দোলনের তীব্রতা, বর্হিবিশ্বের চাপ, সেনাবাহিনীর অসহযোগিতা আমলা কর্মচারীদের বিদ্রোহ, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের কর্মবিরতি, আইনজীবীদের অসহযোগিতা, এনজিও সমুহের সরকারের সাথে সম্পর্ক ছেদ, জাতি সংঘের ঢাকার কার্যক্রম ও দফতর বন্ধ ঘোষণা, সরকার দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ ইত্যাদি কারণে এরশাদ ৩ ডিসেম্বর রাতে এক রেডিও এবং টেলিভিশন ভাষণে রাজনৈতিক সমঝোতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এরশাদ তার ঐ ভাষণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৫ দিন পূর্বে একজন নিরপেক্ষ উপরাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হবে বলে তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করেন। তবে নির্বাচনের তারিখ তিনি ঘোষণা করেননি। বিরোধী দল সমূহ ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ তিন জোটের রূপ রেখার বাইরে এরশাদের কোন ঘোষণা মেনে না নেয়ার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন এবং এরশাদের এই সর্বশেষ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন । ৩ ডিসেম্বর (১৯৯০) বিএনপি প্রধান ও ৭ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এরশাদের সর্বশেষ প্রস্তাব সম্পর্কে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "জনগণের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে। সে যদি দেশের ভাল চায়, জনগণের ভাল চায় তা হলে অবশ্যই আমরা মনে করি যে, ১৫ দিন পর নয় এখুনি করা উচিত। এখুনি পদত্যাগ করে দাবির কাছে নতি স্বীকার করলে দেশে একটা সুষ্ঠু অবস্থা ফিরে আসতে পারে। সে যদি মনে করে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে।"[৪৮] একই দিন বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা ডঃ কামাল হোসেন বলেন, "যে রূপ রেখা দেয়া হয়েছে এটা তার পরিপন্থী। সেখানে মূল দাবি হচ্ছে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তার অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা।" [৪৯]

মুলতঃ এরশাদের এই ঘোষণা ও প্রস্তাব ছিল তাৎক্ষনিক আন্দোলনকে স্থিমিত করা। এরশাদ দীর্ঘ নয় বছর আন্দোলনকে ঘিরে বিরোধী দলের সাথে যে ইঁদুর বিড়াল খেলেছেন, এটিও ছিল তার একটি খেলা। বিরোধীদল সমূহ এবার এরশাদের এ খেলায় ধরা দেয়নি এরশাদের সর্বশেষ প্রস্তাব বিরোধী দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় ৪ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের চুড়ান্ত রূপ লাভ করে। লাখ লাখ জনতা রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক, সাংবাদিক, পেশাজীবী শ্রেণী, সাংস্কৃতিক কর্মী, অর্থাৎ সর্বস্তরের জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা ঐ মুহূর্তে এরশাদের পদত্যাগের আহবান জানান। ঢাকা সহ দেশব্যাপী জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ সচিবালয় থেকে বেরিয়ে এসে জনতার কাতারে শামিল হয়। জনতা রাজপথ দখল করে রাখে। গণঅভুত্থানে জনতার এ অংশগ্রহণ ছিল স্বতস্ফুর্ত। ঐ দিন ৮,৭ ও ৫ দলীয় জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে এরশাদের সর্বশেষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঐ মুহূর্তে পদত্যাগের আহবান জানান। বিরোধী দলের পূর্ব নির্ধারিত কোন অবরোধ কর্মসূচি না থাকা সত্ত্বেও লাখ লাখ জনতার স্বতস্ফুর্ত বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী কার্যতঃ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। দেশের আইনশৃংখলা নিয়ন্ত্রিত হয় আন্দোলনরত তিন জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে। ৪ ডিসেম্বরের এই গণঅভ্যুথানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিবিসির প্রতক্ষ্যদর্শী ভাষ্যকার সিরাজুর রহমান ঐ দিন রাত ১০:৪৩ মিনিটে বিবিসি'র রাতের অনুষ্ঠানের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেন, " আজকের ঢাকায় আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধি ছিল অভূতপূর্ব, ঢাকার বিজয়নগর, পুরানা পল্টন, মতিঝিল, গুলিস্তান, তোপাখানা রোড ও কাকরাইলে পদযাত্রায় লাখ লাখ লোক দেখেছি। তারা শ্লোগান দিচ্ছিল এখনি এরশাদের পদত্যাগ চাই। এরশাদের বিচার চাই। এরশাদের প্রস্তাব মানিনা ইত্যাদি ইত্যাদি"। উক্ত প্রতিবেদনে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, " হঠাৎ করে আজ যেন ছাত্র জনতাই এদেশের দন্ড মুন্ডের কর্তা প্রেসিডেন্ট এরশাদ যেন বাহুল্য মাত্র। পথে আজ শুধু ট্রাকে আসীন পুলিশ দলগুলো দেখেছি, তাদের উৎফুল্ল জনতার সঙ্গে রসিকতা বিনিময় হচ্ছিল। রমনা পার্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা বাহিনীর লোক আছে। কিন্তু সারা দিন ঘুরা ফেরার পরেও রাস্তায় কোন মিলিটারী দেখিনি আজ। জনতার ভাগ্য দেখে আজ বার বার চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্লাগ এর উনশিল্লাভ কয়্যারের গত বছরের অক্টোবর নভেম্বর মাসের দৃশ্য মনে করিয়ে দিচ্ছিল। আজ সমস্ত দিনে বাংলাদেশে কোন পত্রিকা কিংবা সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি। আধপাতার একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে,, "বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে"। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারী সবগুলো দলের কর্মসূচী সে সঙ্গে আন্দোলন সংক্রান্ত আলোকচিত্র, এসব ছাপা হয়েছে। শেষ পাতায় সম্পাদকীয় শিরোনাম, " আমরা দেখতে চাই, " সাংবাদিকদের বক্তব্য তারা লিখতে চান, কিন্তু মুখে গুমোট আর হাতে শিকলপরা অবস্থায় তাঁরা লিখবেন না। [৫০]

কার্যতঃ এরশাদ যখন সকল দিক থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, ক্ষমতাকে ধরে রাখার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে পড়ে জনতার মুখোমুখি যখন সেনা বাহিনী, পালাবার সকল পথ যখন রুদ্ধ, তখনই গণদাবিকে স্বীকার করে নিয়ে ৪ ডিসেম্বর (১৯৯০) রাত ১০.০০ ঘটিকার ইংরেজী সংবাদে ঘোষণা দেয়া হয়, "রাষ্ট্রপতি হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ অনতিবিলম্বে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন"। তখনই সারা দেশের লাখ লাখ আপামর জনতা আনন্দে ফেটে পড়ে। পদত্যাগের ঘোষণায় জরুরী আইন ও কার্ফু উপেক্ষা করে লাখ লাখ জনতা রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। জনগণের বিজয় অর্জিত হওয়ায় শোকরিয়া আদায় করে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় একথা প্রমানিত হয়েছে যে, জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছে যে কোন স্বৈরশাসন পরাস্ত হতে বাধ্য।

গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক পরাস্ত হলে তিন জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের অভিন্ন আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি লাভ করে। জয় হয় জনতার। এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ৭ দলীয় জোট নেত্রী এবং বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া রেডিও টেলিভিশনে বিজয়ী জনগণকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে এবং আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, " এ দিন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম এই সংগ্রামে জনগণ বিজয়ী হয়েছে। এখন জনগণের দায়িত্ব সেই গণতন্ত্রকে লালন করে একটি সুখী এবং সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তোলা।" [৫১] লন্ডন থেকে প্রকাশিত ' THE TELEGRAPH' পত্রিকার ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) সংখ্যার The beginning of an era of democracy ? শিরোনামে এক প্রতিবেদনে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে উল্লেখ করেন। "The decision of President H.M. Ershad to stepdown office to pave the way for democratically elected government is certainly welcome" [৫২] এছাড়া ও দেশী এবং বিদেশী পত্র পত্রিকায় এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে ব্যাপক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরশাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে ৩ জোটের রূপখো অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক সরকার গঠনের পথ সুগম হলো।

ঘ) এরশাদের পদত্যাগ ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ ঃ

৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে বিরোধী দল ও জোট সমূহের পক্ষ থেকে এরশাদের এ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হয়। এবং অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে তিন জোট ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদকে মনোনীত করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ তাঁর পূর্ব পদে অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি পদে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে এই দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হন।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর ৬ ডিসেম্বর বাংলার বানীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ বলেন, " জাতির বৃহত্তম স্বার্থে আমি এই গুরু দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছি। তবে আমি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এটাই আমার বড় পরিচয়। জনগণ আমার প্রতি যে আস্থা রেখেছে তা যে কোন মূল্যে সমুন্নত রাখতে হবে।"[৫৩] প্রধান দুই জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদকে তার স্বপদে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সংবিধান অক্ষুন্ন ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে প্রথমে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের উপ রাষ্ট্রপতি ব্যারিষ্টার মওদুদ আহম্মদ উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদ সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ [৫৪] অনুযায়ী বিরোধী দলের সর্বসম্মত মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদকে নিয়োগ ও শপথ বাক্য পাঠ করান। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ সংবিধানের ৫১(৩) অনুচ্ছেদ [৫৫] অনুযায়ী উপ রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ পত্র নব নিযুক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে একদিকে স্বৈরাচারী এরশাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে পতন নিশ্চিত হয় এবং অন্যদিকে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ সংবিধানের ৫৫(১) অনুচ্ছেদ [৫৬] অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। বিরোধী দল ও জোট সমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে Lawrence Ziring তার বইয়ে উল্লেখ করেন, " The violent demorations were instantly transformed into parades of wild jubilation as word of Ershad's resignation reached the streets several hundreds had died in this last campaign to oust the president, but it was doubtful that they would be the last victims of Bangladsh's on going effort to find and set an acceptable political course"[৫৭] এরশাদের পতনের ফলে বাংলাদেশে দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। 'Sunday Times' 9, December (1990) সংখ্যায় এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে Zaglul A. Chowdhury এক প্রতিবেদনের হেডলাইনে উল্লেখ করেছিল " Ershad is out, is democracy in ? প্রকৃত পক্ষেই এরশাদের বিদায়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না পেলেও গণতন্ত্র বিকাশ সহায়তা করে ছিল।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের সরকার অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ এক বিবৃতিতে বলেন, " গণতন্ত্রের জয় নিশ্চিত হয়েছে। ------ যথা শীঘ্র সম্ভব সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে"। [৫৮] ঐ দিনই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি চতুর্থ জাতীয় সংসদের বিলুপ্ত ঘোষনা করেন। ৯ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১২ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। পরবর্তীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৭ জনে উন্নীত করেন। [৫৯] স্বৈরাচারে পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ এবং তার উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব হল নিরপেক্ষভাবে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। দায়িত্বভার গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অবাধও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এরশাদ বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালের (৪-৬) ডিসেম্বর এরশাদের পতন এবং পতন পরবর্তী একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ সুগম হয়েছে। স্বৈরাচারের পতনের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে যে কোন অশুভ শক্তি পরাজিত হতে বাধ্য। এরশাদ বিরোধী দীর্ঘ নয় বছরে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ব্যর্থতা প্রসঙ্গ বলা যায় যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভাবই এরশাদকে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা হয়েছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী দল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাই বারবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। ১৯৮৬ সালে এরশাদের পতনের লক্ষ্যে ৩ জোট যখন যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে আন্দোলনের সফল পরিনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন এরশাদ নির্বাচন প্রশ্নে আন্দোলনরত দল সমূহের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ৮ দলকে নিয়ে আন্দোলন থেকে দুরে সরে গেলেও

Dhaka University Institutional Repository

বেগম খালেদা জিয়া জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হন নাই। বেগম জিয়া ৭ দলকে নিয়ে এককভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীতে ৪র্থ জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর আওয়ামী লীগ সহ ৮ দল যখন আন্দোলনের মাঠে নামেন তখনও বেগম জিয়া ঐক্যবদ্ধ ও এক মঞ্চ থেকে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী এক মঞ্চ থেকে আন্দোলন পরিচালনায় আগ্রহী ছিলেন না। ১৯৯০ সালের শুরুতে বেগম জিয়া পুনরায় বলে ছিলেন, "আসুন ২১ ফেব্রুয়ারী এক মঞ্চ থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করি।" বেগম জিয়ার সেই আহবানেও অন্যান্য জোট ও দল সমূহ সাড়া দেয় নাই। অবশেষে ১৯৯০ সালের তিন জোটের রূপ রেখার ভিত্তিতে যখন আন্দোলনরত দল সমূহে একই প্লাটফর্মে এবং আন্দোলনের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হলো তখন থেকেই আন্দোলনের নতুন গতি লাভ করে এবং তিন জোটের রূপরেখা ঘোষণার মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো। ১৯৮৬ সালে যদি এই রূপ ঐক্যবদ্ধ থেকে আন্দোলন পরিচালনা করতো তাহলে এরশাদের পতনের জন্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষ করতে হতো না। ১৯৮৬ সালেই এরশাদের পতন অনিবার্য ছিল। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে বেগম জিয়া সামরিক শাসকের সাথে আগাগোড়া আপোষহীন ভূমিকা পালন করে ছিলেন, আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে বেগম জিয়া ঘোষণা করেছিলেন, এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। বেগম জিয়া তার কথা রেখেছিলেন এরশাদের অধীনে কোন নির্বাচনে খালেদা জিয়া এবং বিএনপি অংশ গ্রহণ করে নাই। এ জন্য বেগম জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হলো। জনগন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে।

৬) পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ ঃ বিএনপি'র ক্ষমতায় আগমন ঃ

প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতনের পর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ সুগম হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়। গত ১৯ বছরে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায় ৪ টি সংসদ নির্বাচন ৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ২টি গণ ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত নির্বাচন সমুহের মধ্যে কোনটিই বিতর্কের উর্ধে ছিল না। তাই স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে সকল দলের অংশ গ্রহণের নিমিত্তে অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ দায়িত্বভার গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন। পুনর্গঠিত ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার ১৪ ডিসেম্বর (১৯৯০) পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করেন ২ মার্চ ১৯৯১ ইং ১৭ ফাগুন ১৩৯৭ বাং। সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ১দিন পর নির্বাচন কমিশণ 'গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২"এর ১১ ধারার বিধান অনুসারে ১৫ ডিসেম্বর (১৯৯০) তারিখে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী রিটানিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করেন ১০ জানুয়ারী ১৯৯১ ইং / ২৬ পৌষ, ১৩৯৭ বাং, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ করেন ১২ জানুয়ারী ১৯৯১ ইং / ২৮ পৌষ, ১৩৯৭ বাং ; প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করেন ২১ জানুয়ারী ১৯৯১ ইং। ৭ মাঘ ১৩৯৭ বাং এবং ভোট গ্রহণের তারিখ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২ মার্চ ১৯৯১ ইং / ১৭ ফ্লাগুন, ১৩৯৭ বাং। কিন্তু ২ মার্চ ১৯৯১ ইং তারিখে ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হলেও ঐ তারিখে সম্ভাব্য পবিত্র শব-ই-বরাত থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট ও দল সমুহের দাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল পুনঃ নির্ধারণ করেন। পুনঃ নির্ধারিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইং / ১৪ ফাল্গুন ১৩৯৭ বাং। মনোনয়ন পত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ পূর্ব নির্ধারিত তারিখের পরিবর্তে যথাক্রমে ১৩ জানুয়ারী ১৯৯১ ইং ২৯ পৌষ ১৩৯৭ বাং এবং ১৪ জানুয়ারী ১৯৯১ ইং/৩০ পৌষ ১৩৯৭ বাং পুনঃ নির্ধারণ করেন। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখ অপরিবর্তিত থাকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে আরও যে ৪টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয়ে ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী ; তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ৭ মে এবং সর্বশেষ ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বিতর্কিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল সমূহ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রধান প্রধান রাজনেতিক দলসমূহ তাদের প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের জন্যই প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করণে ও এ ছাড়াও অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে জাতীয় পার্টি ২৭২ টি আসনে। জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ ২২২টি আসনে, জাকের পার্টি ২৫১টি আসনে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (রব) ১৬১ টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করেন।

মনোনয়ন পত্র দাখিল ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিলের নির্ধারিত দিনে ১৩ জানুয়ারী (১৯৯১) ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ৭৫টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যদের পক্ষ থেকে ৩৮৭২ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ে ৫৭টি বাতিল ঘোষিত হলে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ৩৮১৫ জন। কিছু নির্বাচনী এলাকায় বাতিলকৃত প্রার্থীর আবেদন ও আবেদন নিস্পত্তির পর এবং তিনটি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণের মৃত্যুজনিত কারনে নতুনভাবে ঘোষিত তিনটি নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী গৃহীত ৩২টি বৈধ মনোনয়ন পত্র সহ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ৩৮৩০ জন।[৬০] নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০৪৩ জন প্রার্থী তাহাদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন। ফলে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ২৭৮৭ জন।

সারণী ঃ ৩.৩

প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর বিভাগ অনুযায়ী আসন সংখ্যা, বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা, প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সংখ্যা ও চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দেখা হল ঃ

ক্রঃ নং	বিভাগ	আসন সংখ্যা	আপীল ও রীট আবেদন নিস্পত্তির পর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা	প্রার্থীতা প্রত্যাহার কারীর সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা।
১	রাজশাহী	৭২	৯১৫	২৬১	৬৫৪
২	খুলনা	৬০	৭৫৮	২০০	৫৫৮
৩	ঢাকা	৯০	১১৫৬	২৮৬	৮৭০
৪	চট্টগ্রাম	৭৮	১০০১	২৯৬	৭০৫
	মোট	৩০০	৩৮৩০	১০৪৩	২৭৮৭

সূত্র ঃ *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পৃঃ ১৫।

চূড়ান্তভাবে ২৭৮৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ও বেশ কিছু সংখ্যক প্রার্থী একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে চূড়ান্ত প্রার্থী সংখ্যা আরো কিছু কম। ৪০ জন মহিলা প্রার্থী ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া - ৫টি আসন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি আসনে ও আওয়ামী লীগ নেত্রী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দিতাকারী উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, এইচ, এম, এরশাদ ৫টি আসনে, বিএনপি'র সাইফুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান ২টি করে আসনে, আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহম্মদ ২টি আসনে, বাকশালের আব্দুর রাজ্জাক ২টি আসনে এবং জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩০০ আসনের সবগুলো আসনেই একাধিক প্রার্থী বজায় থাকায় কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় নাই।

নির্বাচনী ফলাফল ঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত অবাধ নিরপেক্ষ, কারচুপি বিহীন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুষ্ঠিত ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী দল (বিএনপি) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারী ২৯৮ টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২টি আসনের প্রার্থী মৃত্যুজনিত কারণে নির্বাচন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি) লাভ করে ১৪০ টি আসন ; দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন, জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন পেয়ে তৃতীয় বৃহত্তন দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসন পেয়ে দলগতভাবে ৪র্থ স্থানে থাকেন। বাকী আসন অন্যান্য ছোট ছোট দল ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ লাভ করেন।

জাতীয় সংসসদ নির্বাচন, ১৯৯১ এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোট এর শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ-

সারণী ঃ ৩-৪

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ও দলীয় অবস্থান ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি)	৩০০	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১%	১৪০
২।	বংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০.০৮%	৮৮
৩।	জাতীয় পার্টি	২৭২	৪০,৬৩,৫৩৭	১১.৯২%	৩৫
৪।	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩%	১৮
৫।	বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	৬,১৬,০১৪	১.৮১%	৫
৬।	জাকের পার্টি	২৫১	৪,১৭,৭৩৭	১.২২%	-
৭।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি.পি.বি)	৪৯	৪,০৭,৫১৫	১.১৯%	৫
৮।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (রব)	১৬১	২,৬৯,৪৫১	০.৭৯%	-
৯।	ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯%	১
১০।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর)।	৩১	২,৫৯,৯৭৮	০.৭৬%	১
১১।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু)	৬৮	১৭১০১১	০.৫০%	-
১২।	গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১,৫২,৫৯২	০.৪৫%	১
১৩।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন,ডি,পি)	২০	১,২১,৯১৮	০.৩৬%	১
১৪।	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	১,২০,৭২৯	০.৩৫%	-
১৫।	বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	১,১০,৫১৭	০.৩২%	-

১	২	৩	৪	৫	৬
১৬।	বাংলাদেশ খেলাফতে আন্দোলন	৪৩	৯৩.০৪৯	০.২৭%	-
১৭।	ফ্রীডম পার্টি	৬৫	৯০,৭৮১	০.২৭%	-
১৮।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (শাজাহান সিরাজ)	৩১	৮৪,২৭৬	০.২৫%	১
১৯।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দিন)	৬	৬৬,৫৭৫	০.২০%	-
২০।	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	৬৩৪৩৪	০.১৯%	১
২১।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	৩৪৮৬৮	০.১০%	-
২২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	৩২৬৯৩	০.১০%	-
২৩।	জনতা মুক্তি পার্টি	৮	৩০৯৬২	০.০৯%	-
২৪।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	১৬	১৪৭৬১	০.০৭%	-
২৫।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	২৪৩১০	০.০৭%	-
২৬।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	২১৬২৪	০.০৬%	-
২৭।	জাতীয় জনতা পার্টি এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	১১	২০৫৬৮	০.০৬%	-
২৮।	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলামী ফ্রন্ট	৩	১৫০৭৩	০.০৪%	-
২৯।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মাহবুব)	৬	১৩৪১৩	০.০৪%	-
৩০।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	১১৯৪১	০.০৪%	-
৩১।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম, এল)	৪	১১২৭৫	০.০৩%	-
৩২।	ঐক্য প্রক্রিয়া	২	১১০৭৪	০.০৩%	-
৩৩।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	১১০৭৩	০.০৩%	-
৩৪।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (ভাষানী)	৩০	৯১২৯	০.০৩%	-
৩৫।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	২	৬৬৭৭	০.০২%	-
৩৬।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৬৩৯৬	০.০২%	-
৩৭।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	৩৬৭১	০.০১%	
৩৮।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	৩৫৯৮	০.০১%	-
৩৯।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	২	৩১৮৭	০.০১%	-
৪০।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৭	৩১১৫	০.০১%	-
৪১।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	২৭৫৭	০.০১%	-
৪২।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৭	২৬৬৮	০.০১%	-
৪৩।	জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)	৭	১৫৭০	০.০০৫%	-
৪৪।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	১৪২১	০.০০৪%	-
৪৫।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষীদল (জাগচাদ)	১০	১৩১৭	০.০০৪%	-
৪৬।	বাংলাদেশ গণ-আজাদী লীগ (সামাদ)	১	১৩১৪	০.০০৪%	-

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬
৪৭।	জনশক্তি পার্টি	৪	১২৬৩	০.০০৪%	-
৪৮।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৩	১২৩৬	০.০০৪%	-
৪৯।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ	২	১০৩৯	০.০০৩%	-
৫০।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	২	১০৩৪	০.০০৩%	-
৫১।	পিপলস ডেমোক্রেটি লীগ	১	৮৭৯	০.০০৩%	-
৫২।	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	৫	৮৪২	০.০০২%	-
৫৩।	জনতা মুক্তিদল (জামুদ)	৪	৭২৩	০.০০২%	-
৫৪।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৬	৬৮৬	০.০০২%	-
৫৫।	মুসলিম পিপলস পার্টি	১	৫১৫	০.০০২%	-
৫৬।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	৫০৩	০.০১%	-
৫৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	২	৫০২	০.০১%	-
৫৮।	জাতীয়তবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	৩	৪৯৬	০.০১%	-
৫৯।	ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৪৫৩	০.০১%	-
৬০।	ধুমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারণকারী মানব সেবা সংস্থা (সিদসা)	২	৪৫৩	০.০১%	-
৬১।	জাতীয় তরুণ সঘ	১	৪১৭	০.০১%	-
৬২।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	৩১৮	০.০১%	-
৬৩।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	৪	২৯৪	০.০১%	-
৬৪।	আইডিয়েল পার্টি	১	২৫১	০.০১%	-
৬৫।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাষানী সাদেকুর রহমান)	১	২৪৮	০.০১%	-
৬৬।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	২৪১	০.০১%	-
৬৭।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	২১৪	০.০১%	-
৬৮।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২০২	০.০০১%	-
৬৯।	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	১৮২	০.০০০৫%	-
৭০।	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	১৫৪	০.০০০৫%	-
৭১।	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিক পার্টি	১	১৩৮	০.০০০৫%	-
৭২।	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	১	৩৯	০.০০০৪%	-
৭৩।	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	১	২৮	০.০০০১%	-
৭৪।	নাশ্যনাল আওয়ামী পার্টি (ভাষণী নূর মোঃ কাজী)	১	২৭	০.০০০১%	-
৭৫।	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	১	২৫	০.০০০১%	-
৭৬।	স্বতন্ত্র/নির্দলীয়	৪২৪	১৪৯৭৩৯৬	৪.৩৯%	৩
	মোট	২৭৮৭	৩৪১০৩৭৭৭	-	৩০০

সূত্র ঃ *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন*, ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, (জি পি পি ডি - শাখা -১- ১৪৭২/৯৩-৯৪/(নিঃ)-২২-৯-৯৪-২০০০) পৃঃ ৪৮-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল বিশ্লেষণ ঃ উল্লেখিত ফলাফল বিবরণী থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪০টি আসন লাভ করে। তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৩০.৮১% । বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আওয়ামিলীগ ৩৬টি আসন ৮ দলীয় অন্যান্য শরীকদের জন্য বন্টন করেন। আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত আসন ৮৮ এবং তাদের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৩০.০৮%, অর্থাৎ বিজয়ী বিএনপি'র থেকে সামান্য কম। সারণী ৪ঃ৪ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৭৫টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র সদস্যগন নির্বাচনে অংশগ্রহন করেছে তন্মধ্যে ১২টি রাজনৈতিক দল ২৯৭টি আসন লাভ করে। এবং ৩টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীগন। ফলে ৬৩টি রাজনৈতিক দল কোন আসন লাভ করে নাই। আবার যে ১২টি দল আসন পেয়েছে তন্মধ্যে ৬টি রাজনৈতিক দল ১টি করে আসন পায়। প্রদত্ত ফলাফলে দেখা যায় যে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে দলগতভাবে ৪টি দলের অবস্থান সুদৃঢ় তবে ক্ষমতার লড়াই হয়েছে ২টি দলের মধ্যে। সুতরাং এ কথা বলা যায় বাংলাদেশের গণতন্ত্র দ্বিদল কেন্দ্রিক প্রবণতার দিকে ধাবমান।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উক্ত নির্বাচনে সর্ব মোট ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন বৈধ ভোটারের মধ্যে ৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এরমধ্যে সর্বমোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩,৪১,০৩,৭৭৭ এবং বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৩,৭৩,৩২২। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৫৫.৪৫। এরমধ্যে বৈধ ভোটের হার ৯৮.৯২% এবং বাতিলকৃত ভোটের হার ১.০৮%। উক্ত নির্বাচনে ৭০৪টি টেন্ডার্ড ভোট পরে যার শতকরা হার ০.০০২।[৬১]

নিম্নের সারণীতে (৩.৫) বাংলাদেশের ইতিহাসে (১৯৭৩-১৯৯১) জাতীয় সংসদের যে, ৫টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত নির্বাচন সমূহে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা, মোট প্রার্থী সংখ্যা মোট ভোটার সংখ্যা এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা হারের তুলনা মূলক চিত্র প্রদত্ত হল।

সারণী ঃ ৩.৫

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩-১৯৯১

ক্রমিক নং	নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ও বছর	অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা	মোট প্রার্থীর সংখ্যা (স্বতন্ত্রসহ)	সর্বমোট ভোটার সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	৭ মার্চ, ১৯৭৩	১৪	১২০৯	৩,৫২,০৫,৬৪২	৫৫.৬১
২	১৮ ফেব্রুঃ ১৯৭৯	২৯	২৫৪৭	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	৫০.২৪
৩	৭ মে, ১৯৮৬	২৮	১৯৮০	৪,৭৩,২৫,৮৮৬	৬০.২৮
৪	৩ মার্চ, ১৯৮৮	৮	১১৯২	৪,৯৮,৬৩,৮২৯	৫৪.৯৩
৫	২৭ ফেব্রুঃ ১৯৯১	৭৫	২৭৮৭	৬,২১,৮১,৭৪৩	৫৫.৪৫

সূত্র ঃ Professor M. Saydullah Bhuyan and Arun Kumar Goswami, *The June 1996 Parliamentary Election In Bangladesh : A Review,* SS Vo. XV, No.2 (1998) : p-26 এবং *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ নির্বাচন,* ১৯৯১ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। পৃঃ ১৬-৫১।

উক্ত সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫টি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ১৯৯১ সালের ৫মে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক ৭৫টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। এরপরেই অবস্থান দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল। ৩য় এবং ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল অংশ গ্রহণ না করার ফলে উক্ত দুটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যাও ২য় ও ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের থেকে অনেক কম। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল স্বতন্ত্র সহ ২৭৮৭ এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র সহ ২৫৪৭ জন। পঞ্চম জাতীয় সংসদ

নির্বাচনে ভোটার সংখ্যাও ছিল সর্বাধিক ৬,২১,৮১,৭৪৩ জন যা পূর্ববর্তী নির্বাচন ১৯৮৮ সালের থেকে প্রায় ২৫% এর বেশী। তবে ১৯৯১ এর নির্বাচনের ভোটের শতকরা হার একটি সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায় অর্থাৎ ১৯৭৩ সাল থেকে ৯১ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫টি নির্বাচনে সর্বনিম্ন ১৯৭৯ সালে ছিল শতকরা ৫০.২৪ এবং সর্বোচ্চ ছিল ৬০.২৮, ১৯৮৬ এর নির্বাচনে। ১৯৯১ এ এই দুয়ের গড় লক্ষ্য করা যায়। আবার '৯১ এ যেখানে প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ছিল ৫৫.৪৫ এর পূর্ববর্তী নির্বাচনের শতকরা হার ও ছিল খুবই কাছে ৫৪.৯৩। এদুটি নির্বাচনে শতকরা হারে পার্থক্য মাত্র .৫২। তবে '৮৮ এবং '৯১ এর নির্বাচনের পার্থক্য হলো ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে নির্বাচনী কর্মকর্তাগন যে সংখ্যা প্রদর্শন করেছে তাই ছিল ভোটের ফলাফল, পক্ষান্তরে ১৯৯১ সালে জনগণের প্রদত্ত ফলাফলই ছিল চুড়ান্ত পরিসংখ্যান এখানে কারো কিছু করার ছিল না। সুতরাং ১৯৯১ এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীর অংশ গ্রহণে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এই নির্বাচনের গ্রহণ যোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনা ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং কারচুপি মুক্ত। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ ২৬ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের প্রাক্কালে রেডিও এবং টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, " দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আমার অস্থায়ী সরকারের প্রধান কর্তব্য ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠ নির্বাচন সম্পন্ন করা। এই লক্ষ্যে আমি ছিলাম অবিচল, অটল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাজনৈতিক দলগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের তিন জন কর্মরত বিচারপতি সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশনকে পূনর্গঠন করেছি। এই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে একে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা এই উপমহাদেশে নজীর বিহীন। নির্বাচনে নিযুক্ত কর্মচারীদেরকে কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য এই কমিশন প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান করতে পারবে।" [৬২] প্রকৃত পক্ষেই ২৭ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন ছিল নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে নজীর বিহীন। নির্বাচনের পর দেশী বিদেশী পত্র পত্রিকা ও পর্যবেক্ষন দল উক্ত নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এস, আব্দুল হাকিম তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "২৭ শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচন ছিল এক অভূত পূর্ব নির্বাচন। এটিকে দেশের সবচেয়ে সুষ্ঠ, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আখ্যা দেয়া হয়। জনসাধারণ দলে দলে নির্বিঘ্নে তাদের ভোট দিতে আসে। নির্বাচনের দিনটি মনে হয়েছিল একটি উৎসবমুখর দিন। বৃটেন, জাপান, সার্ক দেশ সমূহের এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের বৈদেশিক পর্যবেক্ষকরা আমাদের নির্বাচন দেখে সকলেই মন্তব্য করেছেন যে, নির্বাচন সত্যিই সুষ্ঠ, অবাধ এবং নিরপেক্ষ হয়েছে।" [৬৩] কিন্তু নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে কিংবা নির্বাচন সুষ্ঠ হয় নাই এমন প্রশ্ন তোলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) ৩২ নম্বরের বাসভবনে দেশীবিদেশী সাংবাদিকদের কাছে শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন, ভোটাররা আমাদের ভোট দিয়েছে। কিন্তু চিহ্নিত অগণতান্ত্রিক শক্তি সুক্ষ্ম কারচুপি, কালো টাকা, সন্ত্রাস এবং এক অদৃশ্য শক্তির সাথে ষড়যন্ত্র করে ভোটের রায়ের ফল পাওয়া থেকে ভোটারদের বঞ্চিত করেছে"। [৬৪] অর্থাৎ শেখ হাসিনার মতে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় নাই। অথচ নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ডঃ কামাল হোসেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার সাথে দ্বিমত পোষণ করে ১ মার্চ (১৯৯১) বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় বলে মন্তব্য করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ কামাল হোসেন বলেন, "আমি তো মনে করি একটা ভাল নির্বাচন হয়েছে, সুষ্ঠ নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচন কমিশন তাদের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করেছেন। ভোটাররা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভোট দিয়েছেন। তাই নির্বাচনের ফলাফল আমরা যেটা আশা করেছিলাম যে আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করবো, সেটা না করলেও এটা অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।"[৬৫] যদিও উক্ত নির্বাচনে ডঃ কামাল হোসেন ঢাকার একটি আসন থেকে পরাজিত হয়েছিলেন। পরাজিত হয়েও ডঃ কামাল হোসেন এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয় ডঃ কামাল হোসেন তার এলাকার ভোটারদের অভিনন্দন দিতে ভূল করেন নি। কারণ তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। শুধু ডঃ কামাল হোসেন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা আব্দুল মান্নান বলেন," এবারের নির্বাচনের ক্রটি বিচ্যুতি অনেক ছোট। এই জাতীয় চিন্তা হচ্ছে ভোটের অধিকার। মানুষ এবার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে।" [৬৬] এ ছাড়াও আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহম্মদ এবং মোহাম্মদ নাসিম ও নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। জনাব তোফায়েল আহম্মদ এবং বাকশালের আব্দুর রাজ্জাক দুটি করে আসনে জয়লাভ করেন। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গোপালগঞ্জের একটি আসনে জয় লাভ করেন এবং ঢাকার দু'টি আসনে পরাজিত হন। উল্লেখ্য ঢাকার সবগুলো আসনেই বিএনপি প্রার্থীগণ জয়লাভ করেন। ১ মার্চ (১৯৯১) নির্বাচনোত্তর এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভোটার তালিকা ছিল ক্রটি পূর্ণ। ভোটার তালিকায় ক্রটি না থাকলে বি,এন,পি দুই তৃতীয়াংশ আসন পেত"। [৬৭] অতএব, একথা বলা যায় যে, ১৯৯১ এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই নির্বাচন ই প্রথম বারের মত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত। এই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে।

খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে মন্ত্রী পরিষদ গঠন ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় সরকার গঠন নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ ১ মার্চ (১৯৯১) রাতে রেডিও-টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনোত্তর এক ভাষণে বলেন, "কোন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এ ব্যাপারটি নিশ্চিত না হওয়ায় এ মুহূর্তে মন্ত্রী পরিষদ গঠন সম্ভব নয়।" [৬৮] বিএনপি'র পক্ষ থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। ২ মার্চ (১৯৯১) বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " সরকার গঠনে কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়।" [৬৯] এর ১ দিন পূর্বে বেগম জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সম্মেলনেও বলে ছিলেন, প্রয়োজনে তারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিয়ে সরকার গঠন করবে। তবে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকায় বিভিন্ন দল খালেদা জিয়াকে সরকার গঠন করতে না দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। ৪ মার্চ (১৯৯১) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আবেদন জানান যে, "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক মিমাংসা ছাড়া মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে পারেন না।" এর জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ প্রতিনিধিদলকে বলেন, " যিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষতা হারাবেন না।" [৭০] প্রকৃত পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব হস্তান্তর করতে না পারলেও প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ নিয়োগে কোন বাধা নেই। সংবিধানের ৫৮(১) ও ৫৮(৩) অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৫৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতিকে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শ দানের একটা মন্ত্রী পরিষদ থাকিবে" এবং ৫৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপতি তাহার বিবেচনায় সংসদ সদস্য গনের মধ্যে হইতে কিংবা সংসদ সদস্য হইবার যোগ্য ব্যক্তিগনের মধ্য হইতে একজন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি যে রূপ আবশ্যক মনে করিবেন সেই রূপ অন্যান্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পরিষদের সদস্য হইবেন না।" [৭১] এমতাবস্তায় সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রী পরিষদ গঠনে বাধা না থাকলেও রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচ্য বিষয় বিএনপি'র সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে কি না ? ঐ মুহূর্তে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত ৩০০ আসনের মধ্যে একাধিক আসনে বিজয়ী সাংসদদের ছেড়ে দেয়ার কারণে ১০টি আসন শূন্য ঘোষিত হয়। এর মধ্যে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার ৪টি জাতীয় পার্টি প্রেসিডেন্ট হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের ৪টি, আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহম্মদের ১টি ও বাকশালের আব্দুর রাজ্জাকের ১টি আসন। উক্ত ১০টি আসন বাদ দিলে জাতীয় সংসদে তখনকার আসন সংখ্যা দাড়ায় ৩০০-১০= ২৯০টি । এরমধ্যে বিএনপি'র ৪টি আসন ছেড়ে দেয়ায় আসন সংখ্যা দাড়ায় ১৩৬টি। ২৯০টি আসনের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ২৯০÷২=১৪৫+১=১৪৬টি। কিন্তু বিএনপি'র আসন ছিল ১৩৬ ; নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ১০টি আসন কম ছিল। এই রূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১১ মার্চ (১৯৯১) একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে বিএনপি'কে সমর্থন দানের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। ঐ দিন জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান স্বাক্ষরিত এক পত্রে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে জানান, "পার্লামেন্টে তার পার্টি একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনে বিএনপি'র পার্লামেন্টারী পার্টিকে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন দিবে।" [৭২] জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন সংসদ সদস্যদের সমর্থনের ফলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে জাতীয় সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল নিয়ে আর কোন প্রশ্নের অবতারণা রইলোনা। ফলে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি'র মন্ত্রী পরিষদ গঠনে সকল বাধা অপসারিত হল। অবশেষে ১৯ মার্চ (১৯৯১) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ সাংবিধানের ৫৮(১) ও ৫৮(৩) অনুচ্ছেদে অনুযায়ী বিএনপি'র পার্লামেন্টারী পার্টির প্রধান বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ঐ দিন বঙ্গভবনের দরবার হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এক অনাড়ম্বর পরিবেশে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ১০ জন মন্ত্রী ও ২০ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করে মন্ত্রী সভা পূর্ণ করে। বিএনপি'র সাংসদ আব্দুল মতিন চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হলেও ঐ দিন শপথ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নব আঙ্গিকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুধু হয়। যদিও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকায় পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে আরও কয়েক মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর সাপ্তাহিক বিচিত্রা সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " আমাদের সরকারের প্রধান করণীয় হবে। দেশের বিধ্বস্তত অর্থনীতিক পুনর্জীবনের লক্ষ্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প পুনরায় চালু করা, নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বেকার সমস্যার সমাধান করা। শিক্ষাঙ্গন কে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে ছাত্র,ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে লেখাপড়া করতে পারে। মহিলা সমাজের উন্নয়নের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ দেয়া হবে।"[৭৩] সাপ্তাহিক রোববারের সঙ্গে অপর এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "স্বৈরাচারের হাতে পর্যুদস্ত দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা রূপায়নের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হতে হবে।" [৭৪] প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উল্লেখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে। এবং স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে অর্থনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত দেশটির পুনর্গঠনে তাঁর সদিচ্ছার কথা ব্যখ্যা করেছেন। মন্ত্রী পরিষদ গঠনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকার প্রধান না হলেও নির্বাহী সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ছিল ৯১ এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ের মাধ্যমে। ৩১ মার্চ (১৯৯১) জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩০ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) লাভ করে ২৮টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী ২টি আসন। সংরক্ষিত মহিলা আসনে ২৮টি আসন লাভ করায় বিএনপি একক ভাবে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। ফলে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক সরকারের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রী পরিষদ ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তনের পর ১৯ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে গঠিত খালেদা জিয়ার মন্ত্রী পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এবং একই দিন সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী সরকার প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের (মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী সহ) মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ করে। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছর পর দ্বিতীয় বারের মত সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার দায়িত্বশীল সরকার ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। সূচিত হয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

চ) ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভের কারণ ঃ

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন এবং পরবর্তীতে সরকার গঠন করতে সক্ষম হন। ১৯৮২ সালে তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেঃ হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিএনপি'র কাছ থেকে যে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ছিল ১৯৯১ সালে বিএনপি নেত্রী ও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের আপোষহীন নেত্রী হিসেবে খ্যাত বেগম খালেদা জিয়া সেই ক্ষমতায় পুনঃ প্রবর্তন করেন। দীর্ঘ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বেগম জিয়া জনগনের যে আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছিলেন সেই আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে জনগণ ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। বিএনপির এই ক্ষমতা আরোহন কোন নির্দিষ্ট কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না : বিএনপি'র ক্ষমতারোহনের পিছনে বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল। সাপ্তাহিক পূর্নিমা ২৮ সংখ্যার ইয়াসিফ আকবরের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, 'জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপুল বিজয়' নিবন্ধে বিএনপি'র বিজয় সম্পর্কে মূল্যায়ন করেন যে " বিএনপি'র এই বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কথা ও কাজের সংগতি, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ে আপোষহীনতা, তীব্র ব্যক্তিত্ব ঝাঝালো আকর্ষণের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। দেশনেত্রী যেখানেই নির্বাচনী সভা করেছেন সকল স্থানে বিএনপি প্রার্থী ব্যতিক্রমহীনভাবে জয়ী হয়েছেন"।[৭৫] একই নিবন্ধে আওয়ামী লীগের পরাজয় ও বিএনপি'র জয়লাভের কারণ প্রসঙ্গে ন্যাপের সৈয়দ আলতাফ হোসেন বলেছেন " অহমিকা বোধই আওয়ামী লীগকে ডুবিয়েছে। জনগণকে ইতিবাচকভাবে উদ্বুদ্ধ করার চাইতে আওয়ামী লীগ আত্মপ্রচারণায় বেশী মশগুল ছিল। নির্বাচনে বিএনপি মাত্র ১০টি আসন পাবে। এ ধরণের আত্মম্ভরিকতাপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে শেখ হাসিনা তার নির্বাচন প্রচারভিযান শুরু করেছিলেন। সকল নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলে ছিলেন, আমাকে ২০০টি আসন দিন আমি আপনাদের গণতন্ত্র দিব। শেখ হাসিনা এ ভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হাতের মুঠোয় নিয়েছিলেন।"[৭৬] সিপিবি নেতা সাইফুদ্দিন মানিক আওয়ামী লীগের পরাজয় সম্পর্কে বলে ছিলেন, " ২৫ ফেব্রুয়ারীর রেডিও টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার বক্তৃতা পরাজয়ের মূল কারণ।[৭৭] সাপ্তাহিক পূর্নিমা ৩০ সংখ্যায় আহমেদ সিরাজ/ইরাজ আহমেদ এক প্রতিবেদনে বিএনপির জয়লাভ সম্পর্কে বিএনপি'র ৪জন শীর্ষস্থানীয় নেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, ডঃ মোশররফ হোসেন এবং সাদেক হোসেন খোকার অভিমত তুলে ধরেছেন। উক্ত ৪ জন নেতা প্রত্যেকে বিএনপির জয়লাভ সম্পর্কে ৫টি করে কারণ বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো ঃ [৭৮]

ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অভিমত ঃ

১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ও কর্মীবৃন্দ বিএনপি আমলের সাফল্যের ইতিহাস সঠিকভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরতে পেরেছেন। একই সঙ্গে তারা আওয়ামী আমলের ৪বছরের ব্যর্থতা, 'বাকশাল' সৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা, রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ইত্যাদিও জনসমক্ষে সঠিক প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছিলেন।

২. আওয়ামী লীগ নেত্রী ও কর্মীদের অধিকাংশের উগ্র ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ওপর ব্যক্তিগত অশালীন ও মিথ্যা আক্রমন, এরশাদের সঙ্গে জিয়াকে ব্রাকেটকরণ ইত্যাদি জনগণ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে বিএনপি নেত্রী সহ অন্যান্য বক্তা ও কর্মীদের ইতিবাচক বক্তব্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ব্যক্তিগত আক্রমনের বাইরে রাখা-জনগণের কাছে ভবিষ্যত শান্তি - শৃংখলার ইঙ্গিতবহ বলে মনে হয়েছে।

৩. আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ 'সম্প্রদায় নির্ভর রাজনীতি' সেই সঙ্গে 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গ্রহণ করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় অনুভূতি, মূল্যবোধের নেতিবাচক মনোভাব ভোটারগণ ভালো চোখে দেখননি। ভোটারদের কাছে ধর্মীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ছিল - এটা বিএনপি'র বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

৪. এরশাদ বিরোধী ভূমিকায় বিএনপি নীতিভিত্তিক ছিল, তারা আপোষ করেনি। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের ভূমিকা দোদুল্যমান ও সন্দেহজনক ছিল। এটা জনগণের নজর এড়ায়নি।

৫. নেত্রী হিসেবে আচরণ, বক্তব্যে খালেদা জিয়া জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা কেড়ে নিয়েছেন। অন্য

Dhaka University Institutional Repository

দলের নেতা-নেত্রীরা ও প্রতিযোগিতায় বেশ পিছিয়ে ছিলেন।

ব্যারিস্টার সালাম তালুকাদারের অভিমত ঃ

১. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন- খাল খনন, গণশিক্ষা, গ্রাম সরকার পদ্ধতি প্রভৃতিতে আমরা বিশ্বাস করি। বিএনপি এসব কর্মসূচী নিয়ে জনগণের কাছে গিয়েছে এবং জনগণ এসব কর্মসূচীতে বিশ্বাস করে তাদের ভোট দিয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও কর্মকান্ড দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

২. এবারের নির্বাচনে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংবিধানে সংযোজন করার বিষয়টি জনগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়টি বিএনপি'র বিজয়ের পক্ষে কাজ করেছে।

৩. শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলে আইন-শৃংখলার উন্নতি, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মোটকথা সে সময়ে দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের জনগণ সে আমলের কথা ভুলে যায়নি। যেমন- তারা ভুলে যায়নি আওয়ামী লীগের আমলে দুঃশাসনের কথা। তাই তারা খুব সচেতনভাবে বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন।

৪. বিগত নয় বছরে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন মনোভাব বিএনপি'র এই বলিষ্ঠ ভূমিকাকে জনগণ গ্রহণ করেছেন সাদরে।

৫. কথা এবং কাজের সমন্বয়, কোন ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ না করা এবং বিশেষ করে '৯০ এর আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য বজায় রেখে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা এ বিজয়কে নিশ্চিত করেছে বলে আমরা মনে করি।

ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেনের অভিমত ঃ

১. বিএনপির'র বিজয়ের পেছনে সব চাইত বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে বেগম খালেদা জিয়ার ভাবমুর্তি। বেগম জিয়া যা বলেছেন, তা করেছেন। যা বলছেন তা করবেন বলে জনগণের মধ্যে একটি বিশ্বাস তৈরী হয়েছিল।

২. এবারের নির্বাচনের ফলাফলের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ছাত্র এবং যুবকেরা। এই শ্রেণী নির্বাচনের স্রোতধারা নির্ধারণ করেন। এই ছাত্র এবং যুবক শ্রেণী এই ভূমিকা পালন করেছে বরাবরই। তাদের ভোটগুলো পেয়েছে বিএনপি।

৩. বিএনপির সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যও এ নির্বাচনে সহায়তা করেছে। জনগণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে যে, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জনগণভিত্তিক রাজনীতি আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতীয়তাবাদের ধারায় দেশ আবার ফিরে আসবে।

৪. আওয়ামী লীগের নিজস্ব বক্তব্য বিএনপিকে বিজয়ী হতে সহায়তা করেছে। আওয়ামী লীগের বক্তব্য থেকে জনগণের ধারণা হয়েছে যে, তারা ক্ষমতায় গেলে '৭২ এর সংবিধান আবার ফিরে আসবে। তারা ক্ষমতায় গেলে আবার চারটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি আবার শুরু হয়ে যাবে। জনগণ এজন্য ও বিএনপিকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে।

৫. বিএনপির পক্ষে সর্বশেষ যে শক্তি কাজ করেছে তা হচ্ছে উপযুক্ত প্রার্থী ও দীর্ঘদিন ধরে কর্মীদের প্রচন্ড পরিশ্রম।

সাদেক হোসেন খোকার অভিমত ঃ

১. আমরা মনে করি গত সাড়ে আট বছর লড়াইয়ের ইতহাস সারাবাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিএনপ'র জনপ্রিয়তা বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, শাসন কাজে সততার স্বাক্ষর এবং সর্বোপরি বেগম খালেদা জিয়ার ইতিবাচক রাজনীতি মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া এরশাদের অর্থ কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে নারী কেলেঙ্কারী, আওয়ামী লীগের সময়কার দুঃশাসনের প্রেক্ষিতে আমরা ছিলাম এবারের নির্বাচনে পজেটিভ ফোর্স।

২. আমাদের এলাকায় আওয়ামী লীগের ধারণা ছিল যে, 'মাইনরিটি ভোট' তারা সহজেই পেয়ে যাবে এবং বিজয় তাদের সুনিশ্চিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়েছে তাই ব্যক্তি খোকাকে তারা আন্ডার এস্টিমেট করেছিল। কিন্তু বিএনপি তাদের মধ্যেও আস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

৩. নির্বাচনে কৌশলগত দিক থেকে বিএনপি ছিল অগ্রগামী। এই এলাকায় ছাত্র এবং তরুনদের আগ্রহকে সাংগঠকনিক রূপ দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদীমনা লোকদের একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়া সম্ভব হবার ফলেই বিএনপি'র বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে।
৪. এই নির্বাচনী এলাকার আওয়ামী লীগ মোঃ হানিফকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে করে বিএনপি তথা আমার সুবিধা হয়ে যায়। জনাব হানিফ দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। তাছাড়া তার জাতীয় পার্টি কানেকশনও রয়েছে। এটা আমাদের পক্ষে একটি বাড়তি সুবিধা হিসেবে কাজ করে। তাদের দলীয় লোকেরাও এ ব্যাপারে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে।
৫. স্থানীয়ভাবে মহল্লাবাসী, কর্মী ও ক্রীড়া সংগঠকরা সহায়তা করেছেন। তাছাড়া এটা ব্যাক্তি খোকার নির্বাচন ছিল না। এটা ছিল বেগম খালেদা জিয়া ও ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচন । এই মর্যাদার লড়াই সমস্ত কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।"

আওয়ামী লীগের পরাজয় তথা বিএনপির বিজয় সম্পর্কে পূর্নিমায় পূর্বোক্ত সংখ্যায় আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা জনাব তোফায়েল আহম্মেদ বলেন, " আওয়ামী-লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছিলো পরাজয়ের আর এক অন্যতম কারণ ভারতকে জড়িয়ে ধর্মহীনতার কথা বলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচারণা চালানো হয়েছে।"[৭৯] উক্ত সাক্ষাৎকারে জনাব তোফায়েল আহম্মদ অবশ্য আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ হিসেবে দলীয় সাংগঠনিক দুর্বলতার কথাও স্বীকার করেছেন। একই প্রতিবেদনে আওয়ামী লীগের অপর এক প্রভাবশালী নেতা জনাব মোহাম্মদ নাসিম পরাজয় সম্পর্কে বলেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লাগামহীন মিথ্যাচার এবং সকল দক্ষিন পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নির্বাচনী গোপন আঁতাতের কারণে আমরা আশানুরুপ ফল লাভে ব্যর্থ হই।"[৮০] পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভ ও আওয়ামী লীগের পরাজয় উল্লেখিত বক্তব্য থেকে নিম্ন লিখিত কারণ সমূহ চিহ্নিত করা যায়।
১. বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন নেতৃত্ব, কথা ও কাজের সমন্বয়, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে।
২. আওয়ামী লীগের অতীত শাসনের ব্যর্থতা, বাকশাল সৃষ্টি, '৭৪ এর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে মানুষের মনে আওয়ামী ভীতি কাজ করেছে।
৩. আওয়ামী লীগের অহমিকা বোধ ও আত্মপ্রচারনা। এবং সর্বোপরি নির্বাচনে জয় লাভ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ অতি আত্মবিশ্বাসী ছিলো বলে।
৪. আওয়ামী লীগ নেত্রী ও কর্মীদের উগ্র আক্রমনাত্মক বক্তব্য ও আচরণ। বিশেষ করে দলীয় সভানেত্রীর ২৫ ফেব্রুয়ারীর (১৯৯১) জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনে দেয়া নির্বাচনী বক্তব্যে।
৫. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতির কারণে। বিশেষ করে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ইতোপূর্বে বিএনপির শাসনামলে ' বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করায়।
৬. বিএনপি'র তথা জিয়াউর রহমানের খাল খনন, গণ শিক্ষা ও গ্রাম সরকার সহ বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি জনগণ আস্থা স্থাপন করার কারণে।
৭. ছাত্র ও যুবদের মধ্যে বিএনপি'র প্রতি সমর্থন থাকার কারণে।
৮. আওয়ামী লীগ ৭২ এর সংবিধান পুনঃ প্রবর্তনের কথা বলেছে। কিন্তু জনগণ জাতীয় মূলনীতি সহ সংবিধান অক্ষন্ন রাখতে চেয়েছে।
৯. মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আইন শৃংখলার উন্নতির কারণে।
১০. আওয়ামী লীগ বিরোধী অপপ্রচার বিশেষ করে ভারত ও ধর্মহীনতার প্রসঙ্গ তোলার কারণে।
১১. আওয়ামী লীগের দলীয় সাংগঠনীক দুর্বলতা গোপন আতাঁত।
১২. নির্বাচনে দক্ষিণ পন্থী দল সমূহের সাথে গোপন আতাঁত।
১৩. বিএনপির সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও কর্মসূচির কারণে।
১৪. বিএনপির উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন ও নেতাকর্মীদের ত্যাগ স্বীকারে কারণে ; এবং
১৫. বিএনপি তাদের বক্তব্য জনগণের সামনে সঠিক ভাবে তুলে ধরতে পারার কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত কারণ সমূহের আলোকে বিএনপি'র জয়লাভ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি ;

১। বাকশাল ভীতি ঃ জনগণের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বাকশাল পুনরায় চালু করা হবে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল সৃষ্টি করে যে একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে ছিল। জনগণ সেই ব্যবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাই। তাই বাকশাল ভীতি ভোটারদের মধ্যে প্রবল ভাবে কাজ করেছে।

২। আওয়ামী ভীতি ঃ আওয়ামী লীগের (১৯৭২-১৯৭৫) শাসনামলের স্মৃতি জনগণের কাছে খুব একটা সুখকর ছিল না। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার, গণবাহিনী, নকশাল বাহিনী, গোপন বাহিনী, প্রভৃতি বাহিনীর নেতিবাচক কার্যকলাপ, ১৯৭৪ সালের দূর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ হানি, গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরিবার তন্ত্র কায়েম করার কারণে জনগণের মনে আওয়ামী ভীতি কাজ করেছে যার ফলে বিএনপির পক্ষে জয়লাভ সহজ হয়েছে।

৩। আওয়ামী লীগের প্রতি অবিশ্বাস ঃ ১৯৮৬ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আওয়ামী লীগ আন্দোলনের মাঠ থেকে ক্ষমতার লোভে এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জাতির সঙ্গে যে বিশ্বাস ঘাতকতা করে ছিল তা জনগণ সহজে ভুলেন নাই। তাই আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নাই। তারা পুনরায় জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবেন কিনা।

৪। সংবিধানের পরিবর্তন আশংকায় ঃ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আওয়ামী লীগ - '৭২ এর সংবিধানে পুনঃ প্রবর্তনের কথা বলেছে। কিন্তু ৫ম সংশোধনী থেকে ১০ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। এর মধ্যে সংবিধানের ও মূলনীতি সহ সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সংযোজন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে গণ ভোটের বিধান, ইত্যাদি বিষয় সমূহ পরিবর্তনের আশংকায় জনগণ বিএনপি'র পক্ষে রায় দিয়েছে।

৫। জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও সততা ঃ মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত সততা ও আদর্শ এদেশের অধিকাংশ নাগরিকের মনে রেখাপাত করেছিল পূর্ব থেকেই। তাই জিয়াউর রহমানের মৃত্যুকে তারা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। জিয়াউর রহমান এদেশের গ্রাম বাংলার আপামর মেহনতি মানুষের মনে একটি স্থায়ী আসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা এরশাদ তাঁর দীর্ঘ নয় বছরে কখনও করতে পারেন নাই। তাই ১৯৯১ সালে জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি যখন জনগণের কাছে জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়েছেন। তখন জনগণ জিয়াউর রহমানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য বেগম জিয়াকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

৬। সুসংগঠিত ছাত্র সংগঠন ঃ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী দলের অংগ সংগঠন 'ছাত্র দল' এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এরশাদের শাসনামলে তাই দেখা গেছে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বিপুল বিজয় অর্জন করেছে। এ কারণে ছাত্র দলের সাংগঠনিক ভিত ও বেশ মজুত ছিলো। ফলে ছাত্র সমাজ এবং তরুনদের মধ্যে বিএনপির ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই ছাত্র এবং তরুনরাই '৯১ এর নির্বাচনে বিএনপির বিজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৭। বিএনপির গণমুখী নির্বাচনী ইশতেহার ঃ বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সহ সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলেছে। নিরক্ষরতা দুরীকরণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছে। কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দান সহ গরীব চাষীদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ করা সহ সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের বিভিন্ন কর্মসূচি নির্বাচনী ইশতেহারে সংযুক্ত করেছে। ফলে জনগণ সহজেই বিএনপির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

৮। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে ঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান। এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বিএনপি ইতোপূর্বে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' এবং জাতীয় চার মূলনীতির একটিতে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" সংযুক্ত করেছে। বিএনপি তাই ইসলামী আদর্শ সমুন্নতরেখে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় এদের অধিকাংশ অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত। এই শ্রেণী ধর্ম নিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা মনে করে এবং বিএনপি'কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে অধিক নিরাপদ মনে করে বিএনপিকে জয়যুক্ত করেছে।

৯। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ঃ আদর্শগত দিক থেকে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি একই মতাদর্শে গড়া অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। বিএনপির কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা কেড়ে নিলেও রাষ্ট্রের তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আনা হয় নাই অর্থাৎ বিএনপি সরকারের পর এরশাদের শাসনামলেও একই ধরণের রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতি অব্যাহত থাকে। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়েও কোন পরিবর্তন আনয়ন করা হয়নাই। ফলে এরশাদের পতনের পর রাজনৈতিক স্থিতিবস্থা বজায় থাকার আশায় জনগণ বিএনপিকে জয়যুক্ত করে।

১০। বাম রাজনীতি পরিহার করার লক্ষ্যে ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে বাম রাজনীতি ও সমাজতেন্ত্রর প্রতি অনীহা রয়েছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ কতিপয় বাম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যে নির্বাচনী ঐক্য করেছিল তা সাধারণ ভোটারদের সুখী করতে পারেন নাই। তাই সাধারণ ভোটারগণ বাম রাজনৈতিক দল সমূহকে ক্ষমতায় দেখতে আগ্রহী ছিলনা বলে বিএনপিকে বেছে নিয়েছে।

১১। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ঃ আওয়ামী লীগের '৭২ - '৭৫ শাসনামলে দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীতে সামরিক শাসনাধীনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে যা এরশাদের পতন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশিলতা বজায় রাখার জন্য জনগণ পুনঃরায় বিএনপিকে ভোট দান করে।

১২। ইসলামী দল সমূহের অনৈক্য ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। তাই সঙ্গতকারণে তারা ইসলামী আদর্শ ও আকীদার প্রতি দূর্বল। বাংলাদেশে যে সমস্ত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল রয়েছে সেই সমস্ত দল গুলোর অনৈক্যের ফলে কোন দলই ধর্ম-বিশ্বাসীদের আস্থা অর্জন করতে পারে নাই। তাই তারা বিএনপিকেই ইসলামী আদর্শের বিকল্প মনে করে ভোট দিয়েছে।

১৩। আওয়ামী বিরোধী অপপ্রচার ঃ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মনে করেন আওয়ামী লীগের পরাজয় এবং বিএনপি'র জয়লাভের পিছনে ব্যাপক আওয়ামী বিরোধী অপপ্রচার কাজ করেছে। বিএনপি'সহ দক্ষিণ পন্থী দল সমূহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আওয়ামী লীগকে ভারত পন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত করে এবং জনগনকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে বাংলাদেশের সত্যিকারের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি দেখা দিবে। বাংলাদেশ ভারতের করদ রাজ্যে পরিনত হবে। ফলে এই ভারত ভীতির কারণে জনগন আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করে বিএনপিকে জয়যুক্ত করেন।

১৪। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দুর্বলতা ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কাছে পরীক্ষিত নেত্রী ছিলেন না। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সময় জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সহ সংকীর্ণ মনমানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তা ছাড়া আওয়ামী লীগ নেত্রীর বক্তৃতা ছিল আক্রমনাত্মক। ২৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯১) জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া তার সর্বশেষ নির্বাচনী ভাষণে নিজ দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করার চেয়ে প্রতিপক্ষের কুৎসা এবং প্রতিশোধ নেয়ার স্পীহা প্রবলভাবে প্রদর্শন করেছেণ। জনগণ আওয়ামী লীগ নেত্রীর এই ধরণের বক্তব্য সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই। সিপিবি নেতা জনাব সাইফুদ্দিন (মানিক) ও দাবি করেন যে ২৫ ফেব্রুয়ারী শেখ হাসিনার বক্তৃতাই ছিল আওয়ামী লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

১৫। আওয়ামী লীগ ঠেকাও ঃ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মোহাম্মদ নাসিম দাবি করেন যে, দক্ষিণ পন্থী দল সমূহের গোপন আঁতাতের কারণে আওয়ামী লীগের পরাজয় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ পন্থী দল সমূহের সাথে বিএনপির কোন আনুষ্ঠানিক বা গোপন নির্বাচনী মোর্চা গঠন করা হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে উল্লেখিত বিভিন্ন কারণে জনগণ আওয়ামী লীগের উপর নাখোশ ছিলেন। যে সমস্ত ভোটার আওয়ামী লীগকে ভোট দিবেন না কিংবা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করেন না কিন্তু বিএনপির কোন শক্তিশালী প্রার্থী না থাকায় কোথাও জামায়াতকে, কোথাও জাতীয় পার্টিকে কোথাও বা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। আবার যে সমস্ত

আসনে জামায়াত কিংবা দক্ষিন পন্থী দল সমূহের কোন শক্তিশালী প্রার্থী ছিল না সেই সমস্ত স্থানে আওয়ামী লীগ ব্যতিত অন্যান্য দলের ভোট বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে চলে গেছে ফলে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর অনেক আসন এইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যে সমস্ত আসনে বিএনপি এবং জামায়াত উভয়ই শক্তিশালী সেখানে কেউ কাউকে ছাড় দেয় নাই উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, '৯১ এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩৪ জয়পুরহাট ১ আসনে ৪৮,১৬৭ ভোট পেয়ে বিএনপি'র মোঃ গোলাম রাব্বানী বিজয়ী হন। এর নিকটতম প্রার্থী অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থানে থাকেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনাব মোঃ আব্বাস আলী মন্ডল প্রাপ্ত ভোট ৪৮,০৯১ ভোট পার্থক্য মাত্র ৭৬ ভোট। তৃতীয় অবস্থানে থাকেন জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান প্রাপ্ত ভোট ৪৩,৩০৮ ভোট।[৮১] বিজয়ী এবং বিজীত প্রার্থীর থেকে মাত্র ৫০০০ হাজারের ও কম ভোট। এখানে তিনজন প্রার্থীই প্রায় সমান ভোট পান। যদি নির্বাচনে কোন আতাঁত হতো তাহলে জামায়াত প্রধান জনাব আব্বাস আলী খানকে ঐ আসনটিতে বিএনপির ছাড় দেয়ার কথা কিন্তু সেখানে স্বল্প ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী জয়যুক্ত হয়েছেন। কাজেই নির্বাচনে গোপন আতাঁতের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ ঠেকাও শ্লোগানটি বেশী কার্যকরী হয়েছে। যা কিনা বিএনপি'র জয়লাভের একটি মূখ্য কারণ ছিল।

১৬। খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব ঃ বিএনপি'র জয়লাভে উল্লেখযোগ্য এবং একমাত্র কারণ ছিল খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব। ১৯৮২ সালের সামরিক শাসনের পর থেকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে ভাবে দলত্যাগ করে এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে তাতে বিএনপি'র ক্ষমতায় যাওয়াতো দুরের কথা অস্তিত্ব থাকাটাই দুস্কর ছিল। বেগম জিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ধ্বংস প্রায় বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও আপন মহিমায় আপোষহীন নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেগম জিয়া জনগণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়ে ছিলেন ব্যাপক ভাবে। বেগম জিয়ার এই ইশ্বান্বিত জনপ্রিয়তার প্রমান পাওয়া যায় ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঐ নির্বাচনে ৫টি আসনে জয়লাভ। পক্ষান্তরে ৯১ এর ক্ষমতা প্রত্যাশী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঢাকার দুটি আসন থেকেই পরাজয় বরণ করেন। কাজেই একতা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে খালেদা জিয়ার ব্যাপক জনপ্রিয়তাই বিএনপিকে দ্বিতীয় বারের মত ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করেছিলো।

অতএব উল্লেখিত কারণ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখ যায় যে, বিএনপি'র ক্ষমতা গ্রহণে কোন একটি মাত্র কারণ নিহিত ছিলনা। এর পশ্চাতে বহুবিধ কারণ নিহিত ছিল। তবে একথা বলা যায় যে বেগম জিয়া দলটিকে ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করেছিল। শুধু বিএনপির ক্ষমতা লাভ নয়। গণতন্ত বিকাশের ক্ষেত্রেও বেগম জিয়ার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। দীর্ঘ আন্দোলনে অক্লান্ত সৈনিকের মত তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের মাঠ ত্যাগ করেন নাই। তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা, তিনি গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই পরিশেষে একথা বলা যায় বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উত্তরনে বেগম খালেদা জিয়া এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

পাদটীকা

১. Emajuddin Ahmed, *The coup of 24 March, 1982*, Emajudding Ahmed Edited, *Society and Politics in Bangladesh*, Dhaka : Academic Publishers 1989, P-170.
২. *Ibid*, p-170.
৩. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫, পৃঃ- ১২৪।
৪. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৩ ইং পৃঃ ৩১৩।
৫. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৫।
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২৪।
৭. হাসানুজ্জামান, *বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ*, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯১ ইং পৃঃ ৩২ ;
৮. Mohammad A. Hakim, *Bangladesh Politics : The shahabuddin Interregnum, Dhaka* : UPL, 1993, P-19.
৯. আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহম্মদ রেজা, *বাংলাদেশ রাজনীতি প্রকৃতি ও প্রবনতা, ২১ দফা থেকে ৫ দফা*, ঢাকা ঃ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ; ১৯৮৭ ইং পৃঃ ৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

১০. এস, আব্দুল হাকিম, *আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়া*, ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স , ১৯৯৪ ইং পৃ.৭।
১১. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকাঃ পড়ুয়া, ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ২১০
১২. এস, আব্দুল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮।
১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮।
১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১।
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮।
১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৯।
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০।
১৮. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫।
১৯. আব্দুর রহিম আজাদ ও শাহ আহম্মদ রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৭
২০. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৫।
২১. Lawrence Ziring, *Bangladesh from Mujb to Ershad : An Interpretive study*, Dhaka : UPL, 1992, P-195.
২২. এস, আব্দুল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৩।
২৩. Mohammad A. Hakim, *Ibid*, p-26.
২৪. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩২৮ ও ৩২৯।
২৫. Mohammad A. Hakim, *Ibid*, p-24.
২৬. এস, আব্দুল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৪।
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।
২৮. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩৬।
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৫।
৩০. এম, এ, ওযাজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৪।
৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৭।
৩২. Mohammad A. Hakim, *Ibid*, p-31.
৩৩. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩৯।
৩৪. এস, আব্দুল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৩।
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৬।
৩৬. *প্রাগুক্ত*।
৩৭. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৩।
৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৪।
৩৯. *প্রাগুক্ত*।
৪০. স্বদেশ রায়, *গণ অভ্যুত্থান ৯০*, ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিসার্স ১৯৯১, পৃঃ ১০।
৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১।
৪২. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*।
৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪৯ ও ৩৫০।
৪৪. Mohammad A. Hakim, *Ibid*- 33
৪৫. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫৩।
৪৬. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (পরিকল্পিত ও সংকলিত) *এরশাদের পতন বিবিসি সহ বিদেশী গণ মাধ্যমের দৃষ্টিতে*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২ ইং, পৃঃ ২৬।
৪৭. এম, এ, ওযাজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫৫।
৪৮. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৮।
৪৯. *প্রাগুক্ত*।
৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৩ ও ৩৪।
৫১. এস, আব্দুল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৫।
৫২. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।
৫৩. দৈনিক '*বাংলার বানী*', ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং।
৫৪. *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, [১৯৮৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, ঢাকাঃ ডেপুটি কন্ট্রোলার, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, কর্তৃক পুনঃ মুদ্রিত ১৯৮৭ ইং পৃঃ ১৭।

৫৫. *প্রাগুক্ত।*

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯।

৫৭. Lawrence Ziring, *Ibid* P-215.

৫৮. দৈনিক 'বাংলার বানী', ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং।

৫৯. অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদের উপদেষ্টাগণ হলেন, বিচারপতি এম, এ, খালেক, কফিল উদ্দিন মাহমুদ, ফখরুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক জেড আর সিদ্দিকী, ডাঃ এম, এ মাজেদ, এ বি এম, জি কিবরিয়া, মেজর(অবঃ) মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), অধ্যাপক রেহমান সোবহান, একে এম, মুসা, আলমগীর এম, এ কবীর , অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ, কাজী ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ইমাম উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, এ, এম, আনিসুজ্জামান, চৌধুরী, এ , কে, এম, আমিুল হক এবং বিকে দাস। সূত্রঃ মোস্তফা কামাল, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা*, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৬৪ ও ১৬৫।

৬০. *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন*, ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকাঃ *প্রাগুক্ত*, পৃঃ১৫।

৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫১।

৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৯০।

৬৩. এস, আব্দুল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৯।

৬৪. সাপ্তহিক 'পূর্ণিমা', *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩।

৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫।

৬৭. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৭২।

৬৮. *প্রাগুক্ত।*

৬৯. *প্রাগুক্ত* ।

৭০. *প্রাগুক্ত* ।

৭১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

৭২. দৈনিক *'সংগ্রাম'* ১২ মার্চ, ১৯৯১ ইং।

৭৩. সাপ্তাহিক *'বিচিত্রা'*, ১৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা ২৯ মার্চ ১৯৯১ ইং পৃঃ-২১

৭৪. 'বোববার' একাদশ বর্ষ২৬ তম সংখ্যা ২৪ মার্চ ১৯৯১ ইং, পৃঃ ১২।

৭৫. ইয়াসিফ আকবর, জাতীয়তাবাদী শক্তির বিপুল বিজয়, সাপ্তাহিক '*পূর্নিমা'*, ৪র্থ বর্ষ-২৮ সংখ্যা -২৭ ফেব্রুয়ারী - ১৯৯১ ইং। পৃঃ ১২।

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

৭৭. সাপ্তাহিক '*পূর্নিমা'*, ৪র্থ বর্ষ - ৩০ সংখ্যা ১৩ মার্চ ১৯৯১ ইং, পৃঃ ১৪।

৭৮. *প্রাগুক্ত* , পৃঃ ১৯-২১।

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৮০. *প্রাগুক্ত।*

৮১. *নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ১৯৯১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পদক্ষেপ।

সূচনা ঃ আধুনিক সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম পদ্ধতি হল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় সরকারের বিকল্প নাই। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে হঠাৎ করে আসেনি বা হঠাৎ করে কেউ চাপিয়ে দেয়নি, এর একটা ইতিহাস আছে। স্বাধীনতার পর সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ধারা শুরু হলেও সংসদীয় গণতন্ত্র কখনও আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারে নাই। স্বৈরশাসক এবং সামরিক শাসন কর্তৃক বারবার সংসদীয় গণতন্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। যা কিনা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে। ১৯৭২-১৯৯০ এই দীর্ঘ ১৯ বছরে বাংলাদেশের জনগণ সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বাদ পেয়েছে মাত্র তিন বছরের। এবং ঐ তিন বছর ও সংসদীয় গণতন্ত্র নামে মাত্র থাকলেও মূলতঃ ছিল এক ব্যক্তি ও দলের ব্যক্তিতন্ত্র ও পার্টিতন্ত্রের শাসন। সত্যিকার অর্থে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কিন্তু (১৯৯১-১৯৯৬) এর সংসদীয় গণতন্ত্র ফলপ্রসু হয় নাই বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন ও মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই বিরোধী দলের গণপদত্যাগের কারণে। তা সত্ত্বেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তন করে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ক) সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস

" বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকেই বিশেষতঃ ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনের আইনের ধারার এ উপমহাদেশে এবং অবশ্যই বাংলাদেশ নামক ভূখন্ড সীমিত আকারে হলেও সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে থাকে।"[১] সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা এবং অভিপ্রায় নিয়ে সৃষ্টি হল পাকিস্তান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৬ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্বলিত সংবিধান গ্রহণ করার পূর্ব থেকেই ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কতিপয় ধারা বলে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাই বজায় ছিল। যদিও ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কবর রচিত হল। ১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে একনায়কতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেয়া হল। তবুও পাকিস্তানের সামরিক শাসনাধীনে এদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল সমূহের আন্দোলনের মূল কেন্দ্র বিন্দু ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিটি নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। স্বাধীকার ও স্বায়ত্ত্বশাসন আন্দোলনেও সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক ৬ দফার অন্যতম দফা ছিল সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা, " The first point called for the establishment of Federation " On the basis of the Lahore Resolution and parliamentary form of government with supremacy of legislature to be directly elected on the basis of adult franchise"[২] ১৯৬৯ সালের ১১দফায় ও যুক্ত করা হয় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি, " এ ছাড়া ১৯৬৬ সালে এন,ডি,এফ, এর ৭ দফা ১৯৬৬ সালের ন্যাপের চৌদ্দ দফা, ১৯৬৭ সালে পি,ডি,এম, এর ৮ দফা, ১৯৬৯ সালে ডাকের (ডি,এ,সি) ৮ দফা, ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগেরমেনিফেষ্টো, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির ৫ দফা, ১৯৭১ সালে ন্যাপ (মোজাফফর) এর ১৭ দফা ইত্যাদিতে ও পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় সরকার পদ্ধতির দাবি অন্তর্ভূক্ত হয়ে ছিল"।[৩] ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের এবং ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি উথাপিত হয়েছিল। '৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আওয়ামী লীগের পক্ষে ব্যাপক জন সমর্থন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিই সমর্থন প্রমাণ করে ছিল। "১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী যেভাবে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুইটি

ডোমিনিয়ন সৃষ্টি হয়ে ছিল বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সময় তেমন কোন এ্যাক্ট বা আইনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়নি" [৪] তবে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহতি পরেই ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিব নগর (মেহেরপুর) অস্থায়ী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয় এবং শেখ মুজিবর রহমানকে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান করে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে একটি সাময়িক সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পরেও শেখ মুজিবর রহমানের পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন দিন পর্যন্ত ১০ এপ্রিলের ' The proclamation of Independence' [৫] ই একমাত্র বৈধ সাময়িক সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষমতা স্বাধীনতা ঘোষণায় দেয়া। " জাতীয় পরিষদের একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ না করা পর্যন্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে সশস্ত্র বহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার হবেন এবং তিনি শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন এবং এছাড়াও তিনি জনগণ এবং সরকারের জন্য যা প্রয়োজনীয় মনে হবে সে সব বিষয়ে ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। [৬] অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং উপযুক্ত সরকার পদ্ধতি বেছে দেয়া।

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি ঃ

১০ জানুয়ারী ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পরের দিন ১১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি " বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশ ১৯৭২ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার টাইপের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হয় এই প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনের পেছনে যুক্তি দেখানো হয় যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিলো বাংলাদেশের জনগণের আকাংখা এবং এই আকাংখা বাস্তাবায়নের জন্যই উক্ত আদেশ জারী করা হয়েছে।" [৭] এই অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মন্ত্রী পরিষদ সরকার গঠিত হল। বিচারপতি আবু সাঈদ চেধুরী রাষ্টপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পর শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান মন্ত্রীত্বে একটি মন্ত্রী সভা গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতি নামে মাত্র রাষ্ট্র প্রধান হলেন। সর্বময় ক্ষমাতা কেন্দ্রীভুত হল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সাময়িক সংবিধান আদেশে একটি গণপরিষদ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, "A Constituent Assembly was formed consisting of the 167 Bengali members of the National Assembly from former East Pakistan and the 298 members of the Provincial Assembly of former East Pakistan elected on the Awami League tickets, in the first and last general elections of undiveded Pakistan held in 1970"[৮] এই গণপরিষদের উপর দায়িত্ব দেয়া হল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার। সাময়িক সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে " সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ও বাস্তবে সংসদের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। সেখানে অবস্থিত ছিলো এমন একটি মন্ত্রী পরিষদের যার সদস্যরা নিজের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়িত্বশীল ছিলেন না এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের কোন পদ্ধতি বিদ্যমান ছিলো না। জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহসহ সকল অধিকার ছিল স্থগিত, হেবিয়াস কার্পাস জাতীয় রীট, অর্ডার কিংবা নির্দেশনামা প্রয়োগ, উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতের উপর হুকুম নামা জারী করা, নিষিদ্ধ করণ, ক্যু ও ওয়ারেন্টো, নিম্ন আদালতে বিচারিত মকদ্দমার নথিপত্র প্রেরণার্থে উচ্চতর আদালতের তলবপত্র জারী ইত্যাকার কার্য সম্পাদনে হাইকোর্টের ক্ষমতা রহিত করে রাখা হয়। [৯]

জাতির জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন এবং এই নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনকাল ছিল ১১ মাস। এই সময়ে রাষ্ট্রপতি ১৭৯টি আদেশ জারি করেন যার অধিকাংশ ১৯৭২ সালের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের, ৫০ অনুচ্ছেদে "ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানবলী"তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। [১০]

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান প্রনয়ন ও সাংবিধানিক সরকারের যাত্রা শুরু

রাষ্ট্রপতির সাময়িক সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে যে গণপরিষদ গঠন করা হয়ে ছিল তার একমাত্র কাজ ছিল দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করা। ১০ এপ্রিল (১৯৭২) গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হয়। এই সাংবিধানিক কমিটি ৬ মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১২ অক্টোবর (১৯৭২) সর্ব প্রথম গণপরিষদে উত্থাপন করেন ও ১৮ অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল আকারে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। গণপরিষদে ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। তবে এই সংবিধান কার্যকরী হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে। সাময়িক সংবিধান আদেশের মাধ্যমে যে সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়ে ছিল নতুন সংবিধানে সেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকেই বহাল রাখা হয়ে ছিল। "২৪ বছরের পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনের অভিজ্ঞতা সৃষ্ট ঐক্যমত্য এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ- দু'য়ের প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামরত এদেশের জনমন্ডলীর ব্যাপক দাবি ও সমর্থনের ফলেই ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির নীতি গৃহীত হয়েছিল"। [১১] নতুন সংবিধানের অধীনে সাংবিধানিক সরকার কার্যভার গ্রহণের সাথে সাথে সাংবিধানিক পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। কার্যতঃ সংবিধান প্রণয়ন ব্যতীত সাংবিধানিক পরিষদের আর কোন কাজ ছিলনা। "আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল সরকার ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর) হাতে যা নিজেকে নির্বাচিত বলে দাবি করলেও কার্যতঃ কোন ফোরামের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলো না।"[১২] নতুন সংবিধানের অধীনে ১৭ ডিসেম্বর (১৯৭২) শেখ মুজিবর রহমান তাঁর মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে নতুনভাবে শপথ গ্রহণ করেন। এর ফলে দেশে সত্যিকারের সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠা পায়। তবে এই সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধি ছিল না। যে গণপরিষদের সদস্যদের নিয়ে সরকার গঠন করা হয়েছিলো সেই গণপরিষদের সদস্যরা পাকিস্তানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পাকিস্তানীদের শোষন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন করার জন্য নয়। তাই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবি উঠেছিল "১৯৭৩ সালের ৪ জানুয়ারী রমনা গ্রীনে আয়োজিত ছাত্রলীগের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব এই সর্ব দলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি বিরোধী দল গুলোকে তিনি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করতে ও অস্বীকৃতি জানান"। [১৩] অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিরোধী দল বিশেষ করে শক্তিশালী সুগঠিত বিরোধী দল আবশ্যক। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭২) থেকে নতুন সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ জাতীয় নির্বাচন। স্বাধীনতাত্তোর কালে দেশে কোন সুগঠিত বিরোধীদল গড়ে উঠতে পারে নি। যদিও আওয়ামী লীগকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল নবগঠিত জাসদ, ন্যাপ (ভাষানী) ন্যাপ মোজাফফর জাতীয় লীগ ইত্যাদি দল সমুহ। নির্বাচনে সরকারী দল কারচুপি না করলেও সরকার গঠন করার মত আসন পেত। বিরোধী দল সমূহ হয়তো সরকার গঠন করার মত আসন লাভ করতে সক্ষম হত না তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করার জন্য বিরোধী দলীয় গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারতো। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের অনুকুলে। বিরোধী দল (উপ নির্বাচন সহ) মাত্র ৯টি আসনে চুড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত হলে কার্যত কোন বিরোধী দলের অস্তিত্ব রইলো না। কারণ উক্ত ৯টি আসনের মধ্যে ৬টিই ছিল স্বতন্ত্র। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ নজর রাখেন যাতে করে বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারেন। মওদুদ আহম্মদ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন, "দলের নেতারা যুক্তি দেখা যে, আতাউর রহমান খান, মশিউর রহমান, এম, এ, জলিল, শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খাঁন মেনন, ডঃ আলীম-আল রাজী, মুজাফফর আহমদ, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত প্রমূখ নেতৃবৃন্দ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তা শুধু মাত্র দলের ওপর প্রত্যক্ষ্য হুমকিই সৃষ্টি করবে না, " জাতির পিতার জন্য ও তা হবে অবমাননাকর" [১৪] অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সংসদে যাওয়া অতীব জরুরী ছিল। উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল আতাউর রহমান খান এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত জয়ী হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন বাকী সকল নেতৃবৃন্দই পরাজয় বরণ করে ছিলেন। মওদুদ আহম্মদ আরও উল্লেখ করেন " ভোট গণনা ও ফলাফলের প্রবনতা যখন কয়েক জন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল তখন অন্ততঃ পক্ষে ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। তারা সমস্ত ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয় ও পূর্বেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স সেগুলোর পরিবর্তে নির্বাচনী কেন্দ্র গুলোতে রেখে আসে।[১৫] রেজোয়ান সিদ্দিকী তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন " নির্বাচনের দিন গণভবনেই নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়ে ছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গণনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনক দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দমত হিসাব অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।" [১৬] আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব বিস্তার না করতেন তা হলে বিরোধীদল বেশ কিছু আসনে জয়ী হতে পারতো। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে যদি বিরোধী দলকে সম্মান জনক আসনে জয়লাভের সুযোগ দেয়া হতো তা হলে সংসদীয় গণতন্ত্র মাত্র আড়াই বছরে মুখ থুবড়ে পড়তো না। এইভাবে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ প্রথম জাতীয় সংসদে প্রায় বিরোধী দল বিহীন সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করেছিল। "৮ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন যে, 'দেশে বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব নেই"। [১৭] এমন কি প্রথম সংসদে বিরোধী দলের কোন নেতাকে স্বীকার করা হয় নাই। কাজেই এই (প্রথম জাতীয় সংসদ) সংসদে কেবল মাত্র সরকারী দলের তথা সংসদ নেতা ছিলেন কিন্তু বিরোধী দলের কোন নেতা ছিলেন না। " ৯ই মার্চ (১৯৭৩) ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ ভট্টাচার্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, "কম পক্ষে ৭০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সুনিশ্চিত বিজয়কে শাসক দল ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিনত করেছে এবং বিরোধী প্রার্থীদের জোর করে পরাজিত করেছে"। [১৮] অতএব প্রথম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব নেই শেখ মুজিবর রহমানের এ দাবি যথার্থ নয় বরং বিরোধী দলকে সুপরিকল্পিতভাবে সংসদে আসতে দেয়া হয় নাই এবং বিরোধী দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় নাই। ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রে পরিনত হয়েছে। শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি আওয়ামী লীগকে স্বৈরাচারী হতে সাহায্য করেছে ; এমন কি পরবর্তীতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপর্যয়ের পিছনে কাজ করেছে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব।

নতুন সংবিধান কার্যকরী হওয়ার ৭ মাসের মধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনেন ১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই, যাহা ১৫ জুলাই (১৯৭৩) থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে গণহত্যা বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষমতা সরকার কে দেয়া হয়েছে। এ সংশোধনী বলে সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে একটি (৩) উপধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে যে, " এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্বত্তেও গণ হত্যা জনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজাদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান-সম্বলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না"। [১৯]

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী পাশ করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী ৩৩ নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সম্বলিত নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়। এই সংশোধনীতে সংবিধানের নবম(ক) নামে নতুন একটি ভাগে ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিকট অর্পন করা হয়। তবে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্বে প্রধান মন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। "সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান নগন্য থাকায় খুব অল্প সময়ে উল্লেখ যোগ্য বিতর্ক ছাড়াই সংশোধনী বিল পাশ হয়ে যায়। আতাউর রহমান খান সহ অন্যান্য বিরোধী নেতা জনমত যাচাইয়ের জন্য এই বিল জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দাবী জানালে সেই দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়।" [২০]

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে ৩৩ নং অনুচ্ছেদের সংশোধিত ক্ষমতা বলে সরকার ১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ নামে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই বিশেষ ক্ষমতা আইন

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়ন ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এর মাধ্যমে বিরুদ্ধ মত ও পক্ষ অবলম্বনকারীদের দমন করা সহজতর হয়েছে। "ওই সময় আওয়ামী লীগ সরকার এমন করে গণতন্ত্র ও সংসদীয় পদ্ধতি ধ্বংস করতে পেরেছিল। ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনী মারফৎ সংবিধানের ২৬ এবং ১৪২ ধারায় সংসদ কর্তৃক সংবিধানে যে কোন সংশোধন-সংযোজন করতে পারার ক্ষমতা লাভের ব্যবস্থা করে নেয়"।[২১] বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারই 'বিশেষ ক্ষমতা আইন'কে ব্যবহার করেছে যথেচ্ছাভাবে। সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী তেমন উল্লেখ যোগ্য ছিল না বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্র সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত করণ চুক্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণা

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত আসে জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। জরুরী অবস্থার কারণ হিসেবে সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে, পাক বাহিনীর সহযোগী দলাল, শত্রুদের এজেন্ট এবং বিদেশী শক্তির বেতনভূক একদল চরমপন্থী এমন ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে যাতে করে রাজনৈতিক স্থিরতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ পদে পদে বিঘ্ন সংকুল হয়ে পড়ছে। এই যুক্তিতে সরকার মনে করেছেন যে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, "দেশে আভ্যন্তরীন গোলাযোগ বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর হুমকি প্রদান করছে" এবং সে কারনেই রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন"। [২২] শেখ মুজিবের জামাতা এম, এ ওয়াজেদ মিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেন, "সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা আমার কছে অশনি সংকেত-মহা বিপদের সংকেত বলে মনে হলো। আমার বুক শিউরে উঠে এক অজনা মহা বিপর্যয়ের আশঙ্কায়। দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও শংকায় আমি মূহ্যমান হয়ে পড়ি। তখন দেশের অনেকেরই এ অবস্থা হয়েছিল বলে আমার মনে হয়"। [২৩] এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংসদীয় গণতন্ত্রের মহা বিপর্যয়ের প্রাথমিক সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। কেননা জরুরী অবস্থা বলবৎ কালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকার সমুহ স্থগিত থাকে, বাকস্বাধীনতা থাকে না, গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ থাকে স্থগিত। এক কথায় জরুরী অবস্থা স্বৈরতন্ত্রেরই এক নব রূপ। সংসদীয় গণতন্ত্রকে অকার্যকর করার জন্যই জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছিল। তাই 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণাকে জাতীয় সংসদে পাশ করানোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্বেরাচারী মনোভাব ; অগণতান্ত্রিক আচরন। ২৮ ডিসেম্বরের জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে ২৫ জানুয়ারী (১৯৭৫) তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ করোনো হয়, তবে এই বিল সম্পর্কে জাতীয় সংসদে কোন আলোচনার সুযোগই দেয়া হয়নি। বিলের উত্থাপনকারী তৎকালীন চীপ হুইফ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রস্তাব রাখেন " Mr. Speaker, Sir, I beg to move, "That there should be no discussion on the resolution of approval of the proclamation of emergencey, and that relevant rules may please be suspended."[২৪] পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে প্রথমে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের কথা বলার লোকের খুবই অভাব ছিল। তবুও সংসদ জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ সরকার Point of order এ বলেন, "মাননীয় স্পীকার, -------- যেহেতু আমাদের সংসদের চীপ হুইপ যে প্রস্তাব দিয়েছেন এটা সম্পর্কে কোন আলোচনা করা যাবেনা- আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এতে এই বিল সম্বন্ধে আলোচনা করার সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পূর্ণ রূপে ক্ষুন্ন হচ্ছে, আমার সংসদের অধিকার ক্ষুন্ন হবে। অতএব, এই সম্বন্ধে আলোচনা জন্য অনুমতি দেওয়া হোক।"[২৫] কিন্তু সরকারী দল সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের এমনকি কোন সরকারী দলের সদস্যকে ও সামান্যতম আলোচনার সুযোগ না দিয়েই উক্ত বিল পাশ করানো হয়। সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষার সপক্ষে যে সমস্ত কারণ দেখিয়েছেন প্রকৃত পক্ষে এগুলো যথেষ্ট ছিলনা। কারণ সরকারী ভাষ্যে বর্নিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত শক্তি সরকারের হাতে যথেষ্ট ছিল। সরকারের হাতে ছিল ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন নামে নিবর্তনমূলক আইন, অস্ত্রআইন, মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিষ্ট্রেশন) অধ্যাদেশ এবং এগুলো প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত ছিল সরকারের রাজকীয় রক্ষী

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনী। কাজেই একথা বলা যায় যে সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষদের প্রতিহত করার জন্যই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিল। সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় স্বৈরাচারে পরিনত করেছিল।

সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত ও একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ঃ

জরুরী অবস্থা জারীর ২৭ দিন পর এবং জরুরী অবস্থা জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হওয়ার কয়েকমুহূর্ত পর ২৫ জানুয়ারী (১৯৭৫) জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণের মধ্য দিয়ে শাসন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করে। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষনায় যে অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সরকারও ছিল রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির তবে অস্থায়ী সরকারের সাথে পার্থক্য হল চতুর্থ সংশোধনী বলে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থার সাথে একটি মাত্র জাতীয় দল ব্যতীত অন্য সকল দলের বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রপতিকে করা হল শাসন ব্যবস্থার প্রধান এবং একই সাথে রাষ্ট্রের প্রধান। এই পরিবর্তন সম্পর্কে মফিজুল হক চৌধুরী তাঁর এক নিবন্ধ লিখেছেন।

"But it was seen that after few years, that regime changed its policies, shifted preferences, changed values and behaviours. As a result parliamentary form of government was transformed into a presidential form of government, a multiparty system into a one party system, a liberal democratic system in to an authoritarian regime, with out earing for public opinion and neglecting or suppressing the wishes and sentiments of the opposition parties. "[২৬] এই পরিবর্তনের ফলে স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে গণতন্ত্রকে বিদায় দিতে হল। সংবিধানের এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করে শেখ মুজিবর রহমান সংবিধান সংশোধনের অব্যবহিত পরে প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে সমাপনী বক্তৃতায় যা বলেন, তাঁর সারমর্ম হল, "দেশে সব কিছু ফ্রিস্টাইলে চলছে, এই Free Style চলতে পারেনা, দেশ Couruption এ ভরে গেছে, দেশে অর্থনৈতিক দুরবস্থা বিরাজমান, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা গোপন রাজনৈতিক দল সমূহের গুপ্ত হত্যা, স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা, জনগণের কর্ম বিমুখতা, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, সংবাদ পত্রের অবাধ স্বাধীনতা, খাদ্য ঘাটতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রভৃতি সমস্যা"[২৭] সমূহের সমাধান প্রচলিত রাজনৈতক ব্যবস্থায়; অর্থাৎ গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। তাই তিনি একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় উল্লেখিত সমস্যা সমূহের সমাধান করতে চেয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছেন, "আজ আমি বলতে চাই, This is our Second Revolution"[২৮] তিনি তাঁর এই দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য ও সংবিধানে উল্লেখিত পরিবর্তন আনয়ন করেন। সংবিধানের এই পরিবর্তনেব ফলে সংসদীয় রীতিনীতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কবর রচিত হল। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই দেখা যায় যে, দেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার মাত্র দুই বছর পরে সংবিধানের আমুল পরিবর্তন করে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের ফসল সংসদীয় সরকার বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার পশ্চাতে শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় সংসদে ২৫ জানুয়ারী (১৯৯৫) তারিখের ভাষনে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন তা যথেষ্ট ছিল না। কেননা উল্লেখিত পরিস্থিতি মোকাবেলার মত যথেষ্ট আইন এবং শক্তি শেখ মুজিবর রহমানের হাতে ছিল। মূলত: বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ সংগঠিত হয়ে প্রকাশ্য ও গোপন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের ভিতকে দুর্বল করে দিয়ে ছিল। তা ছাড়া সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে ছিল। সরকারের ভুল ত্রুটি সমূহ জন সমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলের কোন সমালোচনাই সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল না। আবার বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের কণ্ঠরোধ করাও সম্ভব ছিল না। তাই সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পাশাপাশি একটি মাত্র জাতীয় দল গঠন করে বিরোধী দলের কণ্ঠ স্তব্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। বাম পন্থী রাজনৈতিক দল সমূহের দাবি ছিল সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরাসরি সমাজতন্ত্র কায়েম না করে সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত হিসেবে এবং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মাঝামাঝি এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে ছিল। সমাজতন্ত্রে যেহেতু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। বাকশাল কায়েম

করে সমাজতন্ত্রের অনুরূপ একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বাম পন্থীদের দাবিকে দুর্বল করে ছিল এবং সকলকে ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে বাধ্য করেছিল। কেননা ইতোপূর্বে গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল দেশের যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল এবং সরকার বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ঐ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে এমন কি ঐ দলের কাছে অদুর ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল। এবং ঐ দলের মাধ্যমে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে ছিল। এই সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রে সংসদীয় রীতি নীতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। কেবল মাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে কোন আলোচনা ছাড়াই সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন আনা হল। এই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী বিল সম্পর্কে বিরোধী দলকে আলোচনার কোন সুযোগই দেয়া হয়নি। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আলোচনার সুযোগ চেয়ে ব্যর্থ হন। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে বিরোধী দলীয় সাংসদ জনাব মো: আবদুস ছাত্তার জাতীয় সংসদে বলেন, "মাননীয় স্পীকার .... আমরা এটা আজ হাউসে এসে পেলাম। এ সম্পর্কে কোন সংশোধনী আমরা আনতে পারি নাই। এর উপর আমাদের ও প্রস্তাব রাখার অধিকার আছে। এই বিলটি আমরা হাউসে আসার আগে পাই নাই। এর উপর আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। আমি এই বিলের উপর আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দাবী করছি এবং এর বিরোধিতা করছি। এই বিলটি স্বাভাবিকভাবে ৩দিন বা ৭দিনের নোটিশে আনা উচিত ছিল। ৭দিনের নোটিশ ব্যবস্থা Omit করলে ও অন্তত: ৩দিনের নোটিশে আনা উচিত ছিল। কিন্তু দু:খের বিষয় কোন সংশোধনী আনার সুযোগ আমরা পেলাম না"। [২৯] সাংসদ মোঃ আব্দুস ছাত্তার সাহেবের বক্তব্য থেকে দেখা যায় বিলটি সংসদে উত্থাপনের ব্যাপারে ও সংসদীয় রীতি নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ন্যূনতম সময়ের নোটিশ ছাড়াই এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিল সংসদে উত্থাপন করা হল এবং বিন্দু মাত্র আলোচনা ছাড়াই বিলটি পাশ হয়ে গেল। এই বিল পাসের মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকে দলিত-মথিত করার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল।

সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষে শেখ মুজিব যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলো মোকাবেলা করা জরুরী অবস্থার মধ্যেও সম্ভব ছিল। যদিও জরুরী অবস্থার ঘোষনাই ছিল অতিরিক্ত। মওদুদ আহমেদ উল্লেখ করেন, "এর আগে যে সমস্ত কারণ দেখিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল, উক্ত ২৭ দিনে [জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও চতুর্থ সংশোধনী পাসের মধ্যবর্তী সময়] সে ধরনের কোন ঘটনা ঘটনের খবর পাওয়া যায় নি।" [৩০] তা হলে দেখা যাচ্ছে চতুর্থ সংশোধনীর এ পরিবর্তন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন যা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। জরুরী অবস্থা ঘোষণা ছিল এ পর্যায়ে পৌছানোর মধ্যবর্তী পর্যায় বা মানসিক প্রস্তুতি।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করা হয়েছিল। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রী পরিষদ জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকে। এর ফলে মন্ত্রী পরিষদ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহে পরিণত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে নতুন ভাবে একজন উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করা হয় ব্যাপক ভাবে। ইতোপূর্বে সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগ বিশেষ করে হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতেন কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীতে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পন করা হয়েছে। এর ফলে বিচারপতিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য্য গণমাধ্যম হল সংবাদ পত্র এবং এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু এবং কার্যকরীভাবে চলতে পারে। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে, সরকার জুন (১৯৭৫) মাসে সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন নিষিদ্ধ করণ) আদেশ জারি করে চারটি মাত্র সংবাদ পত্র ছাড়া বাকী সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়। তাছাড়া এই সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমানকে ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর বিনা নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় থাকার অধিকার দিয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সংবিধানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই দলটি হবে জাতীয় দল। সংবিধান সংশোধনের পূর্বেই ১৮ জানুয়ারী

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন -" শতাব্দীর জীর্ন ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থা পাল্টে দিয়ে প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ও গনতন্ত্রীকরণ এবং একটি মাত্র রাজনৈতিক প্লাটফর্মের পতাকাতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করে সুসংহত ও সংঘ বদ্ধ জাতীয় প্রয়াস ছাড়া সংকট থেকে পরিত্রানের কোন পথ নেই।"[৩১] একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সাহায্যে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা গেলেও গণতন্ত্র কায়েম করা যায় না। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করে এম, এ ওয়াজেদ মিয়া তাঁর স্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলে ছিলেন "……… দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা কোন মতেই সমীচীন, যুক্তযুক্ত ও বাস্তব সম্মত হবে না। কাজেই সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর উচিত হবে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আদেশ জারী না করা"।[৩২] একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা কতটা ভয়াবহ এবং ঝুঁকিপূর্ণ সে কথা ডঃ ওয়াজেদ মিয়া যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই পরিবর্তন সম্পর্কে ওয়াজেদ মিয়া আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য রাফিয়া আখতার ডলিকে প্রশ্ন করে ছিলেন,"আপনারা এটা কি করলেন"?[৩৩] এর উত্তরে রাফিয়া আক্তার ডলি বললেন, " আমরা বঙ্গবন্ধুর অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুসারী হিসেবে তাঁর পেশকৃত প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত, চিন্তা চেতনা ও ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করার প্রশ্নই উঠে না"[৩৪] কাজেই এ কথা সহজেই অনুমেয় সংসদীয় গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে এক দলের মাধ্যমে স্বৈরতান্ত্রিক এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়ে ছিল। অথচ আওয়ামী লীগের দুইজন সংসদ সদস্য শেখ মুজিবর রহমানের এই পরিবর্তনে দ্বিমত পোষন করেছিলেন, তারা হলেন, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অবঃ) এম, এ, জি ওসমানী। ১৮ জানুয়ারী (১৯৭৫) আওয়ামী লীগের সংসদীয় বৈঠকের পর জেনারেল ওসমানী শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বলে ছিলেন, " আমরা আইউব খানকে দেখেছি, ইয়াহিয়া খান কে দেখেছি। আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুজিবর রহমান খান হিসেবে দেখতে চাইনা।"[৩৫] শেখ মুজিব জেনারেল ওসমানীকে ডেকে বলে ছিলেন, " Don't be excited my old friend, people are fed up with fiery speeches. They want some revolutionary changes in the social. Politicl and economic System."[৩৬] এই বিরোধীতার কারণে এবং চতুর্থ সংশোধনীতে উল্লেখিত দু'জন সংসদ সদস্য ভোট না দেখার কারণে তাদের সংসদ সদস্য পদ হারাতে হয়েছিল। "চতুর্থ সংশোধনীর এই পবির্তন কেবল মুজিব বিরোধীরাই বিরোধীতা করেন নাই। মুজিবের কাছের কিছু রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সংবিধানের এই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন বিশেষ করে একদলীয় সরকার ব্যবস্থার"।[৩৭] এই সংশোধনীর আর একটি দিক ছিল এতে আমলাদের ক্ষমতা খর্বিত হয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তারা ছিল শংকিত। তাঁছাড়া সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও ছিল মতদ্বৈততা- পাকিস্তান প্রত্যাগত ও মুক্তিযোদ্ধা সৈন্যদের মধ্যে। অন্যদিকে রক্ষী বাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনী তাদের ঐতিহ্য ও অধিকার হারিয়ে ছিল। এই নানাবিধ মতদ্বৈততার কারণে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে যে পরিবর্তন করেছিল তার ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়নি।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় যতটুকু গণতন্ত্র অবশিষ্ট ছিল তাও তিরোহিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টসেনাবাহিনীর কতিপয় জুনিয়র অফিসার কর্তৃক শেখ মুজিবর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।" "১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের গদিচ্যুতির পর থেকে শুরু করে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসনের নামে বাস্তবে ঘৃণ্য ব্যক্তিক স্বৈরাচার ও অগণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো টিকে থাকে।"[৩৮] তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসন বজায় থাকায় ৬ এপ্রিলের পর থেকে দেশে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় সাংবিধানিক সরকার গঠিত হয়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনীতির পথ রুদ্ধ করে একদলীয় রাজনীতির যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১৯৭৬ সারের ৪ আগষ্ট সামরিক সরকার এক আদেশে সে ব্যবস্থা রহিত করে বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথ সুগম করেছিল। ফলে সামরিক শাসনাধীনেও বেশ কিছু রাজনৈতিক দল পুনরায় আত্ম প্রকাশ করে। "পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে The second proclamation (Fifth Amendment) order 1978 (second proclamation order No. vi of 1978) দ্বারা ১৮ই

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর, ১৯৭৮ অন্যান্য বিধানবলীর সহিত জনগণের মৌলিক মানবাধিকার বলবৎ করণ এবং রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার অধীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন সংসদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়"। [৩১] (যা কিনা ১৯৭৯ সালের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে গৃহীত হয়ে ছিল)। এরই সূত্র ধরে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। উক্ত নির্বাচনে নব গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দুই তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেন। অবশ্য এর পূর্বেই ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উক্ত দলের মনোনীত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান নির্বাচিত হন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে সামরিক ফরমানের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন কিন্তু তিনি পূর্ববর্তী সরকারের আরোপিত রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাকে বহাল রাখেন। যদিও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনসহ , বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এ সমস্ত পদক্ষেপ সমূহ ও ১৯৭৯ সালের সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে গৃহীত হয়েছিল।

১৯৭৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত দেশে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় ছিল। জিয়াউর রহমান সামরিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্তেও তিনি একটি বেসমরিক প্রশাসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের ৩০মে এক সামরিক অভ্যুত্থানে লেঃ জেঃ (অবঃ) জিয়াউর রহমান নিহত হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যহত হয় নাই। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সরকার ছিল বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশে যখন গণতান্ত্রিক সরকার বিরাজমান ছিল তখনই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেঃ হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ দেশে দ্বিতীয় বারের মত এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক শাসন জারি করলে গণতন্ত্র গভীর সংকটে নিপতিত হয়। এরশাদ দীর্ঘ নয় বছর তার ক্ষমতাকে সংহত করার জন্য কখনও জিয়াউর রহমান কখনও পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইউবখানকে আবার কখনও রাজনীতি বিজ্ঞানের কৌশল বিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভলীকে অনুসরণ করেছেন। তিনি জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে কখনও ঘরোয়া রাজনীতি অনুমোদন করেছে আবার জনগণের চাপের মুখে ঘারোয়া রাজনীতি প্রত্যাহার করে সামরিক আইনের বিধিনিষেধ কঠোর করেছেন। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে গণতন্তত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে এরশাদ জিয়াউর রহমানের অনুকরণে গণভোট দিয়েছেন, রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন, জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুকরণে ১৮ দফা রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়েছেন। ঘরোয়া রাজনীতি, রাজনৈতিক সংলাপ, বিরোধী রাজনীতিকদের নিজ দলে এনে তাঁর ক্ষমতা সংহত করার প্রয়াস চালান। ১৯৮৬ সালে প্রথমে সংসদ নির্বাচন (৩য় জাতীয় সংসদ) অনুষ্ঠান করে নিজ দল জাতীয় পার্টির অনুকুলে ফলাফল আনতে সমর্থ হন। এরশাদ ক্ষমতা ও প্রলোভন দিয়ে সংবিধানের ৭ম সংশোধনীর মাধ্যমে তাঁর দেয়া সামরিক শাসনকে অবৈধ করা সহ সংবিধানকে সাজিয়েছেন নিজের মত। এরশাদ ও পূর্ববর্তী সরকারের ন্যায় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাকে বহাল রেখে এককভাবে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেছেন। জাতীয় সংসদকে তিনি পরিনত করলেন তার আজ্ঞাবহ এক পরিষদে। এরশাদ তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে আর একটি ভোটার বিহিন নির্বাচনের আয়োজন করেন। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহ ঐ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে অবশেষে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে স্বৈর শাসনের অবসান ঘটে এবং দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

খ) সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন ঃ

অস্থায়ী সরকারের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদের " পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন"। বংলাদেশের ইতিহাসে ঐ নির্বাচনকে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াতে ইসামীর সমর্থনে বি এন পি প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

সত্ত্বেও সরকার প্রধান ছিলেন না। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদই ছিলেন সরকার প্রধান।

বি এন পি মন্ত্রী পরিষদ গঠনের পর থেকে সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হল। সরকার পদ্ধতির প্রশ্নটি অমিমাংসিত রেখেই অনুষ্ঠিত হল ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আওয়ামী লীগের সংসদীয় সরকারের পুনঃ প্রবর্তনের পক্ষে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। বি,এন,পির দলীয় আদর্শ ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। নির্বাচনী ইশতেহারে বিএনপি সরাসরি সরকার পদ্ধতির সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই। তবে দলীয় ঘোষণা পত্র, গঠনতন্ত্র ও পার্টির আদর্শকে বিএন,পির নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে বিবেচনা করা যায়। "দলীয় গঠনতন্ত্রের ২ (ছ) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রীয় সরকার ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) এর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ একাধিক দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে জনগণের প্রত্যক্ষভাটে নির্বাচিত সক্রিয়ভাবে জনসমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের মাধ্যমে স্থিতিশীল গণতন্ত্র কায়েম করা এবং সুষম জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়ন"।[৪০] অন্যদিকে ২৮ জানুয়ারী (১৯৯১) তারিখে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সমাবেশে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, "ভবিষ্যত সরকার পদ্ধতির ব্যাপারে নির্বাচিত সংসদেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।" [৪১] নির্বাচন পরবর্তী কালে ২২ মার্চ (১৯৯১) কুষ্টিয়ায় এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "তাঁর দল একটি সার্বভৌম সংসদ ও জবাবদিহি মূলক সরকারের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। [৪২] জাতীয় সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দল জাতীয় পার্টির দলীয় আদর্শ ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে থাকা সত্ত্বেও "জাতীয় পার্টির হাই কমান্ড পার্টির অবস্থান পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠায় আওয়মী লীগের প্রতি সমর্থন দানের কথা জানিয়েছেন। [৪৩] ৩ এপ্রিল " নাগরিক কমিটির আলোচনা সভায় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনে ঐক্যমতে পৌঁছাতে তিন জোটের প্রতি আহবান জানিয়েছেন"। [৪৪] অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ও সরকার পদ্ধতির বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহবান জানান। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, "দলীয় মন্ত্রী সভার সহিত নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্টের মতানৈক্য সৃষ্টির আগেই তিনি অব্যাহতি পাইতে চান কিন্তু স্পীকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত সংবিধান সম্মত কারণ অনুপস্থিত। নতুন প্রেডিসডেন্ট নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিলে ২২শে অক্টোবরের মধ্যে কিংবা এ সংসদ সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে ফিরিয়া গেলে দেড় মাসের মধ্যে তাহার ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহবান জানাইয়া বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'তিন জোটের যুক্ত ঘোষণা বা রূপ রেখা অনুযায়ী সার্বভৌম সংসদের নিকট আমার ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ছিল"। তাঁহার ভাষায়, "এই রূপ রেখার সাংবিধানিক মূল্য না থাকতে পারে, তবে ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট।" [৪৫] অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি "তিন জোটের রূপ রেখার কথা উল্লেখ করেছেন। সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে ১৯ নভেম্বর (১৯৯০) ঘোষিত 'তিন জোটের রূপ রেখা'য় বলা হয়েছে," অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করিতে বাধ্য থাকিবে।" [৪৬] ১৪ এপ্রিল (১৯৯১) আওয়ামী লীগের সংসদ এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ সংসদ সচিবের কাছে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল নামে একটি বিল জমাদেয়। কিছু প্রভাবশালী বিএনপি নেতা সংবিধানের এ সংশোধনীর প্রবল বিরোধিতা করেন। তারা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে যে সমস্তত যুক্তি দেখান সেগুলো হলোঃ[৪৭]

১. তিন জোটের যৌথ ঘোষণায় সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ইহা অত্যাবশ্যকীয় ভাবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার নির্দেশ করে না।

২. ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে নির্বাচক মন্ডলীর রায় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে ছিল।

৩. বাংলাদেশ বিলাস বহুল সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে যেতে পারে না যা পূর্বে ছিল কারণ, সংসদীয় সরকার বহাল থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বহু দেশে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল, যেমন পাকিস্তানে (১৯৪৭-৫৮) এবং ভারতে কংগ্রেসের শাসনের মধ্যবর্তী কাল ; এবং ;

Dhaka University Institutional Repository

৪. রাষ্ট্রপতি এবং সংসদীয় উভয় পদ্ধতির সরকার গণতান্ত্রিক হতে পারে এবং উভয়ই একনায়কতন্ত্রে রূপ নিতে পারে।

মূলতঃ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভে একথা স্পষ্ট হয় যে, জনগণ রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের পক্ষেই রায় দিয়েছে। যেহেতু বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে রাষ্ট্রপতির কথাই বলা হয়েছে (দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী)। বিএনপি প্রধান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন পূর্ববর্তী বক্তৃতায় বলেছিলেন সংসদই ভবিষ্যত সরকার পদ্ধতির মিমাংসা করবে। যেহেতু সংসদে সংখ্যা গরিষ্ঠদল বিএনপি সেহেতু রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও তাঁদের সাংবিধানিক জটিলতায় পড়ার কথা নয়। কারণ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই চুড়ান্ত। কেননা এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ রাষ্ট্রপতির সরকার পূর্ব থেকেই বহাল ছিল। অস্থায়ী রাষ্টপতির ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজন ছিল একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় 'তিনজোটের রূপ রেখায়'। 'তিন জোটের রূপ রেখায়' স্পষ্টভাবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়নি, আবার নির্বাচিত সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে। তবে সব কথার শেষ কথা হল সংবিধান, বিএনপি যদি সংসদীয় সরকারে রাজি না হয়ে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতো তা হলে জনমতকে উপেক্ষা করা হতো না কারণ বিএনপি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানে তারা কখনও সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না। এরপরেও জনগণ যখন তাদের ভোট দিয়েছে সেক্ষেত্রে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি বাধ্য ছিল না। তবুও বিএনপি তিনজোটের রূপ রেখা, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য দল এবং জনগনের দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। এ প্রসংগে ১৮ মে বি,এন,পির পার্লামেন্টারী পার্টিতে সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে এক আভ্যন্তরীণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিতর্কে ভিন্ন ধর্মী তিনটি মতামত পাওয়া যায়। কিছু সংখ্যক সাংসদ সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন ; অন্য কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে মত ব্যক্ত করেন এবং বাকী সকলে রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় পদ্ধীতর মধ্যে সমন্বয়ের মতামত ব্যক্ত করেন। Muhammad A. Hakin উল্লেখ করেন, "In the discusion, three different opinion emerged. Some members pleaded for a parliamentary form of government ; Some other favoured the retention of presidential system; an still others voiced their opinion for a mixture between the presidential and Parliamentary forms" [৪৮] ৫ জুন (১৯৯১) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রেডিও টেলিভিশনের ভাষণে সংবিধান অনুযায়ী অতিসত্তর অব্যাহতি দানের জন্য সংসদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, "সরকার পদ্ধতির প্রশ্নটিও অতিসত্তর মিমাংসার দরকার, সংবিধান মতে আমাকে "অব্যাহতি দেওয়ার পদক্ষেপ নিন।"[৪৯] কাজেই সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে বিরোধী দল সমূহ পেশাজীবী গোষ্ঠী, ছাত্র সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক বিএনপি'র ওপর ব্যাপকভাবে চাপ অব্যাহত থাকে। রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে প্রকারান্তরে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিএনপি'র দলের মধ্য থেকে ও সংসদীয় সরকারের দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। মোহাম্মদ এ হাকিম তাঁর বইয়ে আরও উল্লেখ করেন, " In a meeting of the BNP central executive committee attended by 300 members from all over the country, out of 27 speaker in the meeting 21 expresed their opinion in favour of the parliamentary system." [৫০] জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল বিরোধীদল ও জনগণের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে ৯ জুনের উক্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সভাতেই বিএনপি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১০ জুনের (১৯৯১) বিএনপি'র সংসদীয় দলের সভাতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ১ জুলাই (১৯৯১) প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, " সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জাতীয় সংসদ শিগগিরই এ বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে"।[৫১] প্রধান মন্ত্রীর উক্ত ভাষণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "জনগণের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে বিএনপি সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"[৫২] বিএনপি কেন সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে রাজী হল এ প্রশ্নে মোহাম্মদ এ হাকিম তাঁর পুস্তকে ৪টি কারণ উল্লেখ করেন, কারণ গুলো হলো ঃ [৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ তিন জোটের রূপ রেখার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়ায় দলের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রক্ষা পায়।

দ্বিতীয়তঃ বিএনপি একটি ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিহার করতে সমর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ জনসমর্থন যেহেতু সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সেহেতু বিএনপি একটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করতে সমর্থ হবে।

শেষতঃ এই ইস্যুতে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় সহজতর হবে।"

হাসনউজ্জামান তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, " ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনে আটদল, পাঁচ দল সহ আর যারা সংসদীয় পদ্ধতির সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে গণরায় চেয়েছে তাদের সবার প্রাপ্ত ভোট বিএনপি'র প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে অনেক বেশি হওয়ায় একথা প্রতিভাত হয়েছে যে নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে মত দিয়েছেন। এ বিষয়টি স্বল্পকাল পর অনুষ্ঠিত সংসদীয় পদ্ধতির প্রশ্নে গণভোটের বিপুল গণরায় থেকে অত্যন্ত উজ্জলভাবে প্রমানিত হয়। এসব কারণে বিএনপি'র পক্ষে ওই পর্যায়ে সৃষ্ট জনমতের জোয়ারকে অগ্রাহ্য করাটা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।[৫৪] মূলতঃ জনগণের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সময়ের সাথে গণতন্ত্রকে যুগপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে জাতীয় স্বার্থকেই প্রধান্য দিয়েছিল।

প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ১ জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২ জুলাই (১৯৯১) জাতীয় সংসদে বিএনপি'র পক্ষ থেকে ২টি সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়। প্রথমে আইন ও বিচার মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ পূর্ব পদে (সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে) ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত সংবিধান একাদশ সংশোধনী বিল (১৯৯১) পেশ করেন। উল্লেখ যে ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) বিচারপতি সাহাবুদ্দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দাযিত্বভারগ্রহণের পূর্বে তিন জোটের নেতৃবৃন্দের কাছে একটি শর্ত দিয়ে ছিলেন যে, জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি তার পূর্ব পদে ফিরে যেতে চান। এ প্রসংগে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ৫ জুনের জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণ পুনঃ উল্লেখ করে বলেন, "৩টি রাজনৈতিক জোট এক যুক্ত ঘোষণায় আমাকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া স্বপদে ফিরিয়া যাইব এই শর্তে আমি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করি। তিনি আরও বলেন আমার স্বপদে ফিরে যেতে যদি কোন সাংবিধানিক প্রশ্ন উঠে তা মিমাংসার জন্য তাঁরা বিশেষতঃ দুই নেত্রী ৫ই ডিসেম্বর ওয়াদা দেন ; সেই ওয়াদা সমগ্র জাতির ই ওয়াদা বা National Committment । এর মূল্য সংবিধানের চেয়ে কম নয়" [৫৫] বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের স্বপদে ফিরে যেতে কিছু সাংবিধানিক বিধি নিষেধ থাকায় সংবিধানের এই একাদশ সংশোধন বিল ১৯৯১ উত্থাপনের প্রয়োজন পড়ে। এরপর অর্থাৎ ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বহু প্রতীক্ষিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সংক্রান্ত সংবিধান দ্বাদশ সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন। ইতিপূর্বে দায়েরকৃত আওয়ামী লীগের সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের পূর্বপদে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত বিলটি ৪ জুলাই সংসদে পুনরায় উত্থাপিত হয়। ৪ জুলাই (১৯৯১) দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন আরো ৪টি সংবিধান সংশোধন বিল আনেন। [৫৬] এর ফলে বিএনপির ২টি আওয়ামী লীগের ১টি ও ওয়ার্কাস পার্টির ৪টি সহ মোট ৭টি বিল উত্থাপিত হয়। ৯ জুলাই (১৯৯১) সংবিধান সংশোধন কল্পে দায়েরকৃত উল্লেখিত ৭টি বিল সর্বসম্মত ক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করেন।

উক্ত বাছাই কমিটির সভাপতি ছিলেন আইন ও বিচার মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ। বাছাই কমিটিতে প্রেরণের পূর্বেই সরকারও বিরোধীদলের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্টিত হয়। " এই বাছাই কমিটি ২৮শে জুলাই ১৯৯১ তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের রিপোর্ট প্রদান করে ২৯টি বৈঠকে প্রায় ১০০ ঘন্টা আলোচনা - পর্যালোচনার পর"। [৫৭]

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাস ঃ

৬ আগষ্ট (মধ্যরাত) ১৯৯১ জাতির ইতিহাসে এক উজ্জলতর ক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারী যে সংসদীয় গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছিল সেই সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বার উন্মোচিত হয় এই দিনে। ২ জুলাই উত্থাপিত সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধন বিল ঐ দিন অর্থাৎ ৬ আগষ্ট মাধরাতে ব্যাপক আলাপ আলোচনা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সর্বসম্মতি ক্রমে পাস করা হয়। তবে একাদশ সংশোধনী বিলে জাতীয় পার্টি ভোট দানে বিরত থাকে।

প্রথমেই পাস করা হয় ইতোপূর্বে উত্থাপিত আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের সংবিধান একাদশ সংশোধন আইন (১৯৯১)। এই বিলের পক্ষে ২৭৮ এবং বিপক্ষে ০ ভোট পড়ে। জাতীয় পার্টি ভোট দানে বিরত থাকে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী নিয়ে সমালোচকরা বলে থাকেন একজন ব্যক্তির জন্য এই সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'জাতীয় ঐক্যের প্রতীক' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিভাবক। কাজেই জাতীয় প্রয়োজনেই এই সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছিল। সংবিধনের চতুর্থ তফসিলের ২০ নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে ২১ নং অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে এই সংশোধনী আনা হয়। ২১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "(১) ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১ শে আগ্রাহয়ন মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তাঁহার নিকট পদত্যাগ প্রদান এবং ১৯৯৭ আব্দের ২১ শে অগ্রাহায়ন মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) এর প্রবর্তনের তারিখে (উভয় দিন সহ) মধ্যে বা ৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে (যাহাই পরে হউক) উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রনীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত অথবা প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত বলিয়া বিবেচিত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং আইনানুযায়ী যথার্থভবে প্রণীত, প্রদত্ত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল। (২) সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান মোতাবেক নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণে পর উক্ত উপরাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ১৩৯৭ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রাহায়ন মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে তাহার উক্ত কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণের তারিখের মধ্যবর্তী সময় Supreme Court Judges (Leave, peusion and privileges) Ordinance, 1982 (ordinance No xx of 1982) এর Section 2(a) উদ্দেশ্য সাধন কল্পে প্রকৃত কর্ম (actual Service) বলিয়া গণ্য হইবে।"[২৮] কাজেই দেখা যাচ্ছে এই সংশোধনীর মাধ্যমে একদিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ থেকে তাঁর সকল কার্যাবলীকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং অন্য দিকে দুই নেত্রীর প্রতিশ্রুত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের সপদে ফিরে যাওয়া বাস্তবায়িত হয়েছে।

একাদশ সংশোধনী পাসের পরপরই পাস করা হয় বহু প্রতীক্ষিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি সম্বলিত দ্বাদশ সংশোধনী আইন। তৎকালীন ডেপুটি স্পীকার (পরবর্তীতে স্পীকার) শেখ রাজ্জাক আলীর সভাপতিত্বে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন বিল (১৯৯১) পাস করা হয়। সরকারীও বিরোধী দলের সৌহাদ্য পূর্ণ আলোচনা শেষে দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উপর বিভক্তি ভোটে পক্ষে ৩০৭ ভোট এবং বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে এই বিল পাস করা হয়। এর ফলে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিল পাসের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকামী সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়ন হলো। একাদশ সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর কার্যকরী হলেও দ্বাদশ সংশোধনী কার্যকর করার জন্য সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় গণভোটের প্রয়োজন পড়ে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বলে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২(১) ক ধারায় বলা হয়েছে, সংবিধানের প্রস্তাবনা অথবা ৮,৪৮,৫৬,৫৮,৮০,৯২(ক) বা ১৪২ ধারার কোন বিধান সংশোধন করতে হলে গণ ভোটের প্রয়োজন হবে। কাজেই উক্ত বিধানাবলী পরিবর্তন করতে হলে গণভোটে সম্মতি লাভের পরই রাষ্ট্রপতি উক্ত বিলে অনুমোদন দিতে পারবে। দ্বাদশ সংশোধনীতে উল্লেখিত ধারার মধ্যে ৪৮,৫৬,৫৮,৯২ ক এর অধিকাংশ বিধান সংশোধিত হয়েছে বিধায়, উক্ত বিলটি পাসের ক্ষেত্রেও গণভোটের প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বাদশ সংশোধনীতে অবশ্য ৫৮, ৮০ এবং ৯২ (ক) ধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোট থেকে অব্যাহতি রাখা হয়েছে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের পর রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দিবে কিনা এ প্রশ্নে ৭ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে গণভোটের আয়োজন ও

তারিখ ঘোষণার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্বাচন কমিশন পরবর্তী ৪০ দিনের মধ্যেই ১৫ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) গণভোটের আয়োজন করেন। গণভোটে নির্বাচক মন্ডলী দ্বাদশ সংশোধনীর পক্ষে অর্থাৎ সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে (হ্যাঁ) সূচক রায় প্রদান করেন। "গণভোটের ফলাফলে দেখা যায় 'হ্যাঁ' সূচক ভোট পড়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮৪.৪২ ভাগ এবং 'না' সূচক পড়েছে প্রদত্ত ভোটের ১৫.৫৮ ভাগ"। [৫৯] নির্বাচন কমিশন স্বতস্ফুর্তভাবে অনুষ্ঠিত এই গণভোটের ফলাফল প্রকাশ করেন ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে। রাষ্ট্রপতি ঐ দিনই উক্ত বিলে সম্মতি দানের সাথে সাথে শাসন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার পরিবর্তে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘ ১৭ বছর পর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে নতুন করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ করে। এই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতা খর্ব হয়ে প্রধান মন্ত্রী হলেন নির্বাহী প্রধান। "এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।"[৬০] পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী ঐ দু'টি কার্য ব্যাতীত অন্য সকল ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে সংবিধান '৭২ এর মূল সংবিধানের কাছাকাছি গেলেও '৭২ এর সংবিধান থেকে এই সংবিধানের বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তিত মূলনীতি সমুহ বহাল রাখা হয়েছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী অনির্বাচিত ব্যক্তিকে টেকনোক্র্যাট হিসেবে এক দশমাংশ মন্ত্রী করার বিধান করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর পূর্বে এই টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল এক পঞ্চমাংশ। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ আংশিক পরিবর্তন করে দলবদলকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সংসদীয় গ্রুপ গঠন নিয়ে বিধি নিষেদ আরোপ করা হয়েছে। দ্বাদশ সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতি এবং উপপ্রধান মন্ত্রীর পদ বিলোপ করা হয়েছে। এ সংশোধনীতে সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে ৬০ দিনের বেশী বিরতি থাকতে পারবে না বলে বিধান করা হয়। এছাড়াও "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হইবে" [৬১] বলে দ্বাদশ সংশোধনীতে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণতা লাভ ঃ

১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) থেকে দ্বাদশ সংশোধনী কার্যকর হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। নব আঙ্গিকে প্রবর্তিত এ সংসদীয় গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আবশ্যকতা দেখা দেয়। কেননা সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের ক্ষমতা হস্তান্তরের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। এ উপলক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন ৮ অক্টোবর (১৯৯১) তারিখে, ক্ষমতাসীন বিএনপি জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রদান করেন। অন্য দিকে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে 'জাতীয় ঐকমত্যে'র প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হল। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর উল্লেখিত দুই জন প্রার্থী ও আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ আলহাজ্ব মকবুল হোসেন সহ মোট তিন জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। তবে ৩০ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) তারিখে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন সাংসদ আলহাজ্ব মকবুল হোসেন তাঁর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন ১৯৯১ এর সংশোধনী হিসেবে একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সংসদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দল সমুহ এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এ কথা স্পষ্ট যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করার জন্যই এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। অর্থাৎ সংসদ সদস্যগণকে দলীয় মনোনীত প্রার্থীকে ভোট প্রদানে বাধ্য করা হয়। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১ অক্টোবর (১৯৯১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন (১৯৯১) এর সংশোধন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ৩টি পৃথক রীট দাখিল করেন। ৩ অক্টোবর সরকার উক্ত অধ্যাদেশটি প্রত্যাহার করে নেয়। তবে নির্বাচনে প্রকাশ্যে ভোট দানের বিধানটি বলবৎ রাখা হয়। ৭ অক্টোবর (১৯৯১) সুপ্রীম কোর্টের

Dhaka University Institutional Repository

হাইকোর্ট বিভাগের অবকাশ কালীন বেঞ্চ শুনানি শেষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন স্থগিত হবে কিনা সে প্রশ্নে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ সহ ৭ নেতার পেশকৃত রীট আবেদন নাকচ করে দেন।[৬২] ফলে ৮ অক্টোবর (১৯৯১) জাতীয় সংসদে সদস্যদের প্রকাশ্য ভোট প্রদান ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। নির্বাচনে বিএনপি দলীয় মনোনীত প্রার্থী স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত "জাতীয় ঐক্যমতে'র মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী পান মাত্র ৯২ ভোট। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি নির্বাচনে ভোট দানে বিরত থাকেন। নির্বাচনী ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশিত হলে ৯ অক্টোবর (১৯৯১) আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ১২ তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে পুনঃ প্রবর্তিত সংসদীয় গণতেন্ত্রর পূর্ণতা লাভ করে । এর ফলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীরণের পথ সুগম হল।

প্রথমে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে এবং পরবর্তীতে সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনের পর খালেদা জিয়ার সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের যাত্রা শুরু হয়। খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও সরকারী এবং বিরোধীদলের আচরনে সংসদীয় রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত ছিল। উক্ত শাসনামলের উল্লেখযোগ্য সময় সংসদীয় কার্যক্রম অতিবাহিত হয়েছে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে তবুও সংসদীয় গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

পাদটীকা
চতুর্থ অধ্যায়

১. হাসান উজ্জামান, *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ অক্ষর ১৯৯২ ইং, পৃঃ ১৮।

২. Ronaq Jahan, *Pakistan : Failure in national integration*, Dhaka : UPL [First Bangladesh Edition} 1994. P-167.

৩. হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯।

৪. M. Nazrul Islam, *Parliamentary Democracy in Bangladesh* : An Assessment, Perspectives in social science. Dhaka : Centre for Advanced in Social Sciences. [a compilation volume of seminar paper] volume-5. October 1998. P-53.

৫. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র* ঃ তৃতীয় খন্ড, ঢাকা ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ৪।

৬. M. Nazrul Islam, *Ibid*, p-54

৭. মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসন কাল* ; ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৮৭ ইং পৃঃ ১১।

৮. M. Nazrul Islam, *Ibid*, p-54

৯. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৪।

১০. M. Nazrul Islam, *Ibid*, p-55

১১. হাসান উজ্জামান, *"বাংলাদেশ ১৯৮৯ ঃ নীতিমালার ঐকমত্য," সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নং-৩৪, নভেম্বর ১৯৮৯ ইং , পৃঃ ১-২১।

১২. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১৯।

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৭২।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮০।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮১।

১৬. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *কথা মালার রাজনীতিঃ ১৯৭২-৭৯*, ঢাকা ঃ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, পৃঃ ২১।

১৭. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৫।

১৮. রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

১৯. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংরাদেশের সংবিধান*, [১৯৯৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা ঃ ১৯৯৪ ইং অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) পৃঃ ৩৩

২০. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮৯।

২১. হাসানুজ্জামান, *নব প্রেক্ষাপটে সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকা ঃ অক্ষর, ১৯৯২ ইং, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

২২. মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০৯।

২৩. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, ***বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ***, ঢাকাঃ ইউপিএল ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ২০৬।

২৪. *সংসদ বিতর্ক*[বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকের সরকারী বিবরণী] খন্ড-১, সংখ্যা-২, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ইং, পৃঃ ৩৯।

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪০-৪১।

২৬. Mahfuzul Hoque Chowdhury, *Elites and Political Development in Bangladesh. An overview.* [Seminar procedings of the third National conference of the Bangladesh Political Science Association] Dhaka : Political Science Association, 1995.

২৭. *সংসদ বিতর্ক, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭-৮১।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৫।

৩০. মওদুদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১১।

৩১. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, [১৯৪৭-১৯৭১] ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৯৫ ইং, পৃঃ ৮২।

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৩।

৩৩. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১৯।

৩৪. *প্রাগুক্ত*।

৩৫. মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮২।

৩৬. *প্রাগুক্ত* /

৩৭. M. Nazrul Islam, *Ibid*, p-57.

৩৮. হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৩৯. ***নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন -১৯৯১***, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, [জি পি পি ডি- মাকা-২ ১৪৭২/৯৩-৯৪/(নিঃ) ২২-৯-৯৪ পৃঃ১ ।]

৪০. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৬৩।

৪১. '*দৈনিক ইত্তেফাক*', ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং

৪২. '*দৈনিক সংগ্রাম*', ২৩ মার্চ, ১৯৯১ ইং

৪৩. *প্রাগুক্ত*, ২৮ মার্চ, ১৯৯১ ইং।

৪৪. '*দৈনিক ইনকিলাব*', ৪ এপ্রিল, ১৯৯১ ইং।

৪৫. '*দৈনিক ইত্তেফাক*', ৬ এপ্রিল, ১৯৯১ ইং।

৪৬. *প্রাগুক্ত*, ২০ নভেম্বর, ১৯৯০ ইং

৪৭. Muhammad A. Hakim, *Bangladesh politics : The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka : UPL, 1993, p-74.

৪৮. *Ibid.*

৪৯. '*দৈনিক ইত্তেফাক*', ৬ জুন ১৯৯১ ইং।

৫০. Muhammad A. Hakim, *Ibid*, p-75

৫১. '*আজকের কাগজ*', ২ জুলাই, ১৯৯১।

৫২. *প্রাগুক্ত* /

৫৩. Muhammad A. Hakim, *Ibid*, p-75-76.

৫৪. হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৬।

৫৫. '*দৈনিক ইত্তেফাক*', ৬ জুন, ১৯৯১ ইং।

৫৬. হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৭।

৫৭. *প্রাগুক্ত*

৫৮. *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*,. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৮

৫৯. *গণভোট প্রজ্ঞাপন*, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ৪(১)/৯১-নিঃ১/ তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

৬০. *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর সংবিধান*, *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ৫৬(৩), পৃঃ ৩৫।

৬১. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ১১ (টীকা ৪), পৃঃ ৯।

৬২. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

খালেদা জিয়ার শাসনকাল ঃ সমস্যা ও সংকট

ভূমিকা ঃ

স্বৈরাচার মুক্ত পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতায় আরোহনের পর শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহবুদ্দিন আহমেদের অধীনে মন্ত্রী সভা গঠনের পর প্রথমেই সংকট দেখা দেয় সরকার পদ্ধতি প্রশ্নে। খালেদা জিয়া সময়ের দাবি ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে জন স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে গণতন্ত্রের নব যাত্রা শুরু করে ছিলেন। (যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে)। এর পর যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা হল গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানে অবস্থানকারী এবং পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণকারী গোলাম আযম স্বাধীনতার ৮ বছর পর ১৯৭৮ সালে মায়ের অসুস্থতার জন্য বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে অবৈধভাবে অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘ দিন গোলাম আযম দেশে অবস্থান করলেও এ নিয়ে কোন মহল থোক কোন প্রশ্ন উঠে নাই কিংবা অবৈধ অবস্থানের জন্য বা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কোন মহল থেকে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠনের পর গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমীর (প্রধান) নিযুক্ত করায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং এই কমিটি কর্তৃক ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ গণআদালত নামক তথাকথিত আদালতে বিচারের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করে। সরকার আইন এবং বিচারের মাধ্যমে গোলাম আযম প্রসংগটি মোকাবেলা করে রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ১ বৎসরের মধ্যেই বিরোধী দল সরকারের উপর 'অনাস্থা প্রস্তাব' আনেন। একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক বছর সময় কোন সময়ই নয়, তা সত্ত্বেও বিরোধী দল অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকায় বিরোধী দলের সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। এরপর বিরোধী দল সরকারকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। ১৯৯৩ এর শেষের দিকে বিরোধী দল ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি তুলে। মিরপুর এবং মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই দাবিকে আরও জোরদার করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল আকর্ষণ 'সংসদ', 'সংসদ'কে কেন্দ্র করেই সফল আলোচনা ও বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু বিরোধী দল খালেদা জিয়ার শাসনামলের অধিকাংশ সময়ই সংসদ থেকে বাইরে থাকে। বিরোধী দল সংসদ পরিত্যাগ করে রাজপথে দাবি আদায়ের পথ বেছে নেয়। সংসদ থেকে পদত্যাগ, ধর্মঘট ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বিরোধীদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় থাকে। এ সময়ে দেশে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। চরম রাজনৈতিক অচলবাস্থার মুখে ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর সরকারী দল 'ভোটার বিহীন' বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী 'অবৈধ' স্বল্প স্থায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বহু প্রতিক্ষিত "তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল" পাস করা হয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধী দল তাদের আন্দোলন আরও জঙ্গী করে অসহযোগ আন্দোলনে রূপ দেন। অসহযোগ আন্দোলনের মুখেই খালেদা জিয়ার সরকার ৩০ মার্চ ১৯৯৬ পদত্যাগ করেন এবং সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে বিচারপতি হাবিবুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের দীর্ঘ

Dhaka University Institutional Repository

দুই বছরের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। খালেদা জিয়ার সরকারের এই সংকট সমূহ নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

ক) গোলাম আযম প্রসংগ ঃ

খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার যখন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের দীর্ঘ দিনের বিশৃংখল অবস্থা দুর করে একটি গতিশীল প্রশাসন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তখনই জামায়াত নেতা গোলাম আযম প্রসংগটি সরকারের কাছে একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বেগম খলেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে সমর্থন দিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান। তাই দীর্ঘ দিন দলীয় প্রধান পদটি অস্থায়ী প্রধান ভারপ্রাপ্ত আমীর দিয়ে চালাবার পর ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্বাধীনতা বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত অনাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী তাদের আমীর (প্রধান) হিসেবে নির্বাচন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচন করায় বিভিন্ন মহল থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। "৪ঠা জানুয়ারী (১৯৯২) তারিখে জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হলে "স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানী নাগরিক অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামাতে ইসলামী দলের আমীর (দলীয় প্রধান) নির্বাচিত করা সংবিধানের ৩৮ ধারামতে আইন সম্মত কিনা"[১] সে সম্পর্কে সংসদে প্রশ্ন উথাপন করেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, " জন শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।" [২] এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে ব্যাপক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারী (১৯৯২) বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ৪টি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগের সাংসদ জনাব মোহাম্মদ শামসুল হক, জনাব আজিজুর রহমান, জনাব আব্দুল আওয়াল মিয়া এবং ওয়ার্কাস পার্টির সাংসদ জনাব রাশেদ খাঁন মেননের উত্থাপিত ৪টি প্রস্তাবের মধ্যে স্পীকার আওয়ামী লীগের সাংসদ মোহাম্মদ শামসুল হকের মূলতবী প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ঐ প্রস্তাবের ভিত্তিতে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার সূযোগ পেয়ে মোহাম্মদ শামসুল হক বলেন, " বিদেশী কোন নাগরিককে বাংলাদেশে অবস্থান কালে বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন মেনে চলতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না।"[৩] ওয়ার্কাস পার্টির সংসদ সদস্য জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, " বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী একজন নাগরিক অধিকার রহিত ব্যক্তিকে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত করে একটি মুক্তি যুদ্ধের ফসল আমাদের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে"। জনাব রাশেদ খান মেনন আরও বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম কেবল মুক্তি যুদ্ধ চলাকালেই স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন না, স্বাধীনতার পরও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্ততান পুনরুদ্ধার কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে গোলাম আযম পাকিস্তানের পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ এসে ছিলেন- জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে তিনি বাংলাদেশে আসনি।"[৪] জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুস গোলাম আযমের পক্ষ অবলম্বন করে বলেন, "গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। তার নাগরিক অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা হয়েছে।"[৫] জাতীয় সংসদে ৮ জানুয়ারীর অসমাপ্ত আলোচনা ১২ জানুয়ারী (১৯৯১) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামী সংসদ সদস্য জনাব এনামূল হক বলেন, "গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। যে আদেশ বলে তাঁর নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে, তা অবৈধ। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবেই তাকে আমরা দলের আমীর (প্রধান) নির্বাচিত করেছি।"[৬] এর জবাবে

382790
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

আওয়ামী লীগের সংসদ এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, এটা জামাতে ইসলামী এবং আমাদের মধ্যে বিতর্কের ব্যাপার নয়। সমস্ত দায়িত্ব (বি,এন,পি) সরকারের। সরকারকেই জবাব দিতে হবে। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক কিনা। তার কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য কিংবা কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে কিনা।"[৭] এই দিন এ প্রসংগে বিরোধী দলের অনেক সংসদ সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তবে সমাপ্তি বক্তব্য এবং সরকারী ব্যাখ্যা প্রদান করেন স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী, তিনি বলেন, সরকার গোলাম আযমকে (বাংলাদেশের) নাগরিকত্ব দেয়নি। একজন বিদেশী হয়েও তাঁর (জামাত ইসলামীর) আমীর (প্রধান) নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হয়েছে। এর আইনগত বিষয়াদি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে"। অতঃপর গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থানের নেপথ্য কাহিনী উল্লেখ করে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদকে জানান, "(বাংলাদেশের) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গোলাম আযম (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামাতে ইসলামী শাখার) আমীর ছিলেন। ২২ শে নভেম্বর (১৯৭১) তিনি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৭২ সালে তাকে বিদেশী নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে লন্ডন থেকে তিনি (বাংলাদেশের) নাগরিকত্বের আবেদন করেন। ১৯৭৮ সালেও তিনি আবেদন করেন। কিন্তু দু'বারই তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়। ১১ই জুলাই (১৯৭৮) তারিখে (বাংলাদেশ) সরকারের কাছ থেকে তিন মাসের ভিসা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে আসেন। আসার সময় তিনি তাঁর মায়ের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ছিলেন। ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১ তারিখে গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আনুগত্য প্রকাশ করে "হলফ নামা" দাখিল করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক নন।"[৮] গোলাম আযম প্রসংগটি খালেদা জিয়া সরকারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি সমস্যা। গোলাম আযম ১৯৭৮ সাল থেকে দেশে অবস্থান করছেন। এর মধ্যে বিএনপি'র দু'টি সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের আমল এবং লেঃ জেঃ (অবঃ) হোসেন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন কাল অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে এ ব্যাপারটির জন্য সরকার দায়ী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তব্যে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সরকার গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করেননি। "উল্লেখ্য - ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আদেশের (অস্থায়ী বিধান) ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গোলাম আযম সহ মোট ৩৯ জনকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হিসেবে গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয়, এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে বিদেশে অবস্থান করছিলেন। এদের আচরণ ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং এরা পাকিস্তানে অবস্থান করেছেন"[৯] উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার সময় থেকে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। '৭২ এর পি ও ১৪৯ [প্রজ্ঞাপন ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল][১০] এর মাধ্যমে। ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক প্রেস নোটে নাগরিকত্ব বঞ্চিতদের নাগরিকত্ব ফেরৎ পাওয়ার জন্য আবেদন জানাতে বলা হয়। এই সুযোগে অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭৭ সালে বিদেশ থেকে এবং ১৯৭৮ সালে দেশে এসে আবার আবেদন করেন। অন্যান্যদের নাগরিকত্ব ফেরৎ দেয়া হলেও গোলাম আযমের আবেদন সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। ১৯৭৩ সালের মে মাসেও একবার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের আবেদন করেছিলেন। ১৯৭৯ সালে নাগরিকত্ব ফেরৎ পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন জানালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গোলাম আযমের এ আবেদন ও বাতিল করেছেন। এই ভাবে দেখা যায় গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশ ত্যাগ করেননি। যদিও সরকার ১৯৮৮ সালের ২০ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী সকল বিদেশী নাগরিকদের দেশত্যাগের আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু গোলাম আযম সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশে অবস্থান করতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এরশাদ সরকার ১৯৯০ সালের মধ্যেও গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। যার ফলে সরকারের কাছে এটি একটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক সমস্যা।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন ঃ

১৯ জানুয়ারী (১৯৯২)শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে আহবায়ক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট "একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটি ২৫ মার্চের (১৯৯২) মধ্যে গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবি জানান। অন্যথায় তাঁর বিচার অনুষ্ঠানের জন্য গণআদালত গঠনের কথা বলা হয়। নির্মূল কমিটির প্রথম ঘোষণায় বলা হয়।"- জামায়াতে ইসলামী সম্প্রতি পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমকে তাঁদের আমীর বানিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর সরাসরি আক্রমন চালিয়েছে। এই গোলাম আযম একাত্তরেও জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিল। --- কুখ্যাত পাকিস্তানী জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে এই গোলাম আযম ঘাতক আল-বদর বাহিনী তৈরী এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকসা প্রণয়ন করেছিল। --- মুক্তি যোদ্ধাদের তাঁরা বলেছে দুস্কৃতকারী, 'জারজ সন্তান, আর নিজেদের বলেছে, পাকিস্তান প্রেমিক। এই পাকিস্তান প্রেমের কারণে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরও গোলাম আযম বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে পাকিস্তান ও মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি গঠনের মাধ্যমে। ১৯৭৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার অজুহাতে পাকিস্তানের একান্ত অনুগত নাগরিক গোলাম আযম বাংলাদেশে এসে একাত্তরের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছে জামায়াত ইসলামীকে পুনর্গঠিত করার মাধ্যমে। একাত্তরের ঘাকদের ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৮১ সালের ২৮ মার্চ প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তারা সদম্ভে ঘোষণা করেছে ১৯৭১ সালে আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি। এবং একাত্তরে বাংলাদেশের কনসেপ্ট ঠিক ছিল না। এই কথা বলে তারা অবিরাম হামলা চালিয়েছে মুক্তি যুদ্ধের শক্তির উপর। গত ১২ বছরে তারা শত শত ছাত্র, মুক্তি যোদ্ধা ও রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে।[১১] ১১ ফেব্রুয়ারী (১৯৯২)গোলাম আযম এবং তাঁর সহযোগীদের বিচারের লক্ষ্যে ৪২ সদস্য বিশিষ্ট "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জাহানারা ইমামকে আহবায়িকা ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য সচিব ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রধানদের এ কমিটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

গণআদালত গঠন ও গোলাম আযমের বিচার ঃ

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করে এই কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় সরকার যদি গোলাম আযমকে ২৬ মার্চ (১৯৯২) এর মধ্যে দেশ থেকে বহিস্কার না করে তবে ২৬ মার্চ ঘাদানি (ঘাতক দালাল নির্মূল) কমিটির উদ্যোগে গণআদালত গঠন করে বিচার করা হবে। ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা যদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার হবে বলে মন্তব্য করেন, " এর এক মাস পর ৭ মার্চ (১৯৯২) " শেখ হাসিনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভূক্ত ১ শ জন সংসদ সদস্য গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার প্রসংগে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।"[১২] এবং ঘোষণা করেন ২৬ মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সরকার গোলাম আযমের প্রসংগটি আইনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে প্রথমে ১৩ মার্চ (১৯৯২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণআদালতের উদ্যোক্তাদের সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঐ দিন গণআদালতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন উপস্থিত হওয়ায় আলোচনা ফলপ্রসু হয় নাই। তবে ১৮ মার্চ (১৯৯২) অনুষ্ঠিত সরকার এবং ঘাতক দালাল জাতীয় নির্মুল কমিটির বৈঠকে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার সম্পর্কে

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, "গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের আন্দোলন পরিহার করে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের উপর ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে"।[১৩] কিন্তু নির্মূল কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৬ মার্চের কর্মসূচি সম্পর্কে অনমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। কারণ এর পূর্বেই ১৭ মার্চ গণআদালতে বিচার অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে " মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে গোলাম আযমের উপর এক সমন জারির মাধ্যমে অভিযুক্ত (!) গোলাম আযমকে নির্ধারিত দিনে গণআদালতে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে।

২৬ মার্চ (১৯৯২) তথাকথিত 'গণআদালতে' গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সরকারী কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ঐ দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অস্থায়ী মঞ্চে গঠন করা হয় একটি অস্থায়ী 'আদালত বেঞ্চ'। উক্ত আদালত বেঞ্চের চেয়ারম্যান ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবায়িকা জাহানারা ইমাম সহ ১২জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বিচার কার্য সমাপ্ত করেন। "বাংলদেশের গণমানুষ" বনাম' "গোলাম আযম" শিরোনামে এ মামলায় গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উপস্থাপনা করা হয় এবং ১৫জন স্বাক্ষী গঠিত এ আদালতে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন"[১৫]। মামলার অভিযোগে বলা হয়,"অধ্যাপক গোলাম আযম, পিতা মাওলানা গোলাম কবির' সাকিন পাকিস্তান, ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ, জনপদ ধংস, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধ মূলক কাজে মদদকারী এবং স্বয়ং শান্তি কমিটি, আলবদর, আলশামস বাহিনী গঠন করায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে গণহত্যা, লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণের, ন্যায় জঘন্য অপরাধ সংগঠনের নির্দেশ প্রদান, প্ররোচিত করণ বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নক্সা প্রণয়ন করে নিজস্ব বাহিনী আলবদর, আলশামসকে দিয়ে তাদের হত্যা করানো এবং মুক্তি যুদ্ধ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান পূনরুদ্ধার কমিটি গঠন করে বিদেশী শত্রুর চর হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন।"[১৬] মামলার শিরোনাম অনুযায়ী গণমানুষের পক্ষে অভিযোগ উথাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও ডঃ আনিসুজ্জামান। "গণআদালতের গঠিত বেঞ্চে" উথাপিত অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমান উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় অধ্যাপক গোলাম আযম কে দোষী সাব্যস্ত করেন। উক্ত অস্থায়ী আদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের 'মৃত্যু দন্ড' ঘোষনা করে রায় প্রদান করেন। রায় ঘোষনা কালে জাহানারা ইমাম বলেন," গণআদালত কোন দন্ডাদেশ কার্যকর করে না বিধায় গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি"[১৭]। উক্ত বিচার কার্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গণ মানুষের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না ,এ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল ও এ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা, আসামী পক্ষে ছিলেন, এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম।[১৮]

গোলাম আযম ও গণআদালত সম্পর্কে সরকারী পদক্ষেপঃ

ইতোপূর্বে এক ঘোষনায় সরকার গণআদালতে কোন ধরনের বিচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সরকারে ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়ে ছিল। সরকার ২৩ মার্চ (১৯৯২) রাতে অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি এক কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে বলেছে যে, "সংবিধান লংঘনের মাধ্যমে তিনি জামায়েত ইসলামী বাংলদেশের আমীর নিযুক্ত হওয়ায় তাকে কেন বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবেনা এবং তার বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবেনা আজ মঙ্গলবার (২৪-৩-১৯৯২) সকাল ১০টার মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে"।[১৯] একই দিন সরকার সংবিধান ও আইনের শাসন অবজ্ঞা করে গণআদালত আয়োজন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে গণআদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতিও শোকজ নোটিশ জারি করেন। ২৪ মার্চ(১৯৯২) সরকার গণআদালত উদ্যোক্তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারন করে প্রেস নোট জারি করেন। সরকারী প্রেস নোটে বলা হয় ," যেহেতু সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনগত ব্যবস্থার ফলে গণআদালত প্রতিষ্ঠার মূল কারণ অপসারিত হয়েছে সেহেতু সরকার আশা করেন যে তথাকথিত গণআদালতের উদ্যোক্তাগণ এধরনের সংবিধান পরিপন্থী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবেন."([২০]) একই দিন গোলাম আযম কর্তৃক কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব সরকারের কাছে গ্রহন যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় সরকার ২৪ মার্চ (১৯৯২) মধ্যরাতে জামায়েত ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম কে ফরেনার্স এ্যাক্ট এর আওতায় গ্রেফতার করেন। সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় সরকার ২৫ মার্চ (১৯৯২) নির্মূল কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশে পাশে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। তা সত্ত্বেও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২৬ মার্চ আইন বহির্ভূত ভাবে 'গণআদালত গঠন করে সরকারের প্রচলিত আইন ও সংবিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে বিচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২৮ মার্চ (১৯৯২) 'গণআদালত' উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২৪জনের বিরুদ্ধে[২১] ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব আজিজুল হক ভূইয়ার কোর্টে মামলা দায়ের করেন। ফলে উক্ত কোর্ট থেকে অভিযুক্ত ২৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। অভিযুক্ত ২৪ জনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ড বিধির ১২১(এ), ১২১(বি), ১৪৮, ১২৪(এ), ৩০৭,৫০৫(এ) ও ৫০৬(বি) ধারার আওতায় অভিযোগ কগনিজেন্স নেয়া হয়। ২৯ মার্চ অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী ও বিচারপতি এম.এ. করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে জামিনের আবেদন পেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ডিভিশন বেঞ্চ প্রথমে জামিনের আবেদন গ্রহনে অস্বীকৃতি জানান এবং নিম্ন আদালতে অর্থাৎ যেখানে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে সেখানে আত্মসমর্পন করে জামিনের প্রার্থনা জানাতে উপদেশ দেন। পরে আবেদনকারীদের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন এবং এটর্নী জেনারেলের বক্তব্য শুনে হাইকোর্ট বেঞ্চে আবেদনটির উপর শুনানি গ্রহনে সম্মত হন এবং শুনানি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনের আবেদনকারী ২৪ জনকে গ্রেফতার না করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করেন। অতপর ৩১ মার্চ (১৯৯২) "শুনানি শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চে অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। রায়ে ঢাকার চীফ মেট্রোপুলিটন আদালতকে অবিলম্বে এই মর্মে একটি আদেশ জারি করতে নির্দেশ দেয়া হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঐ আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসর্ম্পনের পর থেকে মামলাটির নিস্পত্তি পর্যন্ত জামিন মঞ্জুরীর স্বীকৃতি থাকবে।"[২২]

'গণআদালত' ও এর কার্যক্রম বিশ্লেষণ ঃ

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারী নিরীহ নাগরিকদের হত্যাকারী লুন্ঠন কারী, নারী ধর্ষণকারী এবং সর্বোপরি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি ও হানাদারকারীর সহযোগীদের বিচার এবং শাস্তি হওয়া উচিৎ একথা যে কোন দেশ প্রেমিক নাগরিকের স্বীকার্য। আধুনিক সভ্য এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন ধরনের বিচার এবং বিচারের রায় কার্যকর করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষই হচ্ছে সরকার গণতান্ত্রিক পরিবেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কার্যকরী থাকা সত্ত্বেও গোলাম আযম প্রসঙ্গে এই ধরনের গণআদালত গঠন এবং এর মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করা আইন এবং সংবিধান সম্মত কিনা এ প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক। তাই উল্লেখিত কার্যাদি বিশ্লেষণে নিম্নে লিখিত প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

প্রথমত ঃ গণআদালত কি ?

দ্বিতীয়ত ঃ গণআদালত কি আইন ও সংবিধান সম্মত?

তৃতীয়ত ঃ গোলাম আযমের বিচার প্রচলিত আইনে কি সম্ভব ছিলনা ?

চতুর্থত ঃ কি উদ্দেশ্যে এ ধরনের গণআদালত গঠন করা হয়েছে?

পঞ্চমত ঃ গোলাম আযম প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকা কি সঠিক হয়েছিল?

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রশ্ন গণআদালত কি? গণআদালত বলতে জনগনের আদালত বা বিচার ব্যবস্থাকেই বুঝায়। ইংরেজীতে যাকে Mass court বা Mass Tribunal বলে। সাধারণত দেশে যখন কোন স্বৈরাচারী সরকার বিরাজ করে আইন আদালত এবং বিচার ব্যবস্থা যখন একজন বা গুটি কয়েক লোকের ইচ্ছাধীনে চলে বা আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে কিংবা জনগণ আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত হন কিংবা আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে জীবন বা সম্পত্তির ধংসের সম্মুখীন হবে কিংবা মতমত বা প্রতিবাদ জানানোর উপযুক্ত পন্থা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকে তখন নিরাপদ কোন স্থানে জনগনের সম্মিলিত ইচ্ছা বা প্রয়াসের ব্যপ্তি ঘটনোর জন্য গণআদালত বা Mass Tribunal গঠন করা যায়। অর্থাৎ প্রচলিত বিচার এবং আইন যখন অনুপস্থিত থাকে এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা থাকে না তখনই গণআদালতের প্রশ্ন আসে। উদাহরন হিসেবে দেখা যায় "হিটলার যখন তাঁর নাৎসী বাহিনীর সাহায্যে জার্মানী সহ গোটা ইউরোপ জুড়ে চালিয়েছে নির্মম অত্যাচার, হত্যা যজ্ঞ, বেসামরিক লোকদের গুলি করে হত্যা, গ্যাস চেম্বারে লাখ লাখ মানুষকে জ্যান্ত শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে, নারী ধর্ষণ লুটতরাজ ইত্যাদি জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত করেছে। হিটলারের বিরুদ্ধে কথা বলার বা প্রতিকার চাওয়ার কিংবা বিচার পাওয়ার উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ না থাকায়। যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে 'নরেম বার্গ ট্রায়াল' অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্রায়াল চার ধরণের অপরাধের বিচার করা হয়। মানবতা বিরোধী, শান্তি ভঙ্গ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা এবং জোড়পূর্বক প্রভুত্ব আরোপ।"[২৩] ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যদের আগ্রাসন ও জনগণ সরকারের যৌথ উদ্যোগে গণহত্যার জন্য বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল লন্ডনে ১৯৬৬ সালের ১৩ নভেম্বর " ভিয়েতনাম ট্রাইবুনাল" আহবান করেন। মার্কিন প্রশাসনের ছত্রছায়ায় জনসন সরকারের কাছে আইনের মূল্য না থাকায় লন্ডনে এই ট্রাইবুনাল আহুত হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, গণআদালত তখনই আহুত হয় যখন কোন একটি দেশে প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা ন্যায় বিচারের অনুকুলে নয় তখনই "গণআদালত" ধরনের কোন আদালতের মাধ্যমে বিচার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ 'গণআদালত' কি আইন ও সংবিধান সম্মত? এ প্রসংগে বলা যায় গণআদালত আইন ও সংবিধানে সম্মত নয়ই বরং আইন ও সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা আইনের আশ্রয়লাভ সম্পর্কে সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, " আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িক ভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে"। [২৪] আবার সংবিধানের ৩৫(৩) অনুচ্ছেদ আলোচনা করলে দেখা যাবে ২৬ মার্চ (১৯৯২) এর 'গণআদালত' সংবিধান সম্মত নয়ই বরং সংবিধানের পরিপন্থী। ৩৫(৩) অনুচেচ্ছদে বলা হয়েছে, "ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকারী হইবেন। [২৫] এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে " আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কথা। 'গণআদালত' আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিলনা ববং এটি কোন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ছিল না। তৎকালীন বি,এন,পি সরকারের তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা গণআদালত সম্পর্কে বলেন, " ----- এটা একটা 'এস্টাবলিষ্ট গভর্ণমেন্টের কাছাকাছি একটি বেআইনী কাজ। ----- সংবিধানের বাইরে কোন কোর্ট হতে পারে না। যারা এটা করেছে তারা বেআইনী কাজ করেছে।" [২৬] জাতীয় পার্টির তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, "গণআদালতের রায় যাহাই হোক না কেন জামায়াত নেতা গোলাম আযমের শাস্তির বিষয়টি আইনের নিজস্ব গতিতে নিস্পত্তি হবে বলে জনগণ প্রত্যাশা করেন। "[২৭]

তৃতীয়তঃ গোলাম আযমের বিচার প্রচলিত আইনে কি সম্ভব ছিল না ? এর উত্তরে বলা যায় যে, গোলাম আযম বা এই ধরণের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা আমাদের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনেই

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রেও যদি সংবিধান দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও গণহত্যা জনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে কিংবা কখন ও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।" ।[২৮] আবার ৪৭ ক এর (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্নিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীনে কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার অধিকার গণ ব্যক্তির থাকিবেনা।"[২৯] এখানেও দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধাপরাধীর বা অনুরূপ অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে যদি অন্য কোন আইনের মাধ্যমে ক্ষমা বা হ্রাস করা ও হয় কিংবা সংবিধানের পরিপন্থী হয় তবুও তা বাতিল বা বেআইনী হবে না। শুধু তাই নয়, ৪৭(৩) দফা যদি করেও ওপর প্রযোজ্য হয় তবে তা'কে সুপ্রীম কোর্টের আশ্রয় লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সকল বাধা অপসারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, আন্তর্জাতিক ক্রাইমস ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট ১৯৭৩ এ ও এই ধরনের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ সুগম করা হয়েছিল," ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই বাংলাদেশের তৎকালীন জাতীয় সংসদে এ্যাক্ট ১৯ যাকে বলা হয় " আন্তর্জাতিক ক্রাইমস ট্রাইবুন্যাল আইন ১৯৭৩" এই আইনটি পাশ করা হয়। গণহত্যা শান্তি ভঙ্গকারী, মানবতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে বিচার করার জন্য আইনটি প্রণয়ন করা হয়।[৩০] কাজেই যেহেতু এ আইনটিও এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে এর মাধ্যমে ও গোলাম আযম সহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা সম্ভব ছিল।

চতুর্থতঃ কি উদ্দেশ্যে এ গণআদালত গঠন করা হয়ে ছিল ? এ প্রসংগে বলা যায়, গোলাম আযম দেশে এসেছে ১৯৭৮ সালে এবং 'গণআদালত গঠন করা হয়েছে ১৯৯২ সালে। এই দীর্ঘ ১৪ বছর গোলাম আযম দেশে অবস্থান কালে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কিংবা 'স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচারের লক্ষ্যে কোন সংগঠন জন্ম লাভ করেনি কিংবা কোন নাগরিকের পক্ষ থেকে এমন কি কোন সরকারের পক্ষ থেকেও প্রচলিত আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই। যদিও সংবিধান অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রচলিত আইনেই গোলাম আযমদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। তা সত্ত্বেও এমন এক সময় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ১৯৭১ এর ঘাতক দালার নির্মূল কমিটি গঠন করা হল যখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার দীর্ঘ দিনের স্বৈরশাসনের অবসনের পর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই এই ধরনের সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারকে বিচলিত এবং সরকারের সুষ্ঠ কার্যক্রমের ওপর আঘাত হানাই এর মূল উদ্দেশ্য এ কথা সহজেই অনুমেয়। কারণ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যাদের নিয়ে করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতি ও আচরণেও এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এ 'গণআদালত' গঠন করা হয়ে ছিল সরকারকে রাজনৈতিক ভাবে পর্যুদস্ত করার জন্য। সমন্বয় কমিটির আহবায়ক জাহানারা ইমাম বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পূর্ণ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা পেয়েই এমন একটি গণ আদালত গঠন করেছিল। শাহরিয়ার কবিরের লেখা বই থেকে জানা যায় যে, " ২৫ মার্চ রাতের বেলা জানাহারা ইমাম শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করে ছিলেন, 'কাল গণআদালতে তোমার সমর্থন আর সহযোগিতা পাবো তো ? পরিস্থিতি যদি খারাপের দিকে যায় সামাল দিতে পারবে ? শেখ হাসিনা তাকে বলেছিলেন, " আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। গণআদালত কেউ আটকাতে পারবেনা। যদি কিছু হয় তার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব আমার।"[৩১] অতএব, বিরোধী দলের নেত্রী যখন দায় দায়িত্ব নিজেই নিতে চান তাহলে এ ঘটনা বিরোধী দলের পক্ষ থেকেই করা হয়েছে এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়টি

Dhaka University Institutional Repository

আরও স্পষ্ট হবে বিরোধী দলীয় নেত্রীর একটি 'চির কুটের' বক্তব্য থেকে, ২৬ মার্চ সকালে 'গণআদালত' বসার পূর্বে শেখ হাসিনা ঘাতক দালার নির্মূল কমিটির আহবায়িকা বেগম জাহানারা ইমামের কাছে একটা 'চিরকুট' পাঠান এতে লেখা ছিল, " আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন। অনেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। কারো কথায় কান দিবেন না। খোদা আপনার সহায় হোন।" [৩২] কাজেই একথা বলা যায় যে, সদ্য গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক ইস্যু না থাকায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকেই এ ইস্যু তৈরী করা হয়েছিল। সমন্বয় কমিটির আহবায়িকা জাহানারা ইমাম বিরোধী দল কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে ছিলেন মাত্র। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ভালভাবেই জানতেন যে গণআদালত আইন বা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোন আদালত নয় এবং এর আইনগত কোন বৈধতা নেই তবুও বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। 'গণআদালত' কর্তৃক রায় ঘোষণার পরপরই বিরোধী দলীয় নেত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, "একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালের বিচারের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে তা আগামী দিনে দেশ বাসীকে প্রেরণা জোগাবে। একই সঙ্গে তিনি গণআদালত পরিচালনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান এই বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন"[৩৩] "দেশ প্রেমিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় পাঁচ দল, জাসদ সিরাজ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এই রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানায়।"[৩৪] পরবর্তীতে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি (ঘাদানি) বেশ কয়েকটি হরতাল, সমাবেশ, সংসদ অভিমূখে পদ যাত্রা ও স্পীকারের কাছে স্মারক লিপিপেশ সহ বেশ কিছু কর্মসূচি পালন করে রাজনৈতিক ও সরকারের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। গণআদালতের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে সমস্ত স্থানে 'গণআদালত' গঠন করা হয়েছে সে সমস্ত স্থানে স্বাভাবিকভাবে আইনের আশ্রয় লাভের কোন স্থানে সুযোগ ছিলনা। কিংবা প্রচলিত আইনকে অস্বীকার করে বা সরকারের সমান্তরাল কোন আদালত গঠনের উদাহরণ পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে আইনের সকল দ্বার যখন উন্মোচিত তখন এই ধরনের গণআদালত গঠন দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানকে অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং বিরোধী দল 'গনআদালত' কে সমর্থন করে অনেক বিবৃতি এবং গণআদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু সেই বিরোধী দলের নেত্রী বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতাসীন সরকারী দল। 'গণআদালতের' প্রদত্ত রায় এখনও বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারী দল সেই রায়ের প্রতি 'শ্রদ্ধাশীল' হতে পারেন নাই। গণআদালতের সামান্যতম বৈধতা যদি থাকতো তাহলে তাদের উচিত ছিল সেই কথিত রায় কার্যকর করা। কিন্তু তারা সেই রায় কার্যকর করা তো দুরের কথা, গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের বিচারের ও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। কাজেই এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, গণআদালত তৎকালীন বিরোধী দল কর্তৃক সৃষ্ট একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি যার মাধ্যমে সরকারকে বিব্রত করা যায়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা যায় এবং কিভাবে সরকারকে পর্যুদস্ত করা যায় তার একটি ব্যবস্থা মাত্র।

পঞ্চমতঃ ও শেষতঃ গোলাম আযম প্রসংগে সরকারের ভূমিকা কি সঠিক ছিল ? এ প্রশের উত্তরে বলা যায় সরকার আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে গোলাম আযমকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রথমে সরকার গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১২ জানুয়ারী (১৯৯২) জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বিবৃতিতে গোলাম আযমকে অনাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করেন। [পরবর্তীতে গোলাম আযম আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি পান এবং বাংলাদেশে তার অবস্থান সম্পর্কে নিরপেক্ষ বক্তব্য পেশ করেন। এরপর গোলাম আযমকে বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব, সরকারের কাছে যথাযথ বিবেচিত না হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ফরেনার্স এ্যাক্ট এর অধীনে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করেন। পাশাপাশি সরকার বেআইনী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য 'গণআদালত' উদ্যোক্তাদের ও প্রথমে কারণ দর্শাও নোটিশ এবং পরে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। কারণ আইন শৃংখলা স্থিতিশীল রাখা সরকারের কর্তব্য। ২৫ মার্চ(১৯৯২) সরকার গণআদালত গঠণের প্রাক্কালে যে প্রেস নোট জারি করে ছিলেন, তাতে বলা হয়ে ছিল, "সরকার এটা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিতে চায়, তথা কথিত গণআদালতের নামে নৈরাজ্য, বিশৃংখলা, সন্ত্রাস ও ঘৃণা সৃষ্টি করে যারা স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অসৎ তৎপরতার সঙ্গে জড়িত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রেস নোটে আরও উল্লেখ করা হয়, দেশের আইন অনুযায়ী গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে আটক রাখা হয়েছে। সর্বশেষে বলা হয়, তথাকথিত গণআদালতে কোন বিচার অনুষ্ঠিত হলে তা হবে সংবিধান মতে প্রতিষ্ঠিত আদালত ও আইনকে অস্বীকার করা।"[৩৫] সরকারের কঠোর হুশিয়ারী সত্ত্বেও ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ মার্চ (১৯৯২) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'গণআদালত' এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২৮ মার্চ গণআদালতের উদ্যোক্তাদের ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন। এ সম্পর্কে বি এন পি'র তৎকালীন তথ্য মন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "তবে আমি মনে করি ব্যাপারটা সম্পুর্ণভাবে আইনের এখতিয়ারে। ----- একটা 'এস্টাবলিসড' সরকারের পাশাপাশি, একটা 'এস্টাবলিসড' রাষ্ট্রীয় আদালত ব্যবস্থার পাশাপাশি, কোনো রকমন 'ন্যাচারাল' বা সমান্তরাল আদালত বসতে পারে না। এ প্রশ্নটা আমরা আদালতে নিয়ে গেছি। যারা এ সব কর্ম কান্ডের জন্য দায়িত্ব বহন করছেন তাদের কাঠগড়ায় যেতে হবে। সেখানে যদি তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন অবশ্যই তারা ছাড়া পাবেন"।[৩৬] কাজেই এমতাবস্থায় সরকারের আইনের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

এছাড়াও 'গণ আদালত' ও গোলাম আযম প্রসংগে জাতীয় সংসদে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১১ এপ্রিল (১৯৯২) থেকে ১৯ পর্যন্ত এপ্রিল সরকারী এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক আলোচনা করা হয় এবং বিরোধী দল ও সরকারী দল থেকে এ সম্পর্কে দু'টো প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বিরোধী দলের প্রস্তাবে বলা হয়, "১৯৭১ এর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জামাতে ইসলামীর আমীর (দল প্রধান) পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আযম ও তার সহযোগীদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম এ্যাক্ট (১৯৭৩) এর অধীনে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচার অনুষ্ঠান এবং জনমতের প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার"[৩৭] সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়, "৩০ লাখ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীন দেশে নয় বছরের সংগ্রামের পর পর নির্বাচিত সংসদের দিকে তাকিয়ে আছে জাতি। এ অবস্থায় সংসদ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর তাই অনাগরিক গোলাম আযমের বিষয়টির নিস্পত্তি করা হবে সাংবিধানিক রীতির প্রচলিত আইনের নিয়মানুযায়ী।"[৩৮] বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে ১৯ এপ্রিল (১৯৯২) সরকারী প্রস্তাবটি পাস করা হয় এবং গোলাম আযমের বিষয়টি আইনের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

গোলাম আজমের নাগরিকত্ব বহাল ঃ

সরকার গোলাম আযমকে গ্রেফতারের পর গোলাম আযমের পক্ষ থেকে নাগরিকতত্বের প্রশ্নে হাইকোর্টে রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের ২ সদস্যের সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার এবং অপর বিচারপতি বদরুল ইসলাম চেধুরী ১১ আগষ্ট (১৯৯২) নাগরিকত্বের প্রশ্নে পরস্পর বিরোধী রায় প্রধান করেন। এই পরস্পর বিরোধী রায়ের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ১ সদস্য বিশিষ্ট হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন করা হয়। ২২ এপ্রিল (১৯৯৩) তারিখে মাননীয় বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী জামাত নেতা

গোলাম আযমকে জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে রায় প্রদান করেন। বিচারপতি চৌধুরী রায় ঘোষণা করে বলেন, "নাগরিক আইনের ধারা ২ অনুযায়ী দালালীর অপরাধে কাউকে নাগরিকত্বের অযোগ্য বলা যাবে না। গোলাম আযমকে জামায়াতের আমীর নিযুক্ত করায় সংবিধান লংঘিত হয়নি।"[৩৯] সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে। ২২ জুন (১৯৯৪) তারিখে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্নে সরকারের আপিল আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। এ রায়ের ফলে হাইকোর্ট বিভাগ গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল রেখে হাইকোর্ট বিভাগ যে রায় দিয়ে ছিলেন তা বহাল রইলো। প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি হাবিবুর রহমান (প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা) সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এ,টি,এম আফজাল(প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) বিচারপতি মোস্তফা কামাল (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) বিচারপতি লতিফুর রহমান (বর্তমান প্রধান বিচারপতি) এই চার জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সর্বসম্মতি ক্রমে ঘোষণা করেন, "সরকারের আপীল আবেদন নাকচ হলো"[৪০] রায়ের প্রতিক্রিয়ায় এটর্নীজেনারেল আমিনুল হক বলেন, "একটি মানুষ যিনি মুক্তিযুদ্ধ কালে আলবদর, আল শামস ও রাজাকারদের ঘাতক বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের বহু নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে। প্রচলিত আদালতে আজ তারই নাগরিকত্ব বহাল হলো। আইন ও সর্বোচ্চ আদালত যখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিচ্ছি" [৪১] সরকার এভাবেই গোলাম আযমের প্রসংগটি নিষ্পত্তি করেছিল। যদিও এ প্রসংগটি খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক সৃষ্ট কোন সমস্যা ছিল না। এটি ছিল সরকারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি পুরানো সমস্যা।

খ) সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র এক বছরের মধ্যেই বিরোধী দল কর্তৃক এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। যদিও একটি সরকারের সাফল্য ব্যর্থতা মূল্যায়ণের জন্য একবছর কোন সময়ই নয়। তার উপর এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরশাদ সরকারের দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের পর। তবুও ১৯৯২ সালের ৫ আগষ্টের জাতীয় সংসদ সচিবালয় সংসদের কার্য প্রনালী বিধির ১৫৯ ধারার উপ বিধি (৩) অনুসারে মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে 'অনাস্থা প্রস্তাব' উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থন করে নোটিশ প্রদান করেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ, জাসদ (সিরাজ) এর জনাব শাহজাহান সিরাজ, ওয়ার্কাস পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন, সিপিবির জনাব সামসুদ্দোহা, জাতীয় পার্টির জনাব মনিরুল হক চৌধুরী এবং গণতন্ত্রী পার্টির জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। ন্যাপের পক্ষ থেকে ও একটি অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়া হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশে বলা হয়েছে যে, "দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। সরকার সে পরিস্থিতির যথোপযুক্ত মোকাবিলা করে জনগণের জান মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরোধ ও ছাত্র ছাত্রী এমন কি শিশু কিশোরদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের ব্যবসা বানিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান চাঁদাবাজ মস্তানদের হতে জিন্মি হয়ে পড়েছে। সরকার অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্ট নৈরাজ্য দুর করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের দলীয় করণ নীতির পরিনতিতে শিল্পাঞ্চল ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নে হাইজাক, টার্মিনাল দখল, কলোনী দখলের ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সরকার শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সরকার সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সে অঞ্চলে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে । সরকার রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সংগঠিত সশস্ত্র তৎপরতা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ঘটনা

প্রতিরোধে ও সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকার বিদেশী দূতাবাসের ও নিরাপত্তা বিধানে ও ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে বিদেশেও দেশের ভাবমূর্তি চরম ভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে"।[৪২] সরকারের বিরুদ্ধে আনীত বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব ৯ আগষ্ট (১৯৯২) জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল কর্তৃক ইতোপূর্বে দাখিলকৃত ৭টি নোটিশের বক্তব্য ও ভাষা একও অভিন্ন হওয়ায় মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী নোটিশ দাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নোটিশ গ্রহণ করেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা জনব আব্দুস সামাদ আজাদ কার্যপ্রনালী বিধির ১৫৯ (৪) অনুযায়ী এ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকারের বিরুদ্ধে আনীত এ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার জনাব শেখ রাজ্জাক আলী বলেছেন, " নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং সুসংহত করার স্বার্থে এবং সর্বোপরি জনগণের মানসিকতাকে গণতান্ত্রিক চেতনা বোধ উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হল"[৪৩] ১২ আগষ্ট (১৯৯২) বিরোধী দলের উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সরকারী দলের ৩০ জন এবং বিরোধী দলে ২৩ জন সংসদে বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, " প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, দলীয়করণ এবং সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে যেন জনগণের কাছে আমরা আমাদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। জনগণ আমাদেরও দোষারোপ করতে শুরু করেছে"। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর সমাপনি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের অভিযোগের উত্তরে যে বক্তব্য রাখেন তা উল্লেখ হল " গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ছিনতাই হাইজ্যাক ও অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরোধী দলের নেত্রীর অভিযোগের উত্তরে বেগম জিয়া বলেন, দীর্ঘ ৯ বছর যে স্বৈরাচার দেশে জেঁকে বসেছিল সেই স্বৈরাচারই সন্ত্রাসকে লালন করেছে, আশ্রয় দিয়েছে প্রশ্রয় দিয়েছে। এ অবস্থায় রাতারাতি কি সব হাইজ্যাক বন্ধ হয়ে যাবে ? সেটি কখনও সম্ভব নয়। আমরা বলেছি, কিছু কিছু সন্ত্রাস অবশ্যই আছে। সে গুলো দমন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে"। তিনি আরও বলেন, "আজকে বুঝতে হবে অস্ত্রের যাত্রা কখন থেকে শুরু হয়েছিল; অস্ত্রধারীদের কারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। জাতীয় পার্টি সারা বাংলাদেশে অস্ত্রের রাজনীতি শুরু করে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে দেযার প্রক্রিয়া তারা শুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, সে দিন সকল রাজনীতিবিদকে হত্যা করার জন্য সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, যার ফলে ডাঃ মিলন নিহত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিরোধী দলগুলি বলতে চায় দেশে কিছু হয়নি। আমি শুধু তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এরশাদ স্বৈরাচার ৯টি বছর দেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে গেছে; দূর্নীতির বীজ বপন করে গেছে প্রতিটি জায়গায়। আজকে আমরা সেই দূর্নীতি উচ্ছেদ করছি"। ---------------- দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান বিএনপি চায়না বলে বলা হয়েছে। আমরা বলতে চাই, "পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কার সৃষ্টি ? আওয়ামী লীগ যখন স্বাধীনার পর ক্ষমতায় ছিল তখন তারা বলেছিল, পার্বত্য অঞ্চলে সকলেই বাঙ্গালী। সকলকে জোর করে বাঙ্গালী করা হয়েছে। তখন থেকেই তারা প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠে। আমরা বলতে চাই, সেখানে বিভিন্ন ধর্মের, গোত্রের ও সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। ------- আমরা বলেছি তারা বাঙ্গালী নয়, বাংলাদেশী। তারা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান চাই, এরই মধ্যে সেটি প্রমানীত হয়েছে"। ------ আমরা একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছি। দলীয়করণের অভিযোগ সম্পর্কে বেগম জিয়া বলেন, "দলীয় করণ কি জিনিষ-তা আমরা জানিনা। আমরা সকলকে সমান সুযোগ

সেই। আপনারা তা দেখেছেন। আপনাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা ঘাট হচ্ছে, ব্রীজ হচ্ছে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, আজকে আমরা শুধু সংসদীয় পদ্ধতি চালু করিনি, এ পদ্ধতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য গণতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার জন্য, সকলকে সমান সুযোগ দেয়ার জন্য, আমরা সম্পদের সমান বন্টন করছি। সে ভাবে আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছি।"[৪৫]

বেগম খালেদা জিয়া আরও বলেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন আমাদের গণতন্ত্র শিখাবেন আমরা তাদের একদলীয় গণতন্ত্র শিখতে চাইনা। বরং শহীদ জিয়াউর রহমানই তাদেরকে বহুদলীয় গণতন্ত্র শিখিয়েছেন, তারা বাকশাল ছেড়ে তাই আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরে এসেছে। ----- আজ বলা হয়েছে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে নাকি জনগণের আহাজারি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমেইতো কেবল জনগণের রায় বা অভিপ্রায় প্রতিফলন ঘটে"। তিনি বলেন, "বি,এন,পি এ নিয়ে দু'বার সরকার চালাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন বিএনপির প্রতি যদি জনগণের আস্থাই না থাকতো তা হলে বিএনপি দ্বিতীয় বার কি করে ক্ষমতায় এসেছে ? তিনি বলেন, বিএনপি হচ্ছে জনগণের দল। জনগণের কাছে বিএনপি যে সব ওয়াদা করেছে তা পর্যায়ক্রমে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে"।[৪৬]

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে উথাপিত অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। বিভক্তি ভোটে প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১২২টি ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ১৬৮টি ভোট। জামাত ভোট দানে বিরত থাকে। "ভোট গ্রহণ কালে জাতীয় পার্টির ৪ জন ইসলামী ঐক্য জোটের ১ জন, এনডিপির ১জন, আওয়ামী লীগের ৫ জন এবং ২ জন স্বতন্ত্র সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আওয়ামী লীগের দু'জন সংসদ সদস্য ইন্তেকাল করায় তাদের আসন শূন্য ছিল। বি,এন,পি'র ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে থাকায় এবং শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার পদে থাকায় ভোট দেননি।"[৪৭] সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকায় বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে বিএনপি সরকারের পতন বা সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যহত হয় নাই। গণতন্ত্র মানেই সংখ্যাগরিষ্টের শাসন। মূলত সরকারকে সতর্ক করার জন্যই বিরোধী দলের এ অনাস্থা প্রস্তাব। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের জন্য আরও কিছু বেশী সময় দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তবুও সরকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব মোকাবেলা করেন যা গণতন্ত্রের ভিতকে শক্তিশালী করেছে। জয় হয়েছে গণতন্ত্রের।

গ) বিরোধী দলের সংসদ বয়কট পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ স্বাদ জনগণ ভোগ করতে পারে নাই। কেননা জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ও সংসদ বয়কটের কারণে সরকারের শেষের দুই বছরে এক দলীয় নিস্প্রাণ সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিনত হয়। সরকার বিরোধী ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে দেশে বিরাজ করে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যা কেবলমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্র নয় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে ছিল ব্যাপক বাধা স্বরূপ। সংসদীয় গণতন্ত্রে সফলতার জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত ছিল। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতির কারণে জনগণের আশা আকাংখা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার ও বিরোধী দলের অনৈক্যের কারণেই বিরোধী দল কর্তৃক ১ বছরের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব আহুত হয়েছিল। সরকারের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকায় অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার পতনের মত কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে অনাস্থা প্রস্তাবের পর সরকার ও বিরোধী দলের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়।

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ থেকে বিরোধী দল হেবরনে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে বিএনপি'র তথ্যমন্ত্রী ব্যরিষ্টার নাজমুল হুদার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াক

Dhaka University Institutional Repository

আউট করে। পরে এই ওয়াকআউট লাগাতার সংসদ বর্জনে পরিনত হয়। মাগুরা উপনির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ এবং মাগুরা-২ আসনের ফলাফল বাতিল ও পুনঃ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট দীর্ঘস্থায়ী বয়কটে রুপ নেয়। মাগুরা নির্বাচনের পর বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি জোড়ালো ভাবে উত্থাপন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বিপক্ষে ব্যাপক যুক্তি উত্থাপিত হয়। বিরোধী দল সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের দাবি জানান। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র কর দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করে। সরকার ও বিরোধী দলের এ সংকট নিরসনের জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংসদ উপনেতা ও স্পীকারের উদ্যোগ ব্যর্থতার পর কমনওয়েলথ মহাসচিবের আগ্রহে কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার ষ্টিফেন নিনিয়ানের মধ্যস্থতায় সংকট নিরসনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু নিনিয়ানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক সংকটের মূখে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সসদ সদস্য 'গণপদত্যাগ' করেন। যার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র গভীর সংকটে নিপতিত হয়। বিরোধী দল সংসদ বয়কট ও গণপদত্যাগের পাশাপাশি দেশে হরতাল এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বিরোধী দলের সংসদ থেকে "গণপদত্যাগ' সংবিধান সম্মত না হওয়ায় পদত্যাগ পত্র সমূহ গ্রহণ করে নাই। তবে বিরোধী দল রাজপথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দারুনভাবে ব্যহত হয়। ইতোমধ্যে সংবিধান অনুযায়ী বিরোধী দলের সংসদ বয়কট একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের সদস্য পদ বাতিল হবে কিনা এ সাংবিধানিক প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টে রেফারেন্সের জন্য পাঠান। সুপ্রীমকোর্ট রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স গ্রহণ করেন এবং আইনজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে শুনানি শেষে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জাবাব দেন। সুপ্রীমকোর্টের উপদেশ মূলক বক্তব্যের (জবাবের) পর স্পীকার সাংবিধানিকভাবে যাদের অনুপস্থিতিতিকাল একাদিক্রমে ৯০ দিন অতিবাহিত হয়েছে তাদের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে জাতীয় সংসদে এক মাত্র সরকারী দল বিএনপি ছাড়া আর কোন দলের প্রতিনিধি ছিল না। বিরোধী দল সংসদ পরিত্যাগ করে রাজপথে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে কুটনৈতিক মহল সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টা চলে, স্পীকারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে বেশ কিছু পত্র বিনিময়ও হয় কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি ঘটে নাই। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। নির্বাচন কমিশন প্রথমে দৈবদুর্বিপাকের কারণে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা আরও ৯০ দিন বর্ধিত করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও সরকারের সময়সীমা শেষ পর্যায়ে চলে আসে। উপনির্বাচনের পরিবর্তে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিরোধী দল সংবিধান বহির্ভূত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড় থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বারবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার অসাংবিধানিক বলে এ দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তবে সরকারী দল সাংবিধানিক কাঠামোয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি ফর্মূলা পেশ করেন। বিরোধী দল ও তাদের ফর্মূলা পেশ করেন। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মতপার্থক্য খুব বেশী না থাকা সত্ত্বেও কোন সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের অনেক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সফল হয় নাই। এদিকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় উপনির্বাচনের আয়োজন করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই অবসান ঘটান। এরপর সরকার একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন কিন্তু বিরোধী দল নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনড় থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পূর্বেই ঘোষণা করে ছিলেন বিরোধী দল সমঝোতায় পৌছলে এবং নির্বাচনে রাজী হলে তিনি নির্বাচনের ১ মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন। রাজনৈতিক সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টার সাথে সাথে সময় দ্রুত অতিবাহিত হতে থাকে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের সকল উদ্যোগ ব্যাহত হলে অবশেষে সরকার ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬। বিরোধী দল এই নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বিরোধী দল কর্তৃক ঘোষিত গণকার্ফুর মধ্যে সরকার কিছু আসন বাকী রেখে বাকী আসনে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। যদিও এই নির্বাচনকে ঘিরে আইন শৃংখলার ব্যাপক অবনতির আশঙ্কায় জনগণের আশা আকাংখা ছিল খুবই কম। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৩মার্চ (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের একমাত্র কাজ সংবিধান সংশোধন এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ইঙ্গিত দান করেন। এ প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের দীর্ঘ দুই বছরের লাগাতার আন্দোলন ও রাজনৈকি কর্মসূচির অবসান ঘটে।

খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ঘটনাবলী নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

বিরোধী দলের সংসদ বয়কট ঃ

সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনের পর ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত সংসদীয় কার্যক্রম মোটামুটি ভালভাবেই চলছিলো ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের ১২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশন সমূহে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে কেবল মাত্র একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের সময়ই সমঝোতা হয়েছিল। অন্যান্য সময় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সমস্ত মতানৈক্য সৃষ্ট হয়েছে তা খুব বেশী দীর্ঘ স্থায়ী হয় নাই। ইতোপূর্বে বিরোধী দল সংসদ থেকে অনেকবার ওয়াক আউট করেছে তবে দীর্ঘ স্থায়ী হয় নাই। অবশ্য সংসদের ৭ম অধিবেশনে সরকারী দল কর্তৃক 'সন্ত্রাস দমন আইন' পাশের প্রতিবাদে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে ছিল এবং সংসদের ৭ম অধিবেশনের বাকী দিন গুলিতে আর সংসদে ফিরে আসে নাই। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে ক্ষমতাসীন বিএনপি দলীয় সংসদ ও তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। বিরোধী দলের এই ওয়াক আউট পরবর্তীতে অর্নিদষ্ট কালের জন্য সংসদ বর্জনে রূপ নেয়। ঐ দিন জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদ আবুল হাসান চেধুরী বৈধতার প্রশ্নে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, "হেব্রনে নামাজরত অবস্থায় গুলি করে ৫২ জন ফিলিস্থিনী মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছ অথচ সরকার কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কথা বলছেনা।"[৪৮] এর উত্তরে সংসদ উপনেতা ডাঃ এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, " সংসদে শোক প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "ফিলিস্তিনীদের বর্বরোচিত হত্যাকান্ড নিয়ে আলোচনায় সরকারী দলের আপত্তি নেই।"[৪৯] কিন্তু সংসদে সংসদীয় পরিবেশের বিঘ্ন ঘটে সরকার দলীয় সদস্য তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার বিরোধী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেয়া একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ব্যারিষ্টা নাজমুল হুদা সংসদে বলেন, ফিলিস্তিনীদের দুঃখে বিরোধী দলের মায়াকান্না দেখে মনে হচ্ছে তারা হঠাৎ খুব বেশী মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন' ।[৫০] ব্যারিষ্টার হুদার এই বক্তব্যে বিরোধী দলের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সকল বিরোধী দলের সদস্যরা এক যোগে দাড়িয়ে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদ জানান। আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, গণতন্ত্রী পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট ও গণফোরামের সংসদ সদস্যগণ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার দাবিতে ওয়াক আউট করেন। ওয়াক আউট শেষে সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেছেন। "ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে ও ধর্মকে কটাক্ষ করে সংসদে বক্তব্য রাখার জন্য তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাকে সংসদে দাড়িয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পূর্ন বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে ঔদ্ধত্য পূর্ণ উক্তির জন্য তাকে সমগ্র জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।" [৫১] একই দিন সংসদ মূলতবীর পর এক প্রেস ব্রিফিং এ সংসদ উপনেতা ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, "তথ্য মন্ত্রী ইতিমধ্যেই হাউজে তাঁর বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন আমি নিজেও দু'বার দাড়িয়ে তার দুঃখ প্রকাশের কথা উল্লেখ করেছি। সেই সঙ্গে আপত্তিকর অংশ কার্যবিবরনী থেকে বাদ দেয়ার কথা ও বলেছি। এবার আপনারা সংসদে আসুন"[৫২] ব্যারিষ্টার নাজমূল হুদার বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরনী থেকে বাদ দেয়া হলেও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, জাতীয় দৈনিক সমূহ ও বিভিন্ন প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সরকারও বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ৬ মার্চ (১৯৯৪) তথ্যমন্ত্রী সংসদে এক বিবৃতিতে বলেন, "আবার ও দুঃখ প্রকাশ করছি, বক্তব্য প্রত্যাহার করেছি"।[৫৩] পক্ষান্তরে বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম সম্মিলিত বিরোধী দলের এক বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিং এ জানিয়ে দেন, সংসদে দাড়িয়ে তথ্যমন্ত্রী নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইলে তারা (বিরোধী দল) অধিবেশনে যোগদান করবেননা। এরপর বিরোধী দল সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশনে আর ফিরে আসে নাই।

মাগুরা উপনির্বাচন ঃ কারচুপির অভিযোগ ঃ

২০ মার্চ (১৯৯৪) জাতীয় সংসদের মাগুরা ২ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে উক্ত আসন শূন্য হয়। ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী জনাব কাজী সলিমুল হক ৭৩ হাজার ২শ ৪৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। নিকটতম প্রার্থী আওয়ামী লীগের শরীফুজ্জামান বাচ্চু পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৬শ ভোট। উক্ত নির্বাচনে মোট ১০২ টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩টি কেন্দ্রে নির্বাচনী সহিংসতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নাই। উক্ত তিনটি কেন্দ্রের মোট ভোটের চেয়ে বিএনপি প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান বেশী হওয়ায় বিএনপি প্রার্থী জনাব কাজী সলিমূল হককে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, প্রহার, অগ্নিসংযোগ ভোট ডাকাতি প্রভৃতি অভিযোগ আনা হয়। নির্বাচনে যেহেতু বিএনপি জয়লাভ করেছে সেহেতু আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দল সমূহ বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন। বিরোধী দল এই নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে। ২১ মার্চ (১৯৯৪) মাগুরায় পূর্ণ দিবস এবং ২৩ মার্চ দেশব্যাপি অর্ধ দিবস হরতাল কর্মসূচি পালন করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২০ মার্চ (১৯৯৪) এক সংবাদ সম্মেলনে ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, ' বিএনপি সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তাই আমরা সরকারের পদত্যাগ দাবি করছি।" তিনি আরও বলেন "বিএনপি'র অধীনে কোন নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না, বিএনপি নিজেরাই তা প্রমাণ করেছে" [৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.১

মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল

মোট ভোট ২০৬৬২৪

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট	শতকরার হার (%)
১	কাজী সলিমুল হক	বিএনপি	৭৩২৪৮	৫০.৬৮
২.	শরিফুজ্জামান বাচ্চু	আওয়ামী লীগ	৩৯৬২৩	২৭.৪২
৩.	নিতাই রায় চৌধুরী	জাতীয় পার্টি	২০৭৯৪	১৪.৩৯
৪.	মোঃ গোলাম আকবর	জামায়াতে ইসলামী	৭৭৩২	৫.৩৫
৫.	মাওঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান	ইসলামী ঐক্যজোট	৩১২২	২.১৬
	মোট প্রদত্ত ভোট		১৪৪৫১৯	(৬৯.৯৪%)

সূত্র ঃ *আজকের কাগজ* ২১শে মার্চ ১৯৯৪ ইং।

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেছেন," মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের ঘোষিত ফল আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি।" [৫৫] জামায়াতে ইসলামী ও মাগুরা-২ আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি করেছে। মাগুরা উপনির্বাচন সম্পর্কে আব্দুল মতিন তাঁর বইয়ে দৈনিক 'সংবাদে' প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন, উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, " মাগুরা উপনির্বাচনটি ছিল প্রায় সব বিরোধীদলের চোখের সামনে প্রধানমন্ত্রী সহ ক্ষমতাসীন বিএনপি'র মন্ত্রী, এম,পি, প্রশাসন, পুলিশবাহিনী সর্বহারা পার্টির সশস্ত্র ক্যাডার, মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের এক যৌথ অভিযান। অভিযানের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া, যার ফলাফল সম্পর্কে বিএনপি ঢাকা থেকে নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছিল। মাগুরা নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা পাল্টে দিয়েছে। রিপোর্টে তিনি আরও উল্লেখ করেন,

প্রথমতঃ একটি নির্বাচিত সরকার, যারা নিজেদের গণতন্ত্রী দল বলে দাবি করে, তারা ১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ যে ভাবে নির্বাচন করেছে, সেভাবে বা তার চেয়েও স্বৈরাচারী জবরদখলী কায়দায় নির্বাচন করে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ এই নির্বাচনে সরকারী প্রশাসন রাজনৈতিক শক্তিকে সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে নির্বাচন কারচুপির একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ঘটিয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ এই প্রথম প্রকাশ্যে এবং সবধরণের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এবং আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সরকার ও ক্ষমতাসীন দল জেল থেকে সাজাপ্রাপ্ত খুনী ও সশস্ত্র ক্যাডারদের বের করে এনে নির্বাচনের কাজে লাগিয়েছেন।

চতুর্থতঃ এই প্রথম সর্বহারা দলের সশস্ত্র ক্যাডারদের সরকারী উদ্যোগে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাদের মাগুরার শ্রীপুর ও মোহাম্মদপুর থানায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ এই প্রথম কোন নির্বাচনী ময়দান থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।" [৫৬]

উল্লেখ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনের পূর্বে মাগুরা থেকে আকস্মিক প্রত্যার্বন করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিচরপতি আব্দুর রউফ বলেছেন, " আমি মাগুরার নির্বাচনের দিন থাকতে গিয়ে দেখলাম সেখানে অনেক মন্ত্রী আছেন, বিরোধী দলের অনেক নেত্রী আছেন, একশোর ওপর এমপি আছেন, আমি আর থাকার প্রয়োজন বোধ করিনি ; তাই চলে এসেছি"[৫৭] প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মাগুরা ত্যাগ প্রসংগে বিএনপি'র পক্ষ থেকে যুগ্ম মহাসচিব ও শ্রম মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূইয়া বার্তা সংস্থা ইউএনবিকে টেলিফোনে বলেন, "প্রধান নির্বাচন কমিশনারের জন্য মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তারা সার্কিট হাউস খালি করে দিয়েছেন। কিন্তু, আওয়ামী লীগ নেত্রী স্থানীয় প্রশাসনকে খবর না দিয়েই সার্কিট হাউজে প্রবেশ করে

Dhaka University Institutional Repository

১ নং কক্ষ দখল করেছেন।" তিনি আরও বলেন, " প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এই সন্ধ্যায় (শনিবার) মাগুরা ত্যাগের এটা একটা কারণ হতে পারে"।[৫৮]

মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পত্রপত্রিকা বিএনপির বিরুদ্ধে যে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন এর জবাবে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার ২১ মার্চ (১৯৯৪) এক বিবৃতিতে বলেন, "বরাবরের মত এবারও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বীগণ কর্তৃক নির্বাচনে কারচুপির সম্ভাবনার কথা বলে পরাজিত হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন এবং পরাজিত হয়ে সেই হুমকি কার্যকর করার প্রয়াস নিয়েছেন। নির্বাচনে বিজয়ী হলে বরাবরের মতই তারা কারচুপি আন্দোলন সব কিছু ভুলে যেতেন। অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে, তাদের অভিযোগ ও আন্দোলনের হুমকি এড়ানোর জন্য বিএনপি কে সকল নির্বাচনে ইচ্ছাকৃতভাবে পরাজয় বরণ করে তাদেরকে জিতিয়ে দিতে হবে। জনাব সালাম তালুকদার আরও বলেন," আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দাবী করেছেন যে, বিএনপির মন্ত্রী এমপিগণ প্রায় ৭০টি কেন্দ্রে কারচুপি ও ভোট ডাকাতি করে তাদের নিশ্চিত বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি আমরা সচেতন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। গত ২০ মার্চের উপনির্বাচনে মাগুরার ১৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি ইউনিয়নে বিএনপি পরাজিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩টিতে জাতীয় পার্টি এবং বাকী ৩টিতে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে। অর্থাৎ তাদের দাবি অনুযায়ী বিএনপি সেখানে কারচুপি করেনি সেখানেও তারা বিজয়ী হতে পারেনি। এমতাবস্থায় গোটা এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নিশ্চিত বিজয়ে সম্ভাবনার দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত ? অন্যদিকে গোটা নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত ১,৪৪,৫১৯ ভোটের মধ্যে বিরোধীদল সমূহ মোট ভোটের ৭১২৭১ ভোট পেয়েছেন এবং বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন ৭৩২৪৮ ভোট অর্থাৎ সরকারী দলও বিরোধী দল প্রায় সমান সংখ্যক ভোট পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের দাবি অনুযায়ী ১০৩ টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৭০টিতে ভোট ডাকাতি হলে এমন ফলাফল কি করে সম্ভব হতে পারে ? পরিশেষে ব্যরিষ্টার তালুকদার বলেন, "এবার মাগুরার উপনির্বাচনের দিন বিরোধী দলীয় নেত্রী সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সকল দলের বিপুল সংখ্যক সংসদ সদস্য ও নেতা কর্মী ও দেশ বিদেশের অসংখ্য সাংবাদিক, অসংখ্য সরকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন ঐ ছোট্ট একটি এলাকায় সকলের উপস্থিতিতে ১০৩টির মধ্যে ৭০ টি ভোট কেন্দ্রে বিএনপি কর্তৃক কারচুপি ও ভোট ডাকাতি সম্ভব কিনা-এটা বিবেচনার ভার আমি জনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছি।"[৫৯] দৈনিক 'ইনকিলাব' এক প্রতিবেদনে মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনের ওপর আমেরিকান দুতাবাস কর্তৃক আয়োজিত পর্যবেক্ষণ দলের অভিমত তুলে ধরেনছেন, উক্ত প্রতিবেদন বলা হয়, " মাগুরা উপনির্বাচন উপলক্ষে আমেরিকান দুতাবাসের গঠিত একটি পর্যবেক্ষক দলের মতে, ঐ উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কারচুপি ও অনিয়মের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।" আমেরিকান দুতাবাসের এক কর্মকর্তার উক্তি দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, " পর্যবেক্ষণ দলের কর্মকর্তারা ২০শে মার্চ অর্থাৎ উপনির্বাচনের দিনে ভোট গ্রহণ কালে শালিখা ও মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন। ঐ কর্মকর্তা জানান, ভোট চলাকালে তিনি শালিখা ও মোহাম্মদপুর থানার ২০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এসব কেন্দ্রের কোথাও কোন কারচুপি হয়েছে বলে তিনি প্রমাণ পাননি। তিনি জানান, যে সব কেন্দ্রে তিনি পরিদর্শন করেছেন, সে সব কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের পোলিং এজেন্টদের সাথে বিস্তারিত কথা বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন কোন অনিয়ম বা কারচুপি হয়েছে কিনা। আওয়ামী লীগের এজেন্টরাও তাকে সেদিন জানান, "ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে এবং কোন কারচুপি বা অনিয়ম কিংবা অন্য কোন সমস্যা হচ্ছে না"। দুতাবাস কর্মকর্তা আরও বলেন, দুপুরের দিকে আওয়ামী লীগের একজন নেতা কয়েকটি কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে তাকে জানান যে, ঐ সব কেন্দ্রে কারচুপি এবং সন্ত্রাস হচ্ছে। ঐ খবরে আমেরিকান ঐ কর্মকর্তা তাৎক্ষনিকভাবে ঐ সব কেন্দ্রে উপস্থিত হন এবং দেখতে পান যে

আওয়ামী লীগের ঐ নেতার অভিযোগ মোটেই সঠিক নয়" । [৬০] উল্লেখ্য যে আমেরিকান দুতাবাসের উক্ত কর্মকর্তার নাম প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি।

মাগুরা- ২ আসনে বিএনপি প্রার্থী জয়লাভ করায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উথাপিত হয়েছে। প্রশ্ন হল বিভিন্ন দলের প্রায় একশতের ও বেশী এমপি ও মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এত ব্যাপক কারচুপি হল কিভাবে ? এই নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর জয়লাভের একটি সুক্ষ কারণ ছিল যা স্থানীয় জনগনের নিকট থেকে জানা যায়, এ সুক্ষ কারণটি হল আঞ্চলিকতা। জাতীয় সংসদের মাগুরা-২ আসনটি ৩টি থানা নিয়ে গঠিত। এর একটি থানা হল শালিখা। বিগত ৪০ বছরে এই শালিখা থেকে কোন এম.পি নির্বাচিত হয়নি। বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমূল হকের বাড়ী এই শালিখা থানায় এবং তিনি উক্ত থানা থেকে একমাত্র ও সরকারী দলের প্রার্থী ছিলেন। ফলে শালিখার জনগণ স্থানীয় উন্নয়নের কথা ভেবে এবং নিজ এলাকায় এমপি রাখার জন্য বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। উল্লেখ্য যে শালিখা থানায় ভোটার সংখ্যা ৭৩ হাজার ৮শত ৭১ জন।

মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছে। একদিকে বিরোধী দল জাতীয় সংসদে তাদের বর্জনকে স্থায়ী রূপ দেয়, দ্বিতীয়ত ইতিপূর্বে উথাপিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিকে জোড়ালোভাবে উথাপন করেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়। বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচন নয়। ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচনে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে হবে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ মার্চ (১৯৯৪) তারিখে সিলেটের বিভিন্ন জন সভায় ঘোষণা করেন, "মাগুরা উপনির্বাচনে ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, এই উপনির্বাচন কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। শেখ হাসিনা অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান" [৬১]

মাগুরা উপনির্বাচন ছিল বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ১৬ তম উপনির্বাচন। এছাড়াও বিএনপি সরকারের অধীনে ইউনিয়ন কাউন্সিল পৌরসভা এবং চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন গুলোর নির্বাচন নিয়ে কোন কারচুপির অভিযোগ উথাপিত হয়নি। কারণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে যথাক্রমে আওয়ামী লীগের জনাব মোহাম্মদ হানিফ ও এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী জয়লাভ করেন। বাকী ২টি সিটি কর্পোরেশনে অর্থাৎ খুলনা রাজশাহীতে জয়লাভ করেন বিএনপি যথাক্রমে শেখ তৈয়বুর রহমান এবং মিজানুর রহমান মিনু। জাতীয় সংসদের ১৬টি নির্বাচনের মধ্যে মাগুরা ব্যতীত মিরপুর (ঢাকা-১১) আসনের নির্বাচনের কারচুপির অভিযোগ উথাপিত হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও হস্তক্ষেপের ফলে সেই বিভ্রান্তির অবসান ঘটে। মিরপুর ঢাকা-১১ আসনের ফলাফল ঘোষণায় বিভ্রান্তি এবং আওয়ামী লীগের কতিপয় অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন উক্ত নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল বাতিল ঘোষণা করে পুনঃরায় ভোট গণনার নির্দেশ দিয়েছিলো। ১৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) নির্বাচন কমিশন ঢাকা-১১ আসনের ফলাফল পুনঃ গণনা প্রসংগে জানান, 'নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ৩৭ অনুচ্ছেদ বলে প্রস্তুত কৃত ও ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্নিত ক্ষমতা বলে ঘোষিত ফলাফল ও তৎসংক্রান্ত আনুসাঙ্গিক যাবতীয় আদেশ নির্দেশ আইনানুগ সম্পন্ন না হওয়ায় ও পুনঃ গণনার জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দেয়া হলো" [৬২] বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ইতিহাসে নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ ছিল প্রথম। ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) মিরপুর উপনির্বাচনের ভোট পুনঃ গণনা করা হয়। ভোট পুনঃ গণনার পূর্বে নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আনীত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী এজেন্ট খ,ম. জাহাঙ্গীর স্বাক্ষরিত নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগ নামায় ভোট কেন্দ্রের বাইরে রাস্তায় ব্যালট পেপার প্রাপ্তি, গণনায় গরমিল, ঢাকা ট্রেজারীতে সীল গালা ব্যতীত ছালার বস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন

অভিযোগ আনা হয় এবং উক্ত আসনে পুনঃ নির্বাচন দাবি করা হয়। নির্বাচন কমিশন অভিযোগ সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার যৌথ স্বাক্ষরিত রায়ে বলেন, "১৯৭২ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৪২ ধারা মোতাবেক ঢাকা ট্রেজারীতে নির্বাচন কমিশন সচিব দেখতে পান সেখানে ব্যালট পেপার যথাযথ আছে এবং কোন ত্রুটি পাওয়া যায়নি। তাই যথাযথভাবে অভিযোগ বাতিল বলে নিষ্পত্তি হলো" [৬৩] এছাড়া ও আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী ছালার বস্তায় ঠিকমত সীল গালা লাগানো ছিলনা বলে লিখিত অভিযোগরে প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে উক্ত অভিযোগ নাকচ করে দেন। রাস্তায় ব্যালট পেপার প্রাপ্তি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের অভিমত হলো, কোন ভোটার যদি ব্যালট পেপার বাক্সে না ঢুকিয়ে বাইরে নিয়ে যায়, তা হলে সে ব্যালটতো বাইরে পাওয়া যেতেও পারে এতে নির্বাচন কমিশনের কিছুই করার নেই। অতএব এ অভিযোগ ও বাতিল হয়ে যায়। এরপর ভোট পুনঃ গণনায় বিএনপি প্রার্থী পান ৮০ হাজার ৬শত ৫১ ভোট, রিটার্নিং অফিসারের ফলাফলে ৮০ হাজার ২ শত ৭৬ ভোট ছিল। আওয়ামী লীগের কামাল আহমেদ মজুমদারের প্রাপ্ত ভোট ৭৭ হাজার ১ শত ২৭ ভোট। ইতোপূর্বে রিটানিং অফিসারের ঘোষিত ফলাফলে ছিল ৭৭ হাজার ৫ শত ৩৫ ভোট। কাজেই এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পুনরায় ভোট গণনায় বি এন পি প্রার্থীর ভোট আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটে।

মাগুরা উপনির্বাচন পর্যন্ত বিএনপি সরকারের অধিনে যে ১৬টি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উক্ত ১৬টি আসনের মধ্যে বিএনপি পেয়ে ছিলো ৭টি আসন এবং বিরোধীদল পেয়ে ছিলো বাকি ৯টি আসন। অর্থাৎ বিরোধী দলই বেশী আসন লাভ করে। বিরোধী দলের ৯টি আসনের মধ্যে ৫টি আওয়ামী লীগ এবং ৪টি আসন লাভ করেছিলো জাতীয় পার্টি। কাজেই

সারণী ঃ ৫-২

মাগুরা উপনির্বাচন পর্যন্ত বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনের পরিসংখ্যান

মোট আসন	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জাতীয় পার্টি
১৬	৭	৫	৪

দেখা যাচ্ছে যে বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে বিরোধী দলই জয়লাভ করার পরও ১টি মাত্র- মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারের মেয়াদ পুর্তির পূর্বেই সরকারের পদত্যাগ দাবি করে এবং বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণে অস্বীকার করে। অবশ্য পরবর্তীতে বিরোধী দল আর কোন উপনির্বাচনে এমনকি জাতীয় নির্বাচনে ও অংশগ্রহন করে নাই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ ঃ

১ মার্চ ১৯৯৪ ইং থেকে বিএনপির তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমূল হুদার একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ নেয় মাগুরায় উপনির্বাচনে সরকারী দলের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগে। মাগুরা উপনির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধীদল সংসদ বয়কটের পাশাপাশি হরতাল ধর্মঘট অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। ৭ এপ্রিল (১৯৯৪) মাগুরা উপনির্বাচনের ফলাফল বাতিল, পুনঃ নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আওয়ামী লীগের ডাকে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন শেষে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেন, 'বিএনপি সরকার গণতন্ত্রের ভাষাকে বুলেটের মাধ্যমে কেড়ে নিতে চায়।" [৬৪] বিরোধী দল ৫ম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশতম অধিবেশন থেকে বয়কট করেন। সংসদের চতুর্দশতম অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে ২০ এপ্রিল (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলের বৈঠকে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদেয়ার মত পরিবেশ তৈরী হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং সংসদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩ মে (১৯৯৪) আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা ও

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় দলের বৈঠকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি না মানা পর্যন্ত সংসদে না যাওয়ার অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ৪ মে '৯৪ জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনের প্রথম দিবসে সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে বলেন, " আন্দোলনের বন্ধুরা আসুন, সংসদেই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি"। তিনি আরও বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ কেন্দ্র জাতীয় সংসদ। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্যা ও রয়েছে অনেক। এসব নিয়ে সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে।"[৬৫] কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবিতে অনড় থেকে চতুর্দশ অধিবেশনের কোন বৈঠকেই যোগ দেয়নি। এমনকি পরবর্তীতে ৫ম জাতীয় সংসদের কোন অধিবেশনেই যোগ দেয়নি। জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনেই ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হয়। বিরোধী দল বাজেট অধিবেশনেও অনুপস্থিত ছিল। বিরোধী দলের বাজেট অধিবেশনে যোগদান না করা প্রসংগে গণযোগাযোগ সম্পর্কিত বেসরকারী সংস্থা সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট (সি এফ এস ডি) জাতীয় সংসদে পেশকৃত ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিতি সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ১১-১২ জুন (১৯৯৪) এক জনমত জরিপ চালায়। জরিপে দেখা যায়, " ঢাকা মহানগরীর শতকরা ৮৬.৫ ভাগ মানুষ মনে করেন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। বাকী শতকরা ১৩.৩ ভাগ মনে করেন। সংসদে অনুপস্থিত থেকে বিরোধী দল সঠিক কাজ করেছেন"[৬৬]। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট সম্পর্কে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ ডঃ কামাল হোসেন বলেন," Prolonged boycott of parliament sessions could by no means help resolve the political crisis facing both part in power and opposition [৬৭] বিরোধী দলকে জাতীয় সংসদে ফিরিয়ে আনতে সরকারি তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আহবান ছাড়াও সংসদ উপনেতা, স্পীকার এবং কুটনৈতিক পর্যায় থেকেও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিরোধী দল শেষ পর্যন্ত পঞ্চম জাতীয় সংসদে আর ফিরে আসেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে তারা সংসদে থেকে পদত্যাগ করেন। এবং রাজপথে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।

সংসদ বয়কটের বিরুদ্ধে রীট ও রায় ঃ

জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলের সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ নিলে জনৈক এডভোকেট আনোয়ার হোসেন খান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রীট দাখিল করেন। ১১ ডিসেম্বর (১৯৯৪) উক্ত রীটের এক রায়ে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের সংসদ বয়কটকে অবৈধ ঘোষণা করে, সংসদের বিরোধী দলিয় নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিষ্টার মওদুদ আহম্মদ এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রতি এক আদেশে হাইকোর্ট বেঞ্চ সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হলে তাতে সকল বিরোধী দলের সাংসদদের যোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন এবং বিচারপতি কাজী এটি মনোয়ার উদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ উক্ত রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ে আরও বলা হয়েছে, " সংসদ বর্জনকালীন সময়ে তারা যে বেতন ভাতা গ্রহণ করেছেন তা অসাংবিধানিক ও অন্যায়। এই বেতন ভাতা উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে উসুল যোগ্য"[৬৮] সংসদ বর্জনকারী দল সমূহের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উক্ত রায়ের কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশের আবেদন জানান হলে আদালত উক্ত আবেদন নাকচ করেন, তবে উচ্চ আদালতে আপীলের অনুমতি দান করেন। বিরোধী দলের তিন নেতার পক্ষ থেকে পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল আবেদন করেন এবং আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এটিএম আফজাল উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সংক্রান্ত মামলার রায়ের কার্যকারিতা ১৫ জানুয়ারী (১৯৯৫) পর্যন্ত স্থগিত

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করেন। কিন্তু বিরোধী দলের সংসদ সদস্য গণ ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) সংসদ থেকে গণ পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে উক্ত মামলাটি অনিষ্পন্ন অবস্থায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম রূপ রেখা ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৩ এর শেষের দিকে বিরোধী দল সমূহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তোলে। মাগুরা উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিএনপি'র বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি জোরালো ভাবে উত্থাপন করা হয়। এবং বিরোধী দল সমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। জাতীয় সংসদ থেকে সংসদ বর্জনরত অবস্থায় জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ২৭ জুন (১৯৯৪) জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রথম বারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে ' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা' ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে বিরোধী দল সমূহের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ২৬ জুনের মধ্যে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল আনার জন্য সরকারকে আলটিমেটাম দিয়ে ছিলো। এবং উক্ত সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল না আনলে বৃহত্তর আন্দোলনের কথাও বলা হয়ে ছিল। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিরোধী দল সমূহের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ রূপ রেখা ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত রূপরেখায় বলা হয়েছে,

"একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধামন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলসমূহের পরামর্শক্রমে একজন নির্দলীয় গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তার কার্য পরিচালনা করবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মন্ত্রী সভা গঠন করবেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধান প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধু মাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।

রূপ রেখায় আর ও বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন যাতে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে তার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করতে হবে।

উপরোক্ত পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে বলে রূপ রেখায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘোষিত রূপ রেখার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, "এ রূপ রেখা বাস্তবায়ন করার জন্য জাতীয় সংসদে সকল বিরোধী দল আজ ঐক্যবদ্ধ। সরকার যেহেতু সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে ব্যর্থ

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন এবং সকল বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে থাকতে বাধ্য করেছেন সেহেতু আজকে এ রূপ রেখা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বৃহত্তর গণআন্দোলন ছাড়া কোন বিকল্প নেই"। [৬৯] বিরোধী দল কর্তৃক উক্ত রূপ রেখা ঘোষণার একদিন পর বিএনপি'র পক্ষ থেকে মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এক প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীদল কর্তৃক ঘোষিত এ রূপ রেখাকে অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করে বলেন, " এ রূপ রেখা নিরপেক্ষ নয়, কারণ বিএনপি'র ১৭৩ জন সংসদের কথা এ রূপ রেখায়, উল্লেখ নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে যে সব বিরোধী দল আন্দোলনরত শুধু মাত্র সে সব দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে এটা নিরপেক্ষ যুক্তি হতে পারে না।"।[৭০] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখার ভিত্তিতে বিরোধীদল সরকারী দলকে সংবিধান সংশোধন করে ভবিষ্যত সকল জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান করার জন্য দাবি জানায়। এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চিহ্নিত হয়ে আছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বিপক্ষে ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন না হলেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিশেষ করে মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তোলা হয় এ ধারণাটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন এবং বাংলাদেশের সংবিধানে অনুপস্থিত।

সাধারণত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে একটি অস্থায়ী সরকারকে বুঝা যার প্রধ্যান দায়িত্ব ও কর্তব্য দেশের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন শাসন কার্য পরিচালনা করা। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে যে কোন নিয়মিত সরকার বা যে কোন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকারও দায়িত্ব পালন করতে পারে। যেমন আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন যে সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে হয়েছে ; তবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল পূর্ব থেকেই ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভারতে কিংবা গণতান্ত্রিক সরকার যেখানে বিদ্যমান সেখানে, যখন কোন সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান বা সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন যে সরকার প্রধান থাকেন তিনি নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। তখন রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধান (ক্ষেত্র মতে) ক্ষমতাসীন সরকার (পদত্যাগী) কেই তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তখন থেকেই সেই সরকার তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এরশাদের দীর্ঘ নয়বছর স্বৈরশাসনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়ে ছিল সেই সরকারকেও 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের সরকারক গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিলো না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদের সরকারকে সাংবিধানিক ও নিয়মিত সরকারই বলা যায়। যদিও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ মনোনীত হয়ে ছিলেন তিন জোটে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কিন্তু তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সাংবিধানিক ভাবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগের ফলে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ সাংবিধানিক সরকার প্রধান হিসেবে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করেন। যদিও তাকে অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদ বর্জনরত বিরোধী দল সমুহ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানান তা সংবিধানে অনুপস্থিত এবং সংবিধান পরিপন্থী

Dhaka University Institutional Repository

বলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই দাবি গ্রহনে অস্বীকৃতি জানান। পক্ষান্তরে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে এর পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক দেখা দেয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী ঘোষিত 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' রূপ রেখা'র ভিত্তিতে যৌথভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করেন। ৮ দলের সমন্বয়ে গঠিত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানালেও আওয়ামী লীগ সহ তিন দলের ঘোষিত রূপ রেখার সাথে তাদের দ্বিমত রয়েছে। বামফ্রন্ট আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের ত্রিদলীয় ঐক্যের পক্ষ থেকে ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখাকে 'অপূর্ণ' বলেছেন। এ সম্পর্কে বাম ফ্রন্টের সুপারিশে বলা হয়েছে, "- এই রূপ রেখা দ্বারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হবে না। তার ওপর সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় অশুভ শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়ার এবং সেভাবে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর অশুভ আতাঁতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এ রূপ রেখায় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে" [৭১] বাম ফ্রন্ট নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সংবিধান সংশোধনের যে প্রস্তাব করেছেন তাহলো সংবিধানের "১২৩ নং ধারা সংযোজন করে সেই ধারায় নিম্নোক্ত ১২৩ (৫) উপ ধারা যুক্ত করতে হবে- 'এই সংবিধানে অন্য যা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি কয়েকজন নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। যার কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজটি সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া ও দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজ চালু রাখা। এরূপ 'উপদেষ্টা পরিষদ' নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করেছে বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচনের পর ৩(ক) এবং ৩(খ) উপ ধারা অনুযায়ী এবং ৫৫(ক) ধারা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এই 'উপদেষ্টা পরিষদ' বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা আগামী ১৫ বছর অথবা আগামী ৩টি জাতীয় নির্বাচনের সময় কালের মধ্যে যেটি আগে অতিক্রান্ত হয় সেই সময়কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। উপদেষ্টাদের কেউই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেনা। এই সংশোধনীর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছাবার জন্যে বিষয়টি সর্বদলীয় বাছাই কমিটিতে প্রথমে আলোচনা হতে পারে। যদি এরূপ বিবেচিত হয় যে, সংশোধনীর জন্যে গণভোটের প্রয়োজন, তারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। "[৭২] এ ছাড়াও বাম ফ্রন্টের উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠিত করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মুক্ত স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ভোটারদের জন্য আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা এবং সকল প্রার্থীর ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক একত্রে প্রকাশ করা, ইত্যাদি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা নিয়ে রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাপ্তাহিক বিচিত্রার ২৩ বর্ষের ১৯ সংখ্যায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বাদশ সংশোধনীর সময় পাঁচদল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখার দাবি তুলেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির বিরোধীতার জন্য তা সংশোধনীতে সন্নিবেশিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি আওয়ামী লীগ শুধু গ্রহণই করে না, জামাতও জাপাকে ঘনিষ্ট সহযোগী করতে তৎপর হয়ে উঠে।"[৭৩] সিপিবি'র নেতা মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম এক সেমিনারে বলেছেন, " তিন জোটের রূপ রেখা প্রণয়নের সময় একাধিকবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের শর্তটি রাখার প্রস্তাবটি শেখ হাসিনাই বাতিল করে দিয়েছিলেন"। জনাব সেলিমের মতে, "তখন আওয়ামী লীগের ধারণা ছিল নির্বাচনে তারাই জয়ী হবে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একবারের বেশী নির্বাচনের দরকার নেই।"[৭৪]

এবার 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, পত্রিকাসমূহের সম্পাদকীয়, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীগণ যে বক্তব্য রাখেন তা তুলে ধরা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বধায়ক সরকারের পক্ষে,

আওয়ামী লীগ নেতা ও পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, "জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা ও সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন।" [৭৫]

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য জোহরা তাজউদ্দিন বলেন, "আজকের ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষাপটে এবং সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারই সুষ্ঠ নির্বাচনের একমাত্র পথ"।[৭৬]

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, বিএনপি'র আমলের সবক'টি উপনির্বাচনে সন্ত্রাস, ভোটচুরি, ভোট ডাকাতি, প্রশাসনকে প্রভাবিত করার মতো কর্মকান্ডই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে"। [৭৭]

আজকের কাগজ ২৯ এপ্রিল (১৯৯৪) সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, নির্বাচনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং জনগণের পবিত্র আমানত ভোটাধিকার প্রয়োগে অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ রহিত করার জন্য সর্বোপরি রাজনৈতিক দলসমূহ প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সহিষ্ণুতা অর্জন করা না পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান সাংবিধানিক ভাবে বিধি বদ্ধ করাটাই যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হোক এই আমাদের প্রত্যাশা"। [৭৮]

কলামিষ্ট ফকির ইলিয়াস এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ, জনগণ যদি সুষ্ঠভাবে তাদের ভোটই দিতে না পারে, তা হলে তারা জেনেশুনে গণতন্ত্রের স্বপক্ষের শক্তিকে রায় দেবে কি ভাবে ? আর তা এক মাত্র নিশ্চিত করতে পারেন একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার।" [৭৯]

তত্ত্বধায়ক সরকারের বিপক্ষে,

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে অনেক বক্তব্য এবং মন্তব্য করলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিপক্ষে ও অনেকে মন্তব্য করেছেন। বিএনপি সরকারের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেন, " তত্ত্বধায়ক সরকার একটি দুর্বল, অনির্বাচিত ও অস্থায়ী সরকার এ ধরণের ব্যবস্থায় ভোট কারচুপি সুবিধা হবে বলেই বিরোধী দল এ দাবি করছে। বিরোধী দলের তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবি যৌক্তিক এবং গ্রহণ যোগ্য নয়, কেননা জনগণের নির্বাচিত বিএনপি সরকার সুষ্ঠ, অবাধ, নির্বাচনের গ্যারান্টি দিতে পারে।"[৮০]

বিএনপি দলীয় সংসদ ও পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া বলেন, "৯০তে বাংলাদেশে এবং সম্প্রতি পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে জন্য সংসদে সম্মিলিতভাবে বিল আনতে হবে। যা নীতিগতভাবে সম্ভব নয়। Extra constitutional বা সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে বলে তিনি দাবি করেন "। [৮১]

বিএনপি'র মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার আজকের কাগজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, " তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই ভোট অবাধ, সুষ্ঠ হবে সে গ্যারান্টি কে দেবে ? কারণ '৯১ এর নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলীয় নেত্রী অভিযোগ করেছিলেন সুক্ষ্ম কারচুপি'র। তিনি আরও বলেন, "নির্বাচিত সরকারের বদলে আমরা একটা নন-ইলেকটেড সরকারের অধীনে নির্বাচনে কেন যাবো ? তার চেয়ে আমরা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরো অবাধ সুষ্ঠতার গ্যারান্টির জন্য ইলেকশন কমিশনকেই শক্তিশালী করার ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি।" [৮২] প্রধান নির্বাচন কমিশনারও নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা বলেছেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, "বর্তমান পদ্ধতিতে অবাধ ও নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করে কিছু হবে না যদি নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন না হয়।"৮৩

গণফোরামের এক সমাবেশ গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন, "কেবল মাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, সংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি দৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। সমাবেশের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, " অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনের জন্য পৃথক ও স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা, নির্বাচন অপরাধের জন্য গুরুতর শাস্তি ও অপরাধীকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতিতে কতিপয় প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোটারদের নিবন্ধীকরণও পরিচয় পত্র দান। নির্বাচনী ব্যয়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ করা, ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। গণমাধ্যম ও যড়যন্ত্রকে নিরপেক্ষ করা, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা।"৮৪

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকার অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, " The opposition may be wrony in thinking that caretaker Government is the only answer to elections being rigged massively than it behaves the ruling party to suggest an alternative which will make sense". He maintained further that "more talk of perfecting election rules when the EC is powerless to implement the rules, is idle talk" [85]

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাসস'র সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, " তত্ত্বাবধায়ক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প হতে পারে না। '৯০ তে নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হয়েছিল একটি স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য। ------------ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরও উন্নতি সাধনসহ সকল জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং সমাধান সংসদেই হতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে নিয়োগ করেছে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সে থেকে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে। -------- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কখনই নির্বাচন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করেনি। গত তিন বছরে সারা দেশে ৪ হাজার ইউনিয়ন পরিষদ, ১শ মিউনিসিপ্যাল, ১৬টি জাতীয় সংসদের শূন্য আসনে উপনির্বাচন ও ৪ টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবগুলো নির্বাচন অবাধও নিরপেক্ষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ----- নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও উন্নত করতে যে কোন যুক্তি, পরামর্শ, সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে"। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে দেশব্যাপী ভোটারদের জন্য পরিচয়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে নেয়া হয়েছে। এতে ভোটারদের ভোট প্রদান নিশ্চিত ও পাশাপাশি নির্বাচন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন হবে" ৮৬ এছাড়াও তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনীর ব্যাপারে সরকার চিন্তাভাবনা করছে বলে জানান।

অতএব, উল্লেখিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে একদিকে সরকার এবং অন্যদিকে বিরোধী দল সমূহ অবস্থান করছে। এবং উভয়ের মনোভাব বিপরীত মুখী। আর এই বিপরীত মুখী মনোভাবের ফলে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি এক গভীর সংকটে উপনীত। এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ সমঝোতা এবং সাংবিধনিক গ্যারান্টি।

রাজনৈতিক সংকট ঃ সমাধানের উদ্যোগ ঃ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারে'র অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকট নিরসনে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যদিও এই সমস্ত উদ্যোগ কোনটাই ফলপ্রসু কিংবা রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে

নাই, তবুও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সমস্ত উদ্যোগের অবদান কোন অংশেই কম নয়।

ক) সংসদে উপনেতার নেতৃত্বে উদ্যোগ ঃ

১৯৯৪ সালের আগষ্টের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকট নিরসনে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ছিলেন। সংসদ উপনেতা অধ্যাপক ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন, বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এবং চীফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন।

এই কমিটির মাধ্যমে ২৪ আগষ্ট (১৯৯৪) সরকারি দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়া হয়। ২৯ আগষ্ট (১৯৯৪) সংসদ উপ-নেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী টেলিফোনে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদকে জানান যে, সরকারি দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে নীতিগতভাবে আলোচনায় রাজি আছে। ৩১ আগষ্ট (১৯৯৪) রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বি, চৌধুরী এবং বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দেড় ঘন্টা ব্যাপী বৈঠক হয়। উভয় নেতাই আলোচনা সন্তোষ জনক বলে দাবি করেন। কিন্তু এ দু'উপনেতার মধ্যে আর কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) সংসদ উপনেতা সংসদের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য বিরোধী দলীয় উপনেতাকে একটি চিঠি দেন বিরোধী দলীয় উপনেতা ১৬ সেপ্টেম্বর সেই চিঠির জবাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সুস্পষ্ট এজেন্ডা নিয়ে বিরোধী দল যে কোন সময় যে কোন স্থানে সরকারি দলের সঙ্গে বসতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান। এরপর কমনওয়েলথ মহাসচিবের উদ্যোগ গ্রহণের পর ৪ অক্টোবর (১৯৯৪) এক পত্রের মাধ্যমে সংসদ উপনেতা বিরোধী দলীয় উপনেতাকে সংলাপের সময় তারিখ ও স্থানের বিষয়ে নাম আহবান করেন। কিন্তু উপনেতা পর্যায়ে আর কোন আলোচনা না হওয়ায় সংসদ উপনেতার নেতৃত্বে সংকট নিরসনের এ পর্যায়ের উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

খ) কমনওয়েলথ মহাসচিবের উদ্যোগ ঃ-

১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা এনিয়াওকু প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে বর্তমান প্রশাসনের অধীনে বাংলাদেশে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ মহাসচিব তিন দফা প্রস্তাব সুপারিশ করেছেন। তাঁর সুপারিশ গুলো হচ্ছে ঃ

১. নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করা

২. সকল রাজনৈতিক দলের জন্য একটি নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রনয়ন করা ;

৩. ভবিষ্যত নির্বাচন পর্যবেক্ষনে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দলকে অনুমতি দান।

২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কমনওয়েলথ মহাসচিবের মধ্যস্থতায় রাজনৈতিক সংকট নিয়ে সংলাপে দুই নেত্রীর আনুষ্ঠানিক সম্মতির কথা ঘোষনা করা হয়। এই আনুষ্ঠানিক আলোচনায় সহায়তার জন্য মহাসচিবের একজন প্রতিনিধিকেও ঢাকায় পাঠানো হবে বলে ঘোষণায় বলা হয়। ২ অক্টোবর(১৯৯৪) আওয়ামী লীগ প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলথ মহাসচিবকে এক ফ্যাক্স বার্তায় জানান, " আওয়ামী লীগ সংলাপে যেতে প্রস্তুত কিন্তু সরকার পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্তরিক নয়"[৮৭] এর পর ৪ অক্টোবরে সংসদ উপনেতা বি. চৌধুরী কমনওয়েলথ মহাসচিবের তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংলাপের আহবান জানিয়ে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ৫ অক্টোবর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ মহসচিব বাংলাদেশের রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংকট নিরসনের লক্ষ্যে মধ্যস্থতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্ণর জেনারেল স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনকে কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন। ঘোষণায় আরও বলা হয় তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করবেন স্যার নিনিয়ান স্টিফেন।

গ) স্যার নিনিয়ানের মধ্যস্থতায় সংলাপ ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে কমনওয়েলথ মহাসচিবের মনোনীত বিশেষ দুত (প্রতিনিধি) স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেন ১৩ অক্টোবর (১৯৯৪) ঢাকায় আসেন। এদিকে একই দিন কমনওয়েলথ মহাসচিবের অগ্রবর্তী দুই কর্মকর্তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন। উক্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে 'দুস্তর ব্যবধান রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়াও দল দু'টির পারস্পরিক অবিশ্বাসকে সংকট সমাধানের প্রধান অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ১৪ অক্টোবর বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে ১৩ জন বিরোধী দলীয় নেতা কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ১৫ অক্টোবর সংসদ উপনেতা ডাঃ এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীরর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বিএনপি'র প্রতিনিধি দল স্যার নিনিয়ানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত বৈঠকে সরকারি দলের নেতারা বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে স্যার ষ্টিফেনকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নয় বরং গণতান্ত্রিক সরকারকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্যই এ দাবি করা হচ্ছে।

নিনিয়ানের মধ্যস্থতায় সংলাপ শুরু ঃ

বহু প্রতীক্ষিত সংলাপ ২০ অক্টোবর (১৯৯৪) সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশে শুরু হয়। সংলাপের প্রথম দিনে বিএনপির পক্ষ থেকে ১৪ জন এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে সরকারী দলের নেতৃত্ব দেন সংসদ নেতা ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ। সংলাপে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নয় বরং নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার মধ্যেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়"। আলোচনার টেবিলে সরকারি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন শক্তিশালী করণ সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাবিত বিল উত্থাপণ করা হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী দল গুলোর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তোলা হয় এবং বৈঠকে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা'- উত্থাপন করেন। স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টায় প্রথম পর্বে ৫দিন সংলাপ চলার পর সংলাপে অচলবস্থা দেখা দেয় এবং সংলাপ ভেঙ্গে যায়। সংলাপ ভেঙ্গে যাওয়ায় সরকারি এবং বিরোধী দল একে অপরকে দায়ী করেন। বিরোধী দলের চীফ হুইপ মোহাম্মদ নাসিম এক বিবৃতিতে বলেন, "গত ৫ দিন ধরে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে বিরোধী দল সুস্পষ্ট ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে। কিন্তু সরকারের এক গুয়েমি এবং অযৌক্তিক মনোভাবের কারণে সংলাপ ভেঙ্গে গেছে।[৮৮] পক্ষান্তরে সরকারী দলের চীপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন, "তাঁদের জন্যই সংলাপ ভেঙ্গে গেছে তাঁদের অনঢ় মনোভাবই এর জন্য দায়ি। আমাদের কথা ছিল স্বল্প পরিসরে আরো আলোচনা হবে। কিন্তু তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নেয়া হলে সংলাপ করবেনা বলে জানিয়ে দিয়ে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই সংলাপ ভেঙ্গে গেছে বলে মন্তব্য করেন।" তিনি আরও বলেন আমরা মনে করি এখনও সংবিধান সম্মতভাবে সমাধান সম্ভব। কিন্তু আমরা এখন বিরোধী দলের

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব যা বুঝেছি তাতে তারা এই সংকটের সমাধান চায়না " নির্বাচিত সরকার উৎখাত না করে তারা কেননা কিছুই মেনে নেবে না এই প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য নয় তারা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লোক দেখানোর জন্য সংলাপে বসে ছিলো এবং এক তরফাভাবে সংলাপ ভেঙ্গে দিয়েছে"।[৮৯]

প্রথম দফা সংলাপ ভেঙ্গে যাওয়ার পরও স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ২৭ অক্টোবর (১৯৯৪) স্যার নিনিয়ান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় দুই উপনেতার সাথে বৈঠকে মিলিত হন। প্রথম দিন চার ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা চলার পর ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মূলতবী হয়ে যায়। ২৯ অক্টোবর মুলতবী সভা পুনরায় শুরু হলে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনসহ কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্তৃত্ব প্রদানের কথা বলা হয়। কমনওয়েলথ সহ বিদেশী শক্তিশালী পর্যবেক্ষন টীম, পুলিশ, প্রশাসন এবং মিডিয়াকে নির্বাচন তদারকিতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য একটি আচরণ বিধি প্রনয়ন যা সরকার এবং বিরোধী দল মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, ইত্যাদি রয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান পরিপন্থী বলে মন্তব্য করে। প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বাদে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্বাচনের পূর্বে পদত্যাগের বিধান করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। বিরোধী দল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এ জন্য যে, এই প্রস্তাব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প হতে পারে না। বিরোধী দল অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে বহাল রেখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। এই অচলবস্থার মধ্যে কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান ৩১ অক্টোবর (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করেন যাতে সংলাপের স্বার্থে তখনই আন্দোলনের চুড়ান্ত কর্মসূচি না দেন। অন্য দিকে ১ নভেম্বর (১৯৯৪) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা মানিক মিয়া এভিন্যুর জন সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেন সরকার জাতীয় সংসদে তত্ত্বধায়ক সরকার বিল না আনলে বিরোধী দল পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টায় যখন সংকট সমাধানের উপায় খোঁজা হচ্ছে তখন বিএনপি দলীয় সংসদ এবং তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপ রেখা ঘোষণা করেন। যা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে সরকার দলীয় মনোভাবের পরিপন্থী যার ফলে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা মন্ত্রী সভা থেকে অপসারিত হন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে নাজমুল হুদার প্রস্তাবটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হওয়ার কারণে প্রস্তাবটি এখানে তুলে ধরা হল ঃ

নাজমূল হুদার প্রস্তাব ঃ ৪ নভেম্বর (১৯৯৪) দৈনিক ইনকিলাবের সাথে এক সাক্ষাতকারে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে তার রূপ রেখা তুলে ধরেন। নাজমুল হুদার প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ ঃ [৯০]

১. "বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার তাঁর পূর্ণ মেয়াদ পালন করবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পদত্যাগের কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ জনগণের আস্থা এখন ও খালেদা জিয়ার উপর ;

২. মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদ ভেঙ্গে যাবে এবং দেশের শাসনভার সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশনের উপর ন্যাস্ত হবে। প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ও অন্য চার জন বিচারপতি কেবিনেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দান করবেন এবং নব নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ হবে অনধিক ৯০ দিনের । সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার তারিখ থেকে ৪০ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে যে কোন একটি দিনে কিংবা পর্যায়ক্রমে কয়েকটি দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।
৫. নবনিযুক্ত পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই প্রধান বিচারপতির অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং এপিলেট ডিভিশন তার স্বীয় দায়িত্বে পরিপূর্ণভাবে ফিরে যাবে।
৬. অন্তবর্তকালীন সরকারের দায়িত্ব এপিলেট ডিভিশনের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।
৭. সকল দল মিলে সংবিধান সংশোধন করে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব ও তিনি করেন।"

এই প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার একদিন পর ৫ নভেম্বর ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা আজকের কাগজে তাঁর রূপ রেখা সম্পর্কে বলেন, " আমার প্রস্তাব তত্ত্বধায়ক সরকারের কোনো প্রস্তাব না, একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে একটি নির্বাচিত সরকার পূর্ণ পাঁচ বছর মেয়াদে ক্ষমতায় থাকবে। নতুন সরকার না আসা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হবে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের নেতৃত্বে। পাঁচ বছর মেয়াদান্তে আপনাআপনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে"।[১১]

তথ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে বিরোধীদল ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। সংলাপের মধ্যস্থতাকারী কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান এবং কূটনৈতিকগণ তথ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বিএনপি'র মনোভাব জানতে চেয়েছেন। ৮ নভেম্বর (১৯৯৪) রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, সরকারের এ প্রস্তাবে বলা হয়, " নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বর্তমান মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেবেন এবং সংসদের রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন করবেন। এই জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তিনি ছাড়া আরো চারজন সদস্য থাকবেন সরকারী দল থেকে। বিরোধী দলের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল থেকে থাকবেন ৪ জন সদস্য অন্যান্য বিরোধী দল থেকে থাকবেন ১ জন সদস্য ; তারা নির্বাচন করবেন কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে পরবর্তী পর্যায়ে।" [১২] কিন্তু বিরোধী দল এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে সরকারী দল থেকে স্যার নিনিয়ানকে জানানো হয় যে, এটাই হচ্ছে তাদের সর্বশেষ প্রস্তাব, এর থেকে আরবেশী ছাড় দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৯ নভেম্বর (১৯৯৪) বিএনপি'র সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন, "সংবিধানের বাইরে কোন কিছু বিএনপি মেনে নেবে না, করবে না। বিএনপি ক্ষমতা হারাতে পারে কিন্তু তার নীতি ও আদর্শচ্যুত হবে না।" [১৩] ইতোমধ্যে সংকট নিরসনে নিনিয়ানের পাশাপাশি দাতাদেশ ও সংস্থা গুলোর কূটনীতিকগণ ও জোর প্রচেষ্টা চালান। কূটনীতিকগণ ও একটি প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। ১৩ নভেম্বর (১৯৯৪) দেশের দৈনিক পত্র পত্রিকায় সরকারী দল, বিরোধী দল ও কূটনৈতিকদের পক্ষ থেকে ৩টি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। প্রস্তাব গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ [১৪]

সরকারী দলের প্রস্তাব ঃ

সরকারী দলের এই প্রস্তাবটি ইতোপূর্বেকার দেয়া প্রস্তাবের সংশোধিত রূপ। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ

১. নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বর্তমান মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেবেন এবং ক্ষুদ্র ১০ সদস্যের একটি মন্ত্রী সভা গঠন করবেন তাঁর নেতৃত্বে।
২. মন্ত্রী সভায় উভয় পক্ষের ৪ জন করে মন্ত্রী থাকবেন, একজন অনির্বাচিত, নির্দলীয় মন্ত্রী হবেন, যিনি সকলের গ্রহণ যোগ্য হবেন। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী এক দশমাংশ অনির্বাচিত মন্ত্রীর হাতে, স্বরাষ্ট সংস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবে। মন্ত্রী সভার বিন্যাস হবে প্রধানমন্ত্রী সরকারী দলের ৪জন, বিরোধী দলের ৪ জন এবং একজন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রধানমন্ত্রীর হাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবেনা।
৪. নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার সময় এই মন্ত্রী সভা নীতি নির্ধারনী কোন কাজ করতে পারবে না। তাদের কাজ হবে শুধু রুটিন ওয়ার্ক।
৫. নির্দলীয় নিরপেক্ষ মন্ত্রী ছাড়া অন্যমন্ত্রীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী প্রচারনায় তাঁরা অংশ নিতে পারবেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী সর্বত্র নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।
৬. নির্বাচন কমিশন এবং আচরণ বিধিকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

বিরোধী দলের প্রস্তাব ঃ

১. বর্তমান রাষ্টপ্রপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকর গঠিত হবে।
২. সংবিধানের ১৪১ (ক) ও ১৪১ (খ) জরুরি আইন বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জরুরি আইন জারি করে সংবিধান সংশোধন না করেও এ ধরণের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পারেন। কিন্তু সাংবিধানিক গ্যারান্টির জন্য এ ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।
৩. এই উপদেষ্টা মন্ডলী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনো ভাবেই যুক্ত হবেন না।
৪. অন্যান্য বিষয় গুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখার ঘোষিত।

কুটনীতিকদের প্রস্তাব ঃ

১. নির্বাচনী তফসীল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন এবং মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেবেন। সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের অন্যকোন আস্থা-ভাজন সাংসদ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হবেন।
২. উভয় পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবেন। বাকী প্রস্তাব গুলো সরকারী প্রস্তাবের ৪ থেকে ৬ এর অনুরূপ হবে।

রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় হিসেবে এই তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল সরকারী দল প্রধানমন্ত্রীকে বহাল রেখে (নির্বাহী কর্তৃত্ব বিহীন) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে চায়। বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় উপদেষ্টার সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে চায়। এবং কুটনীতিকদের প্রস্তাবে প্রধামন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির বদলে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের অন্য যে কোন গ্রহণ যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার কথা বলা হয়। এর থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার এবং বিরোধী দলের পার্থক্য খুব বেশী নয়। এই তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে সংকট সমাধানের উপযুক্ত সময় ছিলো। যে কোন একটি পক্ষ তার অবস্থান থেকে সরে গিয়ে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারতো। এরপরও সমঝোতা মূলক ফর্মূলার জন্য নিনিয়ানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। স্যার নিনিয়ান দু'নেত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। কুটনৈতিকরা সরকার আরও গ্রহণ যোগ্য প্রস্তাব দেয়ার অনুরোধ করে। পক্ষান্তরে স্যার নিনিয়ান সরকারি দলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিরোধী দলের জবারের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু বিরোধী দল হঠাৎ করে তাঁদের অবস্থান থেকে সরে দাড়ায়। ১৭ নভেম্বর (১৯৯৪) সন্ধায় বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ রাজনৈতিক সংকটের মধ্যস্থতাকারী স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনের কাছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে তাঁদের নতুন প্রস্তাব হস্তান্তর করেন। বিরোধী দলের এই প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ [৮৫]

"প্রধান বিচারপতি অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি অথবা গ্রহণযোগ্য কোন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে ১১ সদস্যের নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রী সভার অন্য ১০ জন সদস্যের ৫ জন হবেন সংসদ নেত্রী এবং প্রধান মন্ত্রী মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং ৫ জন হবেন বিরোধী দলের নেত্রী কর্তৃক মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি। এই মন্ত্রী সভার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১২০ দিন। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করা ছাড়া কোনো মৌলিক নীতি নির্ধারণী কাজ এই মন্ত্রীসভা গ্রহণ করতে পারবে না। নতুন নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তিন মেয়াদের জন্য এই বিধান করা হবে। এ জন্য সংবিধানের ১৩ তম সংশোধনী আনতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন সদস্য কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেনা।"

বিরোধী দলের ইতোপূর্বেকার প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেত- কিন্তু এই প্রস্তাবের ফলে দু'পক্ষের ব্যবধান আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও একই দিন সরকারি দল কূটনৈতিকদের আহবানে সাড়া দিয়ে তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন আনেন।

সরকারি দলের পরিবর্তিত প্রস্তাবটি হলো ঃ [৯৬]

১. প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা থাকবেনা। তিনি হবেন নাম মাত্র প্রধানমন্ত্রী।
২. সরকারি এবং বিরোধী দলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীদের (প্রধানমন্ত্রী সহ) হাতে কোন দফতর থাকবেনা, তারা হবেন দফতর বিহীন মন্ত্রী। একজন টেকনোক্র্যাট অদলীয় মন্ত্রী থাকবেন যার হাতে স্বরাষ্ট্র, তথ্য, সংস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবে।
৩. প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য মন্ত্রীরা নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী প্রটোকল ছাড়া সর্বত্র নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিতে পারবেন।
৪. স্পীকারের নেতৃত্বে উভয় পক্ষ থেকে ৫ জন করে সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করণ এবং রাজনৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠিত হবে।"

বিরোধী দলের সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা ঘোষণার ১দিন পর ১৮ নভেম্বর (১৯৯৪) চলমান ব্যাপক রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় খুজে বের করার জন্য ব্রিটিশ হাই কমিশনার, কানাডার হাই কমিশনার এবং মার্কিন রাষ্ট্রদুত বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে দেখা করেন। কূটনৈতিক বৃন্দ বিরোধী দলীয় নেত্রীকে তাঁর অবস্থান থেকে আর একটু সরে আসা যায় কিনা জিজ্ঞেস করলে বিরোধী দলীয় নেত্রী তাঁদের জানান, তিনি (বিরোধী দলীয় নেত্রী) ক্ষমতার ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করেন না, তবে বিষয়টি যেহেতু রাজনৈতিক সে ক্ষেত্রে একমাত্র সাংবিধানিক গ্যারান্টির মাধ্যমেই এর নিষ্পত্তি হওয়া উচিত বলে তিনি ব্যক্ত করেন। পরে কূটনৈতিক বৃন্দ সংকট সমাধানের মধ্যস্থতাকারী - স্যার নিনিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে নিনিয়ানের মাধ্যমে সমঝোতার লক্ষ্যে তৃতীয় প্রস্তাব দেয়ার সম্ভাব্যতা নিয়ে মত বিনিময় করেন।

নিনিয়ানের সংলাপ প্রচেষ্টা ব্যর্থ ঃ

২০ নভেম্বর (১৯৯৪) কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের মধ্যস্থতাকারী অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্ণর জেনারেল স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংলাপ প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কথা জানান। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে তিনি হতাশা ব্যক্ত করে সংলাপের সাফল্য না আসলেও রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। স্যার নিনিয়ান রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আরও বলেন, "সংশ্লিষ্ট সবার সাথে বহু আলাপ আলোচনার পর আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম। আমার বিশ্বাস, এ প্রস্তাবে একমত হয়ে সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাতে উভয় পক্ষের উদ্বেগের নিরসন হত ; এতে চলতি অচলবস্থা সমাধানের পথ সুগম হত"। তিনি আরও বলেন আমার বলতে আনন্দ হচ্ছে, এক পক্ষ অর্থাৎ সরকার পক্ষ আমার প্রস্তাব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন"।[৯৭] স্যার নিনিয়ানের এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তাঁর ৩৯ দিন অবস্থান কালে সংকট নিরসনের যে প্রচেষ্টা চালান তার অবসান ঘটে। নিনিয়ানের এ সংকট নিরসনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঘন অন্ধকার নেমে আসে। বিরোধী দল হরতাল অবরোধ ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে দাবি আদায়ে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্যার নিনিয়ানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এ ধারণা জন্মে যে বাংলাদেশের এ সমস্যা সমাধানে রাজনীতিবিদরা এবং রাজনৈতিক দল সমূহ আন্তরিক নয়। নিনিয়ান তাঁর সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়ে ছিলেন যে, "রাজনৈতিক সংকটের সমাধান এখনও সম্ভব"। তিনি সরকার এবং বিরোধী দলের বাইরে যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন সে প্রস্তাব সরকারী দল ইতিবাচক সাড়া দিলেও বিরোধী দল ইতিবাচক সাড়া দেয় নাই। বিরোধী দল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কেবল মাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং প্রভাব মুক্ত হলে ও সরকার আন্তরিক হলে যে কোন দলীয় সরকারের অধীনেও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। যার প্রমাণ বিএনপি সরকারের অধীনে ৪টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও মাগুরা বাদে জাতীয় সংসদের বাকি ১৫টি উপনির্বাচন। এই ১৫টি উপনির্বাচনে সরকারি দল লাভ করে ৬টি আসন, পক্ষান্তরে বিরোধী দল ৯টি আসন লাভ করে। সেখানে কমনওয়েলথ বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান সংকট নিরসনের জন্য নির্বাহী কর্তৃত্ব বিহীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেত্রীত্বে যে সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব করেছিলেন তার মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চয়ই নিশ্চিত করা যেত। তার ওপর সকল রাজনেতিক দল মিলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করণের মাধমে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটারদের আইডি কার্ড প্রদান, কঠোর রাজনৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করলে নিরপেক্ষ নির্বাচন অবশ্যই আশা করা যায়। তাই বলা যায় বাংলাদেশের এ সংকট কেবল বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা। এ প্রসঙ্গে আহমেদ নূরে আলম সাপ্তাহিক বিচিত্রায় এক নিবন্ধে লিখেছেন " তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি আসলে মূখ্য নয় - প্রধান হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া। তাদের প্রধান টার্গেট খালেদা জিয়া। বেগম জিয়াকে তাঁরা ক্ষমতায় দেখতে চান না। ক্ষমতায় বেগম জিয়া ছাড়া বিএনপি'র যে কোন ব্যক্তিকে তারা মেনে নেবেন। ফলে সংলাপ প্রক্রিয়ার বিরোধীদের বক্তব্যে স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। তখন বিরোধী নেত্রীও স্ববিরোধী বক্তব্য রেখেছেন এবং এখনও রাখছেন। বিরোধী নেত্রী একবার বলেছেন " তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবাই হবেন নির্দলীয়" আবার বলেছেন, সরকার প্রধান প্রশ্নে সংলাপ কার্যকর হয়নি"। এর সহজ অর্থ এটা যে, অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বেগম জিয়া না হলে সংলাপ কার্যকর হত"।[৯৮] সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্তরিক হলে সংকট নিরসন কাল বিলম্ব হতো না। আহমেদ নূরে আলমের উক্ত নিবন্ধে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রসংগে বিএনপি'র মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদারের একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তিনি বলেন, "সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে বিএনপি সর্বদলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। বিরোধীদের প্রস্তাবিত সরকারে কোন জবাবদিহিতা থাকবেনা। বিএনপি'র প্রস্তাবিত সরকারে জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন বলে এর জবাবদিহিতা থাকবে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাবের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে বিরোধী দল নিজেদের প্রতি নিজেরাই অনাস্থা দিচ্ছে", তিনি আরও বলেন, " ক্ষমতাসীন দল হয়েও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমরা নির্বাচনে পরাজিত দলকে সমান অংশীদারিত্ব দিতে সম্মত হয়েছি এই কারণে যে, আমরা ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চাইনা। আমরা দেশ বিদেশের নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের যেমন স্বাগত জানিয়েছি তেমনি মন্ত্রী সভার সদস্য হয়ে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ সমান সুযোগ ও অধিকার নিয়ে নির্বাচনী তৎপরতা পরিচালনা ও তদারকীতে অংশ নিন। এটাও চেয়েছি । আমাদের প্রস্তাবিত সরকার, দলীয় সরকার থাকছে না বলে নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠানের ওপর মন্ত্রী সভার কারোরই প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নেই। ফলে নির্বাচনে কারচুপির সম্ভাবনা ও দুর হচ্ছে"[৯৯] সুতরাং অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন যেখানে সকলের প্রত্যাশা, সেই প্রত্যাশা পূরন যেহেতু সর্বদলীয় সরকারের মাধ্যমে সম্ভব, সেহেতু বিএনপি এবং স্যার নিনিয়ানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংকট সমাধান হতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

কমনওয়েলথ মহাসচিবের পুনঃ উদ্যোগ ঃ

স্যার নিনিয়ানের সংলাপ প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর কমনওয়েলথ মহাসচিব এমেকা এনিয়াওকু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে পুনঃ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২৫ নভেম্বর (১৯৯৪) মহাসচিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফ্যাক্স বার্তা পাঠান। এই ফ্যাক্স বার্তায় এমেকা নতুন করে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব করেছেন। এমেকা ফ্যাক্স বার্তায় উল্লেখ করেছেন যে, " বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট একমাত্র আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই নিরসন হওয়া উচিত। সংঘাত এবং সহিংসতা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বিপন্ন করবে" [১০০] এ দিকে ৬ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে না নিলে ২৮ ডিসেম্বর বিরোধীদল সমূহ এক যোগে পদত্যাগ করবে। একই সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রী ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘেরাও, পদযাত্রা, রাজপথ রেলপথ, নৌপথ অবরোধ সহ ২৮ ডিসেম্বর ঢাকায় মহা সম্মেলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বিরোধী দল পদত্যাগের আলটিমেটাম দেয়ায় কমন ওয়েলথ মহাসচিব উদ্বেগ প্রকাশ করে ১৭ ডিসেম্বর এমেকা এনিয়াওকু বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশ সমূহের বাংলাদেশ দুতাবাস সমূহের কাছে এক ফ্যাক্স বার্তা পাঠান। মহাসচিব উক্ত বার্তায় বলেন, " বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে দেশের রাজনৈতিক সংকট সংঘাতের রূপ নেবে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বিপন্ন হতে পারে।"[১০১] উক্ত বার্তায় এমেকা পুনরায় স্থগিত সংলাপ শুরু করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কমনওয়েলথ মহাসচিবের এই আহবানে সরকার কিংবা বিরোধীদল কোন সাড়া দেয় নাই।

বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পূর্ণাঙ্গ রূপ রেখা ঃ

বিরোধী দলের সংসদ থেকে পদত্যাগের পূর্বে মানিক মিয়া এভ্যুনিউর জনসমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সর্বশেষ রূপ রেখা ঘোষণা করেন। উক্তরূপ রেখায় বলা হয়েছে [১০২] ঃ

১. "বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।"।

২. সংসদ বাতিল করতে হবে এবং অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে।

৩. রাষ্ট্রপতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতি অথবা আপীল বিভাগের একজন গ্রহণযোগ্য অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি অথবা একজন নির্দলীয়, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এবং সেই প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন।

৪. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেননা এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এমন ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রী সভা গঠন করবেন।

৫. এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হবে একটি অবাধ, সুষ্ঠ নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা এবং সংবিধানে প্রদত্ত সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধু মাত্র জরুরি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬) সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পর সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী রাষ্টপতি নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবলুপ্ত হবে।

৭) আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সংসদ একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মতো একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উপরোক্ত ব্যবস্থাকে আইন সম্মত করবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও অন্তত তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকে সংবিধানে সন্নিবেশিত করবে।" বিরোধী দলের এই

Dhaka University Institutional Repository

রূপ রেখা ঘোষণায় সরকারী দলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবের থেকে আরও ব্যবধান সৃষ্টি হলো। ইতোমধ্যে বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণার আলটিমেটামের ১দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার পর বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় পদত্যাগে সম্মত হয়েছেন। বহুল প্রচারিত দৈনিক আজকের কাগজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "মৌখিক ভাবে বিএনপি যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। উভয় পক্ষ থেকে ৫ জন মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। যারা অবশ্যই সাংসদ হবেন। সূত্র মতে এই প্রস্তাবের জন্য কোন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৪৭ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে এটা অনুমোদিত হবে সর্বসম্মত ভাবে।[১০৩] উক্ত প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয় বিরোধী দল এই প্রস্তাব লিখিত আকারে চায়। কিন্তু এর ১ দিন পর ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) বিরোধী দল নতুন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা ঘোষণা করে সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে রাজনৈতিক সংকট আরও ঘনিভূত হয়।

বিরোধী দলের সংসদ থেকে পদত্যাগ ঃ

বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য ইতিপূর্বে সরকারকে যে সময়সীমা বেধে দিয়েছিল সেই সময়সীমা অতিক্রম করার ১ দিন পর ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) রাত সোয়া ৯টায় আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়াম লীগ জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ স্পীকারের কাছে তাদের পদত্যাগ পত্র জমাদেন। উক্ত তিনটি দল ছাড়াও পদত্যাগ পত্র জমাদেন এনডিপি'র সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। ঐ দিন মোট ১৪৫ জন সাংসদ পদত্যাগ পত্র জমাদেন। আওয়ামী লীগের ২ জন সাংসদ পরবর্তীতে তাদের পদত্যাগ পত্র জমাদেন। এর ফলে পদত্যাগী সাংসদের সংখ্যা দাড়ায় ১৪৭ জন। উল্লেখ্য যে বিরোধী দলীয় সাংসদগণ ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন এবং মাগুরা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের ওয়াক আউট দীর্ঘস্থায়ী বয়কটে পরিনত হয়। এবং দীর্ঘ ৯ মাস ২৮ দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সংসদ বয়কটের পর সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। বিরোধী দল পদত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানাকে উল্লেখ করেছেন। জাতীয় সংসদ থেকে বিরোধী দলের সাংসদদের পদত্যাগকে জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে আখ্যায়িত করে বিএনপির মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার বলেন, "তাদের পদত্যাগ রোধের জন্য আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে প্রস্তাব বদল করে তারা পদত্যাগ করে প্রমান করেছে, তারা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চায়।"[১০৪] বিরোধী দলের জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগের ১ দিন পর ২৯ ডিসেম্বর (১৯৯৪) মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় সাংসদদের উদ্দেশ্যে বলেন, " নির্বাচনের ৩০ দিন আগে আমি মন্ত্রীসভা সহ পদত্যাগ করবো। আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টান" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, " আপনারা যা করছেন তা ঠিক নয়। আপনারা চিন্তাভাবনা করে দেখুন এখনও সময় আছে আপনারা চাইলে এখন ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আমরা পদত্যাগ করে নির্বাচন করতে রাজি আছি।" [১০৫]

বিরোধী দল জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ১ জানুয়ারী (১৯৯৫) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতারও টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন, "গণতন্ত্র, সংবিধান প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখতে আমরা সচেষ্ট থাকবো। গণতন্ত্র সংবিধানও সমৃদ্ধিই হচ্ছে আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা।" প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবির প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বেকার বক্তব্য পুনরুল্লেখ করে বলেন, " গণতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়া এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা এবং সমঝোতার স্বার্থে একটি নির্বাচিত সরকার হওয়া সত্ত্বেও আমরা প্রস্তাব দিয়েছি যে, আমি এবং আমার সরকার পূর্ণ মেয়াদ শেষে আগামী সাধারণ নির্বাচনের ৩০ দিন আগে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে দাড়াবো, কিন্তু তারা আমাদের সে প্রস্তাবও মানতে রাজি হয়নি। যে বিষয় নিয়ে বিরোধীদলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ ত্যাগ করেছেন, তা নিস্পত্তির জন্য আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলো না এবং এখনো নেই। তারা যা চেয়েছিলো সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আমরা তার কোনটাই করতে বাকি রাখিনি"। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করণ প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অধিকতর সুষ্ঠ এবং অবাধ করার লক্ষ্যে আমরা জাতীয় সংসদে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) বিল '৯৪ এবং ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল ১৯৯৪ পাস করেছি। এই বিল দু'টি পাসের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে এমনভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে, যে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যপারে কমিশনই এখন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন দল, ব্যক্তি বা প্রশাসনের প্রভাব বিস্তারের এখন আর বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। জাল ভোট বন্ধের জন্যে ভোটারদের পরিচয়পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফলে ভোটাররা নিজেদের ভোট নিজেরাই দেয়ার নিশ্চয়তা পাবেন"। নির্বাচনের ৩০দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধীদল প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দেয় নাই। ফলে বিরোধী দলের পদত্যাগের কারণে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান হয়নি বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এবং বিরোধী দলের গণপদত্যাগ পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংকটকালে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ১০ জানুয়ারী (১৯৯৫) আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাষ্ট্র পতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "If he (the president of the republic) is at all asked by both Khaleda Zia and Sheikh Hassina to assume powers to hold election's he (the president) can not. The constitution has to be amended and that too after holding a referendum in favour of their decission to change the basic character of the Bangladesh countitution."[১০৬]

সংসদ থেকে পদত্যাগ সম্পর্কে রীটপিটিশন ঃ

বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্যদের গণপদত্যাগকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দু'টি রীট পিটিশন দায়ের করা হয়। উক্ত দুটি পিটিশনের প্রেক্ষিতে আদালত পরস্পর বিরোধী আদেশ প্রদান করেন। এ্যাডভোকেট তওফিক এর এক রীট পিটিশনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মাহম্মদুর রহমান ও বিচারপতি হামিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ১৮ জানুয়ারী (১৯৯৫) স্পীকারকে ১০ দিন বিরোধী দলের সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ডিভিশন বেঞ্চ বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা মওদুদ আহম্মেদ এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ওপর কারণ দর্শাও নোটিশে বিরোধী দলের সাংসদদের একযোগে পদত্যাগ কেন অবৈধ, সংবিধান পরিপন্থী এবং বে-আইনী ঘোষিত হবে না, পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

অপর দিকে একই দিন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে স্পীকার কর্তৃক সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেয়ায় এ্যাডভোকেট আলাউদ্দিন কর্তৃক দায়ের কৃত অপর এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্ট বেঞ্চ জাতীয় সংসদের স্পীকার এবং সংসদ সচিবের ওপর

কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন । স্পীকারের ওপর এই মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয় যে, কেনো স্পীকার বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র সম্পর্কে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন না তা জানাতে বলা হয়েছে। সংসদ সচিবের ওপরও এই মর্মে নোটিশ জারি করা হয়েছে যে কেনো বিরোধী দলের পদত্যাগ সম্পর্কে অবিলম্বে গেজেটে প্রকাশ করা হবে না।

বিরোধী দলের গণপদত্যাগ সম্পর্কে উক্ত দু'টি রীটের পরস্পর বিরোধী কারণ দর্শাও নোটিশের প্রেক্ষিতে উক্ত দু'টি রীট আবেদন শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি ৩ জন বিচারপতির সমন্বয়ে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করেন। এই তিন জন বিচারপতি হলেন, বিচারপতি মাহাম্মদুর রহমান, বিচারপতি কাজী এবাদুল হক এবং বিচারপতি এম, এ, করীম। পদত্যাগ সম্পর্কিত দুইটি রীটের শুনানি উক্ত বৃহত্তর বেঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ছ'সপ্তাহের বেশী সময় ধরে ১৪৭ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ সম্পর্কে দায়েরকৃত দুইটি রীটের শুনানি শেষে ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৫) দু'টি পৃথক রীট আবেদনই আদলত খারিজ করে দেয়। তিন সদস্য বিশিষ্ট সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চ সর্বসম্মতি ক্রমে দুইটি রীটের রায় প্রদান কালে বলেন, "মামলা দুইটির বিচার্য বিষয় সম্পর্কে শুনানি গ্রহণের এখতিয়ার আদালতের আছে। কিন্তু উভয় রীটের আবেদন কারীদের উক্ত মামলা দায়ের করার জন্য কোনো আইনগত অধিকার বা ভিত্তি (লোকাস স্ট্যান্ডি) না থাকায় মামলা দু'টি গ্রহণযোগ্য নয়"[১০৭] এ ছাড়াও আদালত সংবিধানের ১২৩ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের শূণ্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে বাধ্যতামূলক ৯০ দিনের যে সময় সীমা রয়েছে তা থেকে মামলা চলাকালীন সময়কে বাদ দেয়ার জন্যেও নির্দেশ দিয়েছেন।

পদত্যাগ সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্ত ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের গত ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) গণপদত্যাগের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রীট আবেদন দু'টি হাইকোর্ট বেঞ্চ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৫) খারিজ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী পদত্যাগ সম্পর্কে তার রুলিং দেন। স্পীকার তার রুলিং এ পদত্যাগ পত্র সমূহ গ্রহণ যোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন। বিরোধী দলীয় সাংসদদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না প্রসংগে স্পীকার তার রুলিং এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। স্পীকার দীর্ঘ ২৯ পৃষ্ঠার রুলিং এ বলেছেন, "গত ২৮শে ডিসেম্বর আমার কাছে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং জামাতের সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী তিনটি 'ফোল্ডার' দেন। তারা আমাকে জানান যে, কার্যপ্রনালী বিধির ১৭৭ ধারা অনুযায়ী এ গুলো পরীক্ষা করতে হবে।" স্পীকার তার রুলিং এ বলেন, জামায়াতের সদস্যদের নাম ধরে যখন তিনি ডাকেন তখন কেউই উপস্থিত ছিলেন না। একমাত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ছাড়া কেউই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পদত্যাগ পত্র দেননি। স্পীকার তার সিদ্ধান্তে বলেন, " আওয়ামী লীগের পদত্যাগ গুলোর মধ্যে মোস্তাফিজুর রহমান এবং আখতারুজ্জামানের স্বাক্ষর সংসদ সচিবালয়ে রক্ষিত স্বাক্ষরের সঙ্গে মেলেনি। মোস্তাফিজুর রহমান ২৮ ডিস্বের তারিখে দেয়া এক চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি কোন পদত্যাগ পত্র পেশ করেননি। আখতারুজ্জামান এখন পলাতক রয়েছেন। এ জন্য এই দু'টি পদত্যাগ পত্র গ্রহণ যোগ্য নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। স্পীকার এই ভাবে মেজর (অবঃ) মাহমুদুল হাসানের পদত্যাগ পত্র ও গ্রহণ যোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেন। স্পীকার পদত্যাগ পত্র গুলো দু'টি বিষয়ের ওপর নিস্পত্তি করেছেন বলে তার রুলিং এ উল্লেখ করেছেন।

এর একটি হলো --পদত্যাগ পত্র গুলো আইন সম্মত হয়েছে কিনা ?

অন্যটি হলো -- একযোগে পদত্যাগ বিধি সম্মত কিনা ?

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রেক্ষিতে স্পীকার পাকিস্তান, জাপান, কানাডা, শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেন এবং বলেন, "একটি পদত্যাগ পত্র বৈধ কিনা তা নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে, পদত্যাগের স্বাক্ষর যথাযথ কিনা ? পদত্যাগী সাংসদ এটা স্বহস্তে লিখেছেন কিনা ? এবং তাতে কোন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে কিনা ? স্পীকার বলেন, " শেখ হাসিনা, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মতিউর রহমান নিজামী এবং সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ছাড়া কেউই ব্যক্তিগতভাবে পদত্যাগ পত্র আমার হাতে দেননি। এরশাদের পদত্যাগপত্র যথাযথভাবে জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এসেছে। কাজেই এই ৫ জন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাকি ১৩৯ জনের স্বাক্ষর পরীক্ষা - নিরীক্ষার দাবি রাখে। এগুলো মিলিয়ে দেখে স্পীকার ১২১ টি সঠিক ভাবে স্বাক্ষরিত বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু সংসদ সচিবালয় থেকে ১৮ জনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাদের পদত্যাগ পত্রগুলো স্বেচ্ছায় বলে জেনেছেন এরপর স্পীকার কার্যপ্রনালী বিধির ১৭৭ ধারা উল্লেখ করে বলেন, " ১৪১ জন সংসদ তাদের পদত্যাগ পত্রে" নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানায় পদত্যাগ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এরশাদ সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং দবিরুল ইসলাম কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করলেও আমি আমার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কারণ ছাড়াই এই তিনটি পদত্যাগপত্র দেয়া হয়েছে বলে মনে করছি। কাজেই এই তিনটি পদত্যাগ পত্র এই বিচারে আমি গ্রহণ করছি। বাকি গুলো গ্রহণ যোগ্য নয়"। কিন্তু সংসদ থেকে এক যোগে পদত্যাগের সংবিধান সম্মত না হওয়ায় স্পীকার শেষ পর্যন্ত ঐ তিনটি পদত্যাগ পত্রও গ্রহণ করেননি। স্পীকার তার রুলিং এ একযোগে পদত্যাগের সাংবিধানিক প্রশ্ন নিস্পত্তি করেন। স্পীকার বিরোধী দলের দীর্ঘ আন্দোলন এবং সংসদ বর্জনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন, "এটা আমাদের সকলেরই জানা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা আমাদের সংবিধানে নেই, কোন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানে নেই। '৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে কোন প্রার্থী কোনো দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেনি। যদি তাই হয় তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি কেবল বে-আইনী নয়, যা হাইকোর্ট বলেছে, এই দাবিতে কোন সাংসদের পদত্যাগের অধিকার নেই। তাহলে তা জনগণের কাছে করা শপথের বরখেলাপ হবে।" স্পীকার আরও বলেন, " সংসদ থেকে পদত্যাগের অনুচ্ছেদকে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। তা হলে দেশের পরবর্তী সংসদগুলোকে একই সংকটে পড়তে হবে।" [১০৮]

স্পীকার কর্তৃক বিরোধী দলের গণপদত্যাগ গৃহীত না হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "বিরোধী দলের ১৪৭ জন সাংসদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করার কোন এখতিয়ার স্পীকারের নেই। সংবিদানের ৬৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আমরা পদত্যাগ করেছি। জাতীয় সংসদের যে কোন সদস্য সাংবিধানিক ভাবেই পদত্যাগ করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে। এ স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার সংবিধান কাউকে দেয়নি"। [১০৯] স্পীকারের রুলিং সম্পর্কে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকার শামীম আহম্মেদ এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, "Speaker Sheikh Razzak Ali however defended his ruling, saying that, What he had done was for the interest of democracy "my Conscience is clear ---- my ruling is legal and constitutional " [১১০] কাজেই স্পীকার তার রুলিং গণতন্ত্রের স্বার্থে আইন সম্মত এবং সাংবিধানিক ভাবেই দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ সম্পর্কে স্পীকারের সিদ্ধান্তের পর বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের সংসদে ফিরে এসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের আহবান জানান। প্রয়োজনে তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গেও আলোচনায় বসতে রাজি আছেন বলে জানান। পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের সমাপনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "সংসদ থেকে পদত্যাগ করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যাবে না।"।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের পদত্যাগ পরবর্তী রাজনৈতিক সংকট ঃ

স্পীকার কর্তৃক বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক সংকটের কোনো সমাধান হয়নি ১৮ এপ্রিল (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনৈতিক সংকট নিয়ে বিরোধী দলের সাথে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করার ১ দিন পর স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধিদলীয় নেত্রীর শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব করেছেন। স্পীকার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং দেশের স্বার্থে এ রাজনৈতিক সংকট সমাধান করা উচিত। ২২ এপ্রিল (১৯৯৫) আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিলেই আলোচনা হতে পারে। সুতরাং বিরোধী দল শর্ত আরোপ করায় স্পীকারের উদ্যোগ সফল হয়নি। প্রশ্ন হল বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী এবং বিরোধী দলের প্রস্তাবিত ফর্মূলা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিলেতো আর আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই আলোচনা বা সমঝোতার লক্ষ্যে উভয়কেই কিছু না কিছু ছাড় দিতে হয় তাহলেই সংকটের সমাধান সম্ভব অন্যথায় নয়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের ৩০ দিন আগে পদত্যাগের ঘোষণা কে প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ এপ্রিল (১৯৯৫) চট্টগ্রামের এক জন সভায় বলেন, " Begum Zia must step down 90 day's before the polls by dissolving parliament according to the constitution." [১১১]

সরকার এবং বিরোধী দলের বিবৃতি এবং পাল্টা বিবৃতি ও বিরোধী দলের হরতাল আন্দোলনের মধ্যে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। এরই মধ্যে ১৯ জুন (১৯৯৫) বিরোধী দলের ১৪০ জন সংসদ সদস্যের জাতীয় সংসদের বৈঠকে অনুপস্থিত একাধিক্রমে ৯০ দিন পূর্ণ হয়।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ৯০ দিন অনুপস্থিতি ঃ উদ্ভুত পরিস্থিতি ঃ

১৯ জুন (১৯৯৫) বিরোধী দলের সাংসদদের জাতীয় সংসদে অনুপস্থিত একাদিক্রমে ৯০ দিন পূর্ণ হয়। ১৯৯৪ সালের ১ মার্চ বিরোধী দলের সদস্যগণ জাতীয় সংসদের অধিবেশন থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। এর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচির পাশাপাশি সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখেন। বিরোধী দলীয় সাংসদদের এই সংসদ বয়কট তথা অনুপস্থিতি একাধিক্রমে ৯০ দিন পূর্ণ হলে, বিরোধী দলীয় সাংসদদের আসন শূন্য হবে কিনা এ সম্পর্কে খোদ সরকারি দলে বিভক্তি দেখা দেয়। বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতির ৯০ তম দিবসে বিএনপি দলীয় সাংসদ ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'পয়েন্ট অব অর্ডারে' দাড়িয়ে, কার্যপ্রনালী বিধির ১৭৯ অনুযায়ী অনুপস্থিত সদস্যদের পক্ষে একটি ছুটির দরখাস্ত করেন। ছুটির দরখাস্ত প্রসংগে জাতীয় সংসদে ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেন, "সংবিধানের ৬৭ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী টানা ৯০ কর্ম দিবস অনুপস্থিত থাকলে তাদের আসন শূন্য হয়ে যাবে। যেহেতু একটি বিশেষ অবস্থার কারণে তারা সংসদে আসতে পারছেনা তাই কার্যপ্রনালী বিধি অনুযায়ী আমি ছুটির আবেদন করছি।"[১১২] কিন্তু ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার এই ছুটির আবেদনটি কার্যপ্রনালী বিধির শর্ত পূরণ না হওয়ায় স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ২২ জুনের সংসদের কার্য দিবসে নাকচ করে দেন, বিএনপি'র মহাসচিবও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ব্যারিষ্টার সালাম তালুকদার এবং সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী ব্যরিষ্টার আমিনুল হক অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জনের বিষয়টি যেহেতু সুপ্রীম আপীল বিভাগে নিস্পত্তির অপেক্ষায় আছে, সেহেতু এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত না দেয়ার অনুরোধ করেন।

বিএনপি'র নেতৃস্থানীয়দের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের পরামর্শের জন্য পাঠানোর কথা বলেছেন। স্পীকার এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন। অবশেষে বিএনপির

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুলাই (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিরোধী দলের অনুপস্থিত সংসদ সদস্যদের কি হবে এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা চাওয়ার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করেছেন। সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শ দান করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবে না।"[১১৩]

সুপ্রীম কোর্টে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স ঃ

প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস বিরোধী দলের অনুপস্থিত সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হবে কিনা, এ ব্যাপারে ৪ জুলাই (১৯৯৫) সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরামর্শ চেয়েছেন, রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স লেটারটি ঐ দিনই বিকালে বিশেষ বাহক মারফত প্রধান বিচারপতি বাসভবনে পাঠানো হয়। প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজাল ঐ দিন ৪টা ১০ মিঃ রাষ্ট্রপতির এ রেফারেন্স লেটার গ্রহন করেন। একই দিন আইন মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ সুপ্রীম কোর্টে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের বিষয়টি জাতীয় সংসদে অবহিত করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত স্পীকারকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। স্পীকার আইন মন্ত্রীর প্রস্তাব ভোটে দিলে সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। ফলে সুপ্রিম কোর্টের জবাব দানের পূর্ব পর্যন্ত স্পীকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত থাকে।

রাষ্ট্রপতি ' সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ (ব্যাখ্যা পরে দেয়া আছে) অনুযায়ী তাঁর রেফারেন্স লেটারে ৪টি প্রশ্নের মাধ্যমে যা জানতে চেয়েছেন সেগুলো হলোঃ [১১৪]

১) শাসক দলের একজন মন্ত্রীর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়ে সকল বিরোধী দলের ওয়াক আউট এবং পরবর্তীতে সংসদে ফিরে না আসার সময় কাল কি সংসদের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি বিবেচিত হবে, যার ফলে সংবিধানের ৬৭(১) (খ) অনুযায়ী ঐ আসন গুলো শূন্য হয়ে যাবে ?

২) সকল বিরোধী সাংসদদের সংসদ বয়কট কি সংসদের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিতি বলে বিবেচিত হবে যার ফলে সংবিধানের ৬৭(১)(খ) অনুযায়ী সংসদে তাদের আসন গুলো শূন্য হয়ে যাবে ?

৩) একাধি ক্রমে ৯০টি কার্য দিবস গণনার ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুচ্ছেদের অর্থের সঙ্গে ১৫২ (১) অনুচ্ছেদে বর্নিত অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়কে যুক্ত করা হবে না কি বাদ দেয়া যাবে ?

৪) অনুপস্থিতির সময় গণনা ও নির্ধারণের যথাযথ অধিকার স্পীকার ও সংসদের রয়েছে কিনা ?

৬ জুলাই (১৯৯৫) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পাঠান রেফারেন্সের ব্যাপারে শুনানি ও জবাব দেয়ার জন্য এটর্নী জেনারেল এর সহায়তায় পদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং রেফারেন্সের ওপর মতামত রাখার জন্য ৭ জন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে আমন্ত্রন জানান। আমন্ত্রিত আইনজীবীগণ হলেন, এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট আমিনুল হক, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সভাপতি টিএইচ খান, এডভোকেট এস আর পাল, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহম্মেদ, ডঃ কামাল হোসেন, খন্দকার মাহবুব উদ্দিন এবং ব্যারিষ্টার রফিকুল হক। এছাড়াও সরকারি নিযুক্ত কৌশলি ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন। ঐ দিন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির পাঠান এ রেফারেন্সের ওপর শুনানির জন্য গ্রহণ করে এর ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, " রাজনৈতিক ঝগড়া মেটানোর জায়গা আদালত নয়, এগুলো রাজনৈতিক দলের বিষয়, আমাদের কাজ শুধু আইনের ব্যাখ্যা দেয়া।"[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত রেফারেন্সটির শুনানি ও জবাব দেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজালের নেতৃত্বে আপীল বিভাগের অন্যান্য প্যানেল বিচারপতিগণ হলেন, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি আব্দুর রউফ ও বিচারপতি ইসমাইল উদ্দীন সরকার।

১৬ জুলাই (১৯৯৪) রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ওপর শুনানি শুরু হয় এবং এই শুনানি চলে ২৪ জুলাই পর্যন্ত। ছয় দিন ব্যাপী শুনানীতে সুপ্রীম কোর্টে মনোনীত ৭ জন আইনজ্ঞের মধ্যে ৬ জন আইনজ্ঞ তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এটর্নী জেনারেল এডভোকেট আমিনুল হকের ১৩ জুলাই আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন নাই। ব্যারিষ্টার আশরারুল হক সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। সুপ্রীম কোর্টের মনোনিত ৬ জন আইনজীবী ছাড়াও স্বপ্রনোদিত হয়ে ৫ জন আইনজীবী রেফোরেন্সের ওপর বক্তব্য রাখেন, এরা হলেন, ডঃ এম জহির, এ্যাডভোকেট মাকসুদুর রহমান, এ্যাডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার, এ্যাডভোকেট ইয়ার আহমেদ এবং এ্যাডভোকেট এ বি এম নূরুল ইসলাম।

নিম্নে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ওপর অনুষ্ঠিত শুনানীতে অংশ গ্রহণকারী সরকার মনোনীত আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্টের মনোনীত ৬ জন এমিকিউরে, স্বপ্রনোদিত আইনজীবীগণ ও প্যানেল বিচারপতিদের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন ঃ

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের শুনানির ১ম দিনের শুরুতে এবং শুনানীর দ্বিতীয় দিনে (১৬ ও ১৭ জুলাই, ১৯৯৫) সরকার পক্ষের নিয়োজিত কৌশলী ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন যে বক্তব্য রাখেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ[১১৬]

* অনুপস্থিতি আর বর্জন এক নয়। সংসদ বর্জন সংসদে অনুপস্থিতি বলে গণ্য হবে না ;

* রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্সে আইনের প্রশ্ন রয়েছে। তাই সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকায় রেফারেন্সটি বিবেচনা যোগ্য ;

* রাষ্ট্রপতির পাঠানো ৪টি প্রশ্নের সবগুলোতে ৩/৪ রকমের ব্যাখ্যা আছে, কোর্ট তার মতামত বলবে।

* টানা ৯০ দিন মানে, অধিবেশন শুরু হয়ে বিরামহীনভাবে চলবে।

* অনুপস্থিত বর্জন ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার সুপ্রীমকোর্টের।

এ্যাডভোকেট এস, আর , পাল ঃ

শুনানীর ১ম এবং দ্বিতীয় দিনে (১৬ ও ১৭ জুলাই, ১৯৯৫) কোর্ট মনোনীত আইনজীবীদের মধ্যে এ্যাডভোকেট এস, আর, পালের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হল ঃ [১১৭]

* এই রেফারেন্স রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ কিনা দেখতে হবে ;

* যদিও রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে রাজনৈতিক বিষয় আছে কিন্তু এর সঙ্গে আইনের ব্যাখ্যা জড়িত থাকে তাই এই রেফারেন্সে সুপ্রীম কোর্ট মতামত দিতে পারে ;

* তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করছে এটা সংবিধানের ৬৭ (১)(খ) অনুযায়ী অনুপস্থিত হবেনা ;

* টানা ৯০ দিন এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ;

* অনুপস্থিতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার সংসদের।

ডাঃ কামাল হোসেন ঃ

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেনের শুনানির ১ম এবং ৪র্থ দিনের (১৬ ও ১৯ জুলাই, ১৯৯৫) প্রদত্ত বক্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরা হল ঃ [১১৮]

* রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ব্যাপারে মতামত দেয়া না দেয়ার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের আছে।

Dhaka University Institutional Repository

* সংসদে বিরোধী দলের আসন শূন্য হবে কিনা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ স্পীকার ;

* স্পীকার সংসদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের আগেই সুপ্রিম কোর্টের মতামতের জন্য পাঠানো সঠিক হয়নি ;

* সংসদের ব্যাপারে নির্বাহী বিভাগের মতামত চাওয়া যৌক্তিক নয়। এতে তিনটি বিভাগের স্বাতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয় ;

* কোনটা বয়কট এবং কোনটা ওয়াকআউট সে ব্যাপারে রেফারেন্সে পর্যাপ্ত তথ্য নেই ;

* রেফারেন্সটি মতামত দেয়ার বিবেচনা যোগ্য নয়।

তিনি আরও বলেন, সংবিধান সত্যিকারভাবে সংকটের মুখে। আদালত একটি রেফোরেন্সের ব্যাপারে পরামর্শ দিবেন কিনা, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার আছে। তিনি রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সটি ফেরৎ পাঠানোর পক্ষে ৫টি যুক্তি দেখান, এগুলো হলো :

- এ বিষয়টি কার্যপ্রনালী বিধি অনুযায়ী স্পীকার সিদ্ধান্ত নেবেন ;
- স্পীকারের কাজে হস্তক্ষেপ ;
- ক্ষমতার পৃথকীকরণের সুস্পষ্ট লংঘন ;
- এ সংক্রান্ত একটি মামলার ক্ষতি করবে ; ও
- আদালতের মর্যাদাহানি করতে পারে।

ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ ঃ

শুনানীর ১ম, ৩য় এবং ৪র্থ দিবসে (১৬,১৮ এবং ১৯ জুলাই ১৯৯৫) ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ যে বক্তব্য রাখেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল ঃ [১১৯]

* এটা একটা ব্যতিক্রম ধর্মী রেফারেন্স ;

* বিরোধী দলের মতামতের জন্য নোটিশ দেয়া প্রয়োজন। তারা আসবে কিনা সেটা তাদের বিষয় ;

* রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে তথ্যের ফাঁক আছে ;

* রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ৪টি প্রশ্ন বিমূর্ত ;

* সংসদের সিদ্ধান্তের পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের মতামত দেয়া ঠিক নয় ;

* রেফারেন্সের প্রথম দু'টি প্রশ্ন আইনগত ও তথ্যগত; তথ্যগত বিষয়ে মতামত দেয়ার কোন এখতিয়ার আদালতের নেই ;

* রেফারেন্সে তথ্যগত ত্রুটির কারণে এ দু'টো প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব না ;

* বয়কট, ওয়াক আউটের যে অর্থই দেয়া হোক তা অনুপস্থিত ;

* একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবসে কেবল অধিবেশন দিবস গুলোই ধরতে হবে ;

* আসন শূন্য হবে কিনা, অনুপস্থিতি কিভাবে গণনা হবে সেটা স্পীকারের বিষয়।

টিএইচ খানঃ

শুনানির ২য় এবং ৩য় দিবসে (১৭ ও ১৮ জুলাই, ১৯৯৫) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট টি,এইচ খান শুনানিতে অংশ গ্রহণ করে যে বক্তব্য রাখেন তা হল ঃ [১২০]

* আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার সুপ্রীম কোর্টের ;

* বয়কট হলো প্রতিবাদ, আর অনুপস্থিতি হলো প্রতিবাদহীন, দু'টো এক জিনিষ নয় ;

* ক্ষমতায় না গেলেই সংসদ বর্জন করতে হবে এমন নজির পৃথিবীর কোথাও নেই।

* একযোগে সংসদ বর্জনের কথা সংবিধান প্রণেতারা চিন্তা করেননি ;

* কেউ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সংবিধানকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

* ওয়াক আউট বা বর্জন অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে না।

খন্দকার মাহবুব উদ্দিন ঃ

শুনানীর ৪র্থ এবং ৫ম দিবসে (১৯ ও ২০ জুলাই ১৯৯৫) আলোচনায় অংশ নিয়ে এ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন যে বক্তব্য রাখেন তা হল ঃ [১২১]

* রেফারেন্সে কোন তথ্যগত ত্রুটি নেই;

* যে দিন বলেছে দাবি না মানলে সংসদে যাবেনা সেই দিনই 'ওয়াক আউট' বয়কটে রূপ নিয়েছে ;

* একাধিক্রমে মানে হলো একটি বৈঠক দিবস থেকে পরবর্তী বৈঠক দিবসের যোগসূত্র গণনা থেকে মাঝখানের দিন গুলো (অধিবেশন বিহীন) বাদ যাবে ;

* অনুপস্থিতি গণনা কে করবে, কে আসন শূন্য করবে কার্যপ্রনালী বিধির ১৭৮ ও ১৮০ তে তা বলা আছে ;

* রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়া সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব ; কোর্ট সেই দায়িত্ব এড়াতে পারে না ;

* একটি রেফারেন্সে রাজনৈতিক বিষয় থাকলেই উত্তর দেয়া যাবে না এই ধারণা ঠিক না ;

* আসন শুন্য হবে কিনা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার স্পীকারের।

ব্যারিষ্টার রফিকুল হক ঃ

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত এমিকাস কিউরিদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি হিসেবে শুনানির ৫ম এবং ৬ষ্ঠ দিবসে (২০ ও ২৩ জুলাই) যে বক্তব্য রাখেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ হল ঃ [১২২]

* সুপ্রিম কোর্ট তার মতামত রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন ; এটা কোন গোপন বিষয় নয়, রাষ্ট্রপতি পাঠের পর এটা সর্বত্র প্রকাশ করা যাবে ;

* রাষ্ট্রপতি তার রেফারেন্সে যে তথ্য দিয়েছেন তা সত্য ধরে নিতে হবে এবং তার ওপর আপিল বিভাগের মতামত দেয়া উচিত ;

* আমাদের সংবিধান অনুযায়ী এটা সুপ্রিম কোর্টের একটি এখতিয়ার ভুক্ত বিষয় ;

* বয়কট এবং ওয়াক/আউট সম্পর্কে বিভিন্ন ডিকশনারীর অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, এর যে নামেই হোকনা কেন বিরোধী দল সংসদে অনুপস্থিত এটাই হলো সত্য।

* বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতি যে সব রেফারেন্স পাঠাবেন, তাতে রাজনৈতিক বিষয় থাকবেই ;

* একাধিক্রমে ৯০ দিনের মানে হলো পরপর ৯০টি বৈঠক ;

* ৮৯ দিন পর্যন্ত অনুপস্থিতি থাকার জন্য কারো অনুমতি লাগে না, আবার ৯০ দিনের পর গিয়ে অনুমতি চেয়েও কোন লাভ হবে না ;

* গণতন্ত্রের শেষ বিচারক জনগণ, জনগণই রায় দিয়ে পরবর্তীতে ঠিক করবে তাদের অনুপস্থিতি কি ছিলো।

ব্যারিষ্টার রফিকুল হক শুনানির দ্বিতীয় দিবসে (১৭ জুলাই, ১৯৯৫) সংসদ সদস্যগণের অনুপস্থিতি সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা মূলক এখতিয়ার সম্পর্কে বাংলাদেশ সাংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর একটি তালিকা আদালতে পেশা করেছেন। আজকের কাগজ ১৮ জুলাই ১৯৯৫ সংখ্যার সেই জন্যে তালিকা দু'টোর বাংলারূপ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে অনুপস্থিতির জন্য আসন শূণ্য হওয়া ও সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার, বিভিন্ন দেশের সংবিধানে যা আছে ঃ

সারণী ঃ ৫-৩

সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা মূলক এখতিয়ার ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান ১০৬ অনুচ্ছেদ	ভারতে সংবিধান ১৪৩(১) অনুচ্ছেদ	পাকিস্তানের সংবিদান (১৯৭৩)	শ্রীলংকায় সংবিধান ১২৯ অনুচ্ছেদ	ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ ২১৩ অনুচ্ছেদ	মালয়েশিয়ার সংবিধান ১৩০ অনুচ্ছেদ
"যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরণেরও এমন জনগুরুত্ব সম্পর্কে যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্সপিডিয়েন্ট তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।"	যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিয়মান হয় যে, আইনের বা ঘটনার এইরূপ কোন প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনেরও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন (এক্সপিডিয়েন্ট) তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি উক্ত আদালতে বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আদালত স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (যে রিপোর্ট)।	১৮৬ অনুচ্ছেদ (১) যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি এইরূপ বিবেচনা করেন যে, আইনের কোন প্রশ্ন, যা তিনি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বলে বিবেচনা করেন, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত কাম্য (ডিজায়্যারেবল), তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি বিবেচনার জন্যে সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন। (২) সুপ্রিম কোর্ট উক্তরূপে প্রেরিত প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন এবং প্রশ্নটি সম্পর্কে স্বীয় মতামত রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন করিবেন। (শ্যাল কমনসিডার এ্যান্ড রিপোর্ট)।	(১) যদি কোন সময়ে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের বা ঘটনার এইরূপ কোনে প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। যা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন (এক্সপিডিয়েন্ট), তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি উক্ত আদালতের বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত আদালত স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর উক্ত রেফারেন্সে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রপতি যেইরূপ বর্ধিত করেন সেই সময়ের মধ্যে প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৪) এই অনুচ্ছেদের প্যারাগ্রাফ (১) এর আওতায় সকল কার্য বিবরণী আদালত বিশেষ কারণে অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, গোপনে রক্ষিত হইবে।	১) যদি কোন সময়ে গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে যা উথাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে যাহা এমন ধরণেরও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে ফেডারেল আদালতের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন (এক্সপিডিয়েন্ট) তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি উক্ত আদালতের বিবেচনায় জন্যে প্রেরণ করিতে পারবেন এবং উক্ত আদালত তাহাদের বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর গভর্ণর জেনারেলকে উক্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (২) এ ধারার আওতায় উন্মুক্ত আদালতে উক্তরূপ প্রশ্ন সম্পর্কিত শুনানিতে উপস্থিত বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত কোন মতামত জ্ঞাপন করা যাইবে না। কিন্তু এই উপধারায় কোন কিছুই কোন বিচারক একমত না হইলে তাহলে ভিন্নমত প্রদান থেকে বিরত করিতে পারিবেন।	× ইয়াং ডি-পারট্যান এবং এ সংবিধানের কোনো বিধান বলবৎ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উথাপিত হইয়াছে বা উথাপনের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে প্রশ্নটি ফেডারেল আদালতের বিবেচনার জন্যে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং ফেডারেল আদালত উক্ত রূপে প্রেরিত যে কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে উন্মুক্ত আদালতে স্বীয় মতামত ঘোষণা করিবেন। (শ্যাল প্রোনাউন্স) × ইয়াং ডি-পারট্যান এবং ফেডারেশনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী (সুপ্রিম হেড)।

সূত্রঃ আজকের কাগজ, ঢাকাঃ ১৮ জুলাই ১৯৯৫ইং

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.৪

আসন শূন্য হওয়া সম্পর্কিত

বাংলাদেশের সংবিধান ৭(১) (খ) অনুচ্ছেদ	ভারতের সংবিধান (১৯৫০)	পাকিস্তানের সংবিধান (১৯৭৩) ৬৪ অনুচ্ছেদ	মালদ্বীপের সংবিধান ৬৫ অনুচ্ছেদ	শ্রীলংকার সংবিধান ৬৬ অনুচ্ছেদ	নেপালের সংবিধান ৩৮ অনুচ্ছেদ	মালয়েশিয়ার সংবিধান	সিঙ্গাপুরের সংবিধান ৪৬ অনুচ্ছেদ	ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ ৬৮ অনুচ্ছেদ
(১) কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি (ক) '--------' (খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাধিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।	১০১(৪) অনুচ্ছেদ যদি সংসদের যে কোনো কক্ষের কোনো সদস্য সংসদের অনুমতি ব্যতীত ৬০ দিনের জন্যে সংসদের সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন। তাহা হইলে সংসদ উক্ত সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৬০ দিনের সময় গণনার ক্ষেত্রে একাদিক্রমে ৪ দিনের বেশি সংসদের অধিবেশন মুলতবি বা স্থগিত থাকিলে উক্ত মধ্যবর্তী সময়কালকে গণনা করা যাইবে না। ১৯০(৪) অনুচ্ছেদ যদি কোনো রাজ্যের আইন সভার কোনো সদস্য আইন সভার অনুমতি ব্যতিরেকে ৬০ দিন সময়কালে সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে আইন সভা উক্ত সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৬০ দিন সময়কাল গণনার ক্ষেত্রে আইনসভার অধিবেশন চার দিনের বেশি সময়কাল পর্যন্ত মুলতবি বা স্থগিত থাকিলে মধ্যবর্তী উক্ত সময়কালকে গণনা করা যাইবে না।	(১) ------------ ----- (২) সংসদ কোন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন যদি তিনি সংসদের অনুমতি না লইয়া একাদিক্রমে ৪০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।	যদি জন মজলিশ'র কোনো সদস্য মজলিশের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে একাদিক্রমে দুটি অধিবেশনে মজলিশে উপস্থিত হতে অপারগ হন, তাহা হইলে তিনি সদস্য পদ হারাইবেন।	কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে (চ) যদি তিনি প্রথমেই সংসদের অনুমতি না লইয়া অবিরাম (কন্টিনিউয়াস) তিন মাস সংসদের বৈঠকে নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন।	(১) জাতীয় পঞ্চায়েতের কোন সদস্যের আসন নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে শূন্য হইবে। (ঘ) যদি, তিনি পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতিরেকে অবিরাম একমাস জাতীয় পঞ্চায়েতের বৈঠকে নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন।	সংসদের যে কোনো কক্ষের কোনো সদস্য সংসদের অনুমতি ছাড়া ৬ মাস পর্যন্ত সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকিলে সংসদ উক্ত সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন।	(২) কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে- (ঘ) যদি প্রত্যেক মাসে সংসদের (অথবা কোনো সংসদীয় কমিটির যে কোন কমিটির যে কমিটির তিনি সদস্য) বৈঠকে হইয়াছে, এইরূপ একাদিক্রমে দুইমাস তিনি স্পীকারের অনুমতি না লইয়া অনুরূপ সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন।	(৪) যদি কোনো সংসদ (চেম্বার) সদস্য সংসদের অনুমতি না লইয়া ৬০ দিন সংসদের সকল বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সংসদ উক্ত সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ৬০ দিন সময়কাল গণনার ক্ষেত্রে সংসদের অধিবেশন চার দিনের বেশি সময় স্থগিত বা মুলতবি থাকিলে মধ্যবর্তী উক্ত সময়কালকে গণনা করা যাইবে না।

সূত্রঃ আজকের কাগজ, ঢাকাঃ ১৮ জুলাই ১৯৯৫ইং

এবার রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের সময় বিচারপতিদের প্রশ্ন মন্তব্য ও অবজারবেশনের উপর আলোকপাত করা হল :

প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজাল ঃ

শুনানির সময় মনোনীত আইনজ্ঞের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি শুনানির দ্বিতীয় তৃতীয় ও সপ্তম দিনের মন্তব্যের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল ঃ[১২৩]

* আদালত কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যাবেনা, শুধু রেফারেন্সের মধ্যেই থাকবে;

* বর্জন যদি ৬৭ (১) (খ) এর আওতায় না পরে তা হলে কোন দিন যদি তারা সংসদে না আসে, তাদের আসন কোন দিনই শুন্য হবেনা ;

* পদত্যাগ পত্র গ্রহন না করে স্পীকার কি বিরোধী দলকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন; অনুপস্থিতি নয় বললে বিরোধী দল ফিরে আসবে এই গ্যারান্টি কোথায় ?

* একজন নির্বাচিত সংসদকে কি আমরা নির্দেশ দিতে পারি সংসদে ফিরে যাও ;

* কোর্ট নির্দেশ দিয়ে সব কিছু ঠিক ঠাক করতে পারে না ;

* রাষ্ট্রপতি যদি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন সঙ্গত কিনা এ রকম মত চান তা হলে কি কোর্ট তা দিতে বাধ্য থাকবে ;

* রাষ্ট্রপতি একটা রেফারেন্স পাঠিয়েছেন কোন কিছু না বলে এটা ফেরৎ পাঠানো হবে Mis Conduct, অক্ষমতার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল ঃ

শুনানির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম দিবসে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগের সিনিয়র বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের শুনানির প্যানেল বিচারপতিদের মধ্যে অন্যতম বিচারপতি মোস্তফা কামাল আইনজীবীদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে মন্তব্য করেন তা নিম্নে দেয়া হল ঃ[১২৪]

* বয়কট যদি অনুপস্থিত না হয়, একজন ব্যবসায়ী এম পি ৪বছর হংকং এ থাকেন স্পীকার তার আসন শুন্য করলে বলবেন, আমি তো বয়কট করেছি, তখন কি হবে।

* অধিবেশনে বসে নাওয়া - খাওয়া নামাজ সব কিছু বাদ দিয়ে ৯০ দিন বিরামহীনভাবে চলবে, তাতে অনুপস্থিত থাকলেই ৬৭ (১) (খ) আকৃষ্ট হবে, এমন অবাস্তব ধারনা থেকে সংবিধান তৈরী হয়নি ;

* পদত্যাগের ব্যাপারে যদি স্পীকার সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, অনুপস্থিতির ব্যাপারে পারবেন না কেন ?

* ১০৬ এ সুপ্রীম কোর্টের মতামত মানতে রাষ্ট্রপতি বা স্পীকার বাধ্য নন ;

* অনুপস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে না - বিপক্ষে এটা রাজনৈতিক বিষয়। ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকলে এলাকায় যেতে হবে নতুন ম্যান্ডেটের জন্য এটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ;

* সংসদে না এসে বেতন ভাতা নিয়ে ও যদি আসন শূন্য না হয় সেটা কি গণতন্ত্রের জন্যে লাভ জনক।

* রেফারেন্স সংবিধানের ১০৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নয়, আদালতের এখতিয়ার।

বিচারপতি আবদুর রউফ ঃ

শুনানির দ্বিতীয় দিবসে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স নিষ্পত্তির প্যানেল বিচারপতি, বিচারপতি আবদুর রউফ যে মন্তব্য করেন তার অংশ বিশেষ উদৃত করা হল ঃ[১২৫]

* রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতো কমানো যায় এটাই ছিলো দ্বাদশ সংশোধনীর লক্ষ্য।

* সংবিধানে ৫৭ (২) অনুচ্ছেদ ছাড়া সংসদ ভাঙ্গার আর কোন সুযোগ আছে ?

বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার ঃ

শুনানী চলাকালীন দ্বিতীয় দিবসে প্যানেল বিচারপতিদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ বিচারপতি বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার মন্তব্য করেন, যে "সাংসদদের যে হিসেব রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স আছে তাতে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছে এমপি ৩৩১ জন, সংবিধানে তো ৩০০ জন এমপির কথা বলা হয়েছে।" [১২৬] রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ওপর শুনানির জন্য কোর্ট মনোনীত আইনজ্ঞদের বক্তব্য ও প্যানেল বিচারপতিদের প্রশ্ন, মন্তব্য ও অবজারভেশনের পর কোর্ট উক্ত রেফারেন্সের ওপর বক্তব্য দানে ইচ্ছুক সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীদের মতামত আহবান করেন। কোর্টের এ আহবানে সাড়া দিয়ে স্বপ্রনোদিত হয়ে যে ৫ জন আইনজীবী বক্তব্য রাখেন তাদের বক্তব্য ও তুলে ধরা হলো ঃ [১২৭]

ডঃ জহির স্বপ্রনোদিত বক্তাদের প্রথমেই তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, " ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, এখন তারা আর সাংসদ নন, কাজেই তাদের সংসদে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র নাকচ করে স্পীকার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছেন। পদত্যাগ একজন সাংসদের অধিকার এই অধিকার খর্ব করার অনুমতি সংবিধান স্পীকারকে দেয়নি।"

এ্যাডভোকেট মাকসুদুর রহমান, বলেন, "ওয়াক আউট ও বয়কট অনুপস্থিত হবে। একাদিক্রমে ৯০ দিন গণনায় অধিবেশনহীন দিনগুলো বাদ যাবে এবং আসন শূন্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের এখতিয়ার স্পীকারের"।

এ্যাডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার-বলেন,"সংসদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার রাষ্টপতিকে দেয়া হয়নি। সুপ্রীমকোর্টকে আমরা বঙ্গভবনের অংশ করতে পারিনা। তাই এই রেফারেন্সটিকে ফেরৎ পাঠাতে হবে"।

এ্যাডভোকেট ইয়ার আহমেদ - স্বপ্রোনোদিত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,"রাষ্ট্রপতি যখন একটি রেফারেন্স পাঠিয়েছেন তখন সংশ্লিষ্ট সবগুলো বিষয়ের জবাব দেয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, বিরোধী দলকে সংসদে ফিরে যাওয়ার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ দেয়া উচিত। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেয়া উচিত"।

এ বি এম নূরুল ইসলাম - প্রধান বিচারপতির আহবানে স্বপ্রনোদিত বক্তাদের মধ্যে সর্বশেষ বক্তা হিসেবে তিনি বলেন, "সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে যে আইনগত পরামর্শ, কিন্তু রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সে কোন আইনগত প্রশ্ন করা হয়নি। কারণ ওয়াক আউট বয়কট কোন আইনের বিষয় নয়। তাছাড়া ৯০দিন গোনায় রাষ্ট্রপতি কে"?

১৬ জুলাই (১৯৯৫) সরকার পক্ষের কৌশলী ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের শুনানি শুরু হয়ে ছিলো। ২৩ জুলাই শুনানির সমাপ্তি দিবসে ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন তার সমাপ্তি বক্তৃতায় বলেন, "এমিকাস কিউরেদের যে ভূমিকা পালন করা উচিত ছিলো তা তারা করেন নি। তিনি বলেন, "ডঃ কামাল হোসেন রেফারেন্স ফেরৎ পাঠানো সম্পর্কিত যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমাদের সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন নয়"। আদালত স্ব-আরোপিত বিধি নিষেধ আরোপ করা উচিত নয়"। বিচারপতি মোস্তফা কামালের প্রশ্নের উত্তরে ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন বলেন, "সংবিধানের ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার আদালতেরই সবচেয়ে বেশি। আইনের ব্যাখ্যা এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা সংসদের নেই, এটা সুপ্রীম কোর্টের আছে"[১২৮]। তিনি ওয়াক আউট, বয়কট অনুপস্থিত নয় বলে তার অভিমত ব্যক্ত করেন। ব্যারিষ্টার হোসেনের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুনানি সমাপ্তি হয়।

২৭ জুলাই (১৯৯৫) (শুনানি সমাপ্তির ১ দিন পর) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের প্যানেল বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাব পাঠিয়েছেন। উক্ত জবাবের কপি ঐ দিন সকাল ১০:২৫ মিনিটে সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্ট্রার রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাবে বিচারপতিগণ যে উত্তর দিয়েছেন তা নিম্নে উদৃত করা হলঃ[১২৯]

প্রধান বিচারপতি এটি এম আফজাল ঃ

প্রধান বিচারপতি তার মতামতে সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের উদৃতি দিয়ে বলেছেন, "সংবিধানের ১০৬ বিস্তর ক্ষেত্র দিয়েছে। এটা অবশ্যই রাষ্ট্রপতি যিনি আইনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কিনা দেখবেন। যা নিয়ে কোন সংশয় বা প্রশ্ন করা যাবেনা। রেফারেন্সের প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বা অন্য কিছু কিনা এ নিয়ে কোন মাথা ঘামাতে পারেনা। প্রধান বিচারপতি এও উল্লেখ করেন যে,"মতামত দিতে কোর্ট বাধ্য নয় উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে কোর্ট জবাব দান করতে অপারগতা প্রকাশ করতে পারে"। তিনি বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেন; এ গুলো হলো ঃ-

(১) রেফারেন্সের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং ধরন দেখা গ্রহন যোগ্য নয় ;

(২)রেফারেন্সে যে সব তথ্য দেয়া হয়েছে তা সত্য বলে ধরে নিতে হবে। সত্য - সত্য না মিথ্যা তা যাচাই করা যাবেনা ;

(৩) রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের মতামত গ্রহনে বাধ্য নয়, কিন্তু এ ধরনের মতামত সব সময়ই উপযুক্ত মর্যাদা পায় ;

(৪) এই মতামত কোনো আদালতের ওপর ও বাধ্যবাধক নয় ;

(৫) যদি ও উপদেষ্টা মতামত আইন নয়, এজন্যে হাইকোর্ট ও এটা মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু এই মতামত সবসময়ই উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান পায় ;

প্রধান বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন যে, "রেফারেন্সে এমন কোনো বিষয় নেই, যা সংসদের একান্ত নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। তবে এটা সত্য যে, যে সব প্রশ্ন গুলো আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, সে বিষয়ে স্পীকার সংসদে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। আমরা এটা জানিনা এবং এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে পারিনা, কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি রেফারেন্সটি পাঠিয়েছেন"। ডঃ কামাল হোসেন এবং ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের যুক্তি অনুযায়ী কোনো মতামত না দিয়ে রেফারেন্সটি ফেরৎ পাঠানো সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি তাদের যুক্তি গ্রহন না করে বলেন,"এরকম কোন চর্চা নেই যে, আদালত রাজনৈতিক বিষয় জড়িত আছে শুধু এ কারণে রেফারেন্সের জবাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এ জন্যে আরও যুক্তিপূর্ন কারণ দরকার বিধায় কোর্টের ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা সাংবিধানিক। তবে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন যে, "রাজনৈতিক প্রশ্ন এলে আমরা সম্মানের সঙ্গে তা ফেরৎ পাঠাবো"।

প্রধান বিচারপতি তার মতামতে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স লেটারের ৪টি প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

"এক ও দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে হ্যাঁ সূচক তবে তা হবে একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিন গণনার সাপেক্ষে"।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলেন,"অধিবেশনের সমাপ্তি থেকে আরেকটি অধিবেশনের শুরু পর্যন্ত সময় একাদিক্রমে ৯০বৈঠক দিবস গণনা থেকে বাদ যাবে"। এবং

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,"স্পীকার অনুপস্থিতির সময় গণনা করবেন"। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির চারটি প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন,"সংবিধানে বলা হয়েছে, একজন সদস্য যদি সংসদের বিনা অনুমতিতে একাদিক্রমে ৯০দিন অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে। স্পীকার বা কারোরই কোন ভূমিকার কথা বলা হয়নি। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন,"দীর্ঘ সময় ওয়াক আউট এবং বয়কটের আমরা যে অর্থই করিনা কেন তা সংবিধানের ৬৭ (১) (খ) অনুযায়ী আসন শূন্য হবে"।

বিচারপতি মোস্তফা কামালঃ

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের মতামত দানকারী প্যানেল বিচারপতিদের অন্যতম বিচারপতি মোস্তফা কামাল তাঁর মতামতে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষন করেন। তা ছাড়া ও তিনি যে সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

মতামত ব্যক্ত করেন তা হল,"কার্যপ্রনালী বিধির ১৮০ অনুযায়ী সংসদ সচিব যে কাজ করেন তা দাপ্তরিক, স্পীকারের ভূমিকা হলো অবহিত মূলক"। তিনি আরও বলেন,"সকল লিখিত সংবিধানেই অনুপস্থিতির সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে তা যে কোন কারণেই হোক না সেজন্যে উপনির্বাচনের বিধান রেখে ছিলেন। যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুপস্থিতির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। তা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করবে। তিনি সংবিধানের ৬৭(১) (খ) প্রসংগে বলে, "বিনা অনুমতিতে টানা ৮৯ দিন পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকা যায়। সেটা অনুপস্থিতির জন্যেই হোক বা একযোগে পদত্যাগের কারণেই হোক। কিন্তু যখনই অনুমোদিত সময় পেরিয়ে যায় তখনই ৬৭(১) (খ) এর গিলোটিন প্রয়োগ হবে।

বিচারপতি লতিফুর রহমান ঃ

প্যানেল বিচারপতিদের অপর বিচারপতি লতিফুর রহমান। চারটি প্রশ্নেই প্রধান বিচারপতির অনুকরণে হলেও মতামতের মেষ পর্যায়ে কিছু নিজস্ব মতামত রেখে বলেন, "এটা খুবই দর্ভাগ্যজনক যে, '৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের অধীনে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সব বিরোধী দল ছাড়া কাজ করছে। এটা কি সংসদীয় গণতন্ত্র? গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, ' আমরা সকলেই দেশের উন্নতি আমাদের জন্যে, আমাদের সন্তানদের জন্যে করতে চাই। আমরা কি গণতন্ত্রে মূল স্পীরিট ভুলে যাচ্ছি না ? গণতন্ত্রের জন্যে নির্বাচন প্রয়োজন। কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্র নিশ্চিত করে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র কখনোই কাজ করে না। যতক্ষণ আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা না করি।। আমি শুধু আশা করবো যে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল গুলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তুলবে। যাতে আমাদের দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠে।

বিচারপতি আব্দুর রউফ এবং বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার ঃ

বিচারপতি আব্দুর রউফ এবং বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের ৪টি প্রশ্নেই প্রধান বিচারপতির দেয়া মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের জবাব দেয়ার ১ দিন পর জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ২৮ জুলাই (১৯৯৫) জাতীয় সংসদে জানান, "বিরোধী দলের সদস্যদের যারা ৯০ দিনের বেশী অনুপস্থিত ছিলেন, তাদের আসন গুলো ২০ জুন (১৯৯৫) থেকে শূন্য হয়ে যাবে।" এবং এ ব্যাপারে হিসেব নিকেশ করার পর অনতি বিলম্বে গেজেট প্রকাশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্পীকার সুপ্রিম কোর্টের মতামত প্রসংগে বলেন, "যদিও সুপ্রীম কোর্টের মতামত কারো জন্য বধ্যবাধকতা মূলক নয়, কিন্তু সকলের এটা মানা উচিত। অবশ্যই মানা উচিত" [১৩০]

বিরোধী দলের আসন শূন্য ঘোষণা ঃ

৩০ জুলাই (১৯৯৫) সংসদ সচিবালয়ের সচিবের স্বাক্ষরিত দু'টি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংসদের অনুমতি ব্যতীত একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকার কারণে বিরোধী দলের ১৪২ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৮৭ জনের আসন ২০ জন (১৯৯৫) থেকে শূন্য ঘোষণা করেন। অনুপস্থিত বাকি ৫৫ জন সংসদ সদস্যের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার কারণে তাদের আসন শূন্য ঘোষণা না করে তাদেরকে প্রথমে চিঠি দেয়া হয় যে, তারা সংসদে উপস্থিত ছিলেন কিনা ? কিন্তু উক্ত ৫৫ জন সাংসদ কোনো ইতিবাচক সাড়া না দেয়ায় তাদের আসন ও শূন্য ঘোষণা করা হয়। এই ১৪২ জন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হওয়া প্রসংগে কার্যপ্রনালী বিধির ১১৮ (৩) বিধির শর্তানুযায়ী ডেপুটি স্পীকার হুমায়ুন খান পন্নী ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) জাতীয় সংসদকে অবহিত করেন যে, ১লা মার্চ ১৯৯৪ থেকে ১৯ জুন ১৯৯৫ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলের ১৪১ জন সংসদ একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্স সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত অনুযায়ী ১৪১ জন সংসদের ৯০ দিন অনুপস্থিতির কারণে আসন শূন্য ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগ সংসদ আখতারুজ্জামান বাবুকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ৭১ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছিলো। ৮ মার্চ '৯৪ থেকে ২৫ জুন ' ৯৫ পর্যন্ত ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকায় ২৬ জুন থেকে তাঁর আসন শূন্য ঘোষণা হয়।"[১৩১] তবে সংসদ কারা বন্দী থাকায় জাতিয় পার্টির হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ ও আওয়ামী লীগের হেমায়েত উল্লাহ আওয়ারঙ্গ এবং ইসলামী ঐক্য জোটের মাওলানা ওবায়দুল হক, জাতীয় পার্টির মাহাম্মদুল হাসান, এবাদুর রহমান চৌধুরী , পরিতোষ চক্রবর্তী, হাফিজুর রহমান প্রামানিক, আব্দুল মজিদ ও শরিফ উদ্দিন খসরু সহ এই ৯ জনের একাদিক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিতি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যোগ দেয়ায় তাদের আসন শূন্য ঘোষণা করে নাই। বিরোধী দলের ১৪২ জন সদস্যের আসন শূন্য হওয়ার ফলে জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যা দাড়ায় ১৮৮ জনে। ফলে সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে এই ১৪২ আসনে উপনির্বাচনের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

(১২) উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মেরুকারণ ঃ সমঝোতার উদ্যোগ ঃ

বিরোধী দলের অনুপস্থিত সদস্যদের আসন শূন্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিরোধী দলের আসন শূন্য ঘোষিত হয় ৩০ জুলাই (১৯৯৫)। কিন্তু এর পূর্বেই উপনির্বাচনকে ঘিরে অন্তর্বর্তী সরকারের রূপ রেখা সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ২৩ জুন (১৯৯৫) সরকারি দল বিএনপি'র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঘোষিত নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে পদত্যাগের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উপনির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় বিরোধী দলের যে আসন গুলো শূন্যে হবে সেখান থেকে প্রথম পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে ১১টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত ১১টি আসনে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সরকারী বা বিরোধী দলের বাইরে থেকে একটি ঐকমত্য প্যানেল নির্বাচন করবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত উক্ত প্যানেল সদস্যগণের তত্ত্বাবধানে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালিত হবে। এই ১১ জনের মধ্য থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অন্যান্য উপদেষ্টা নির্বাচন করা হবে। প্রস্তাবে বলা হয়, যেহেতু রাজনৈতিক দল সমূহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রার্থী দিবে এবং কোন রাজনৈতিক দলই ঐকমত্যের বাইরে প্রার্থী দিবে না ফলে ঐকমত্যের নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ সহজেই জয়লাভ করবে। প্রস্তাবে বলা হয় "নির্দলীয় সদস্যগণ শপথ গ্রহণের পর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দিবেন। এরপর নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করবেন। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করবেন"। এ ব্যবস্থার ফলে সংবিধান সংশোধনের কোন প্রয়োজন পড়বেনা। সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয় -

" সংসদে ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী কালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীনে নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা সংসদ সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তাঁহারা সদস্য রূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন"।[১৩২]

সুতরাং, এই ব্যবস্থায় বা এই ফর্মুলায় সংবিধান সংশোধন ব্যতীত অর্থাৎ বর্তমান সংবিধানিক কাঠামোর আওতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রশ্নটি মিমাংসা করা সম্ভব ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'অবাধ, মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপায়' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক ঃ

২৮ জুলাই(১৯৯৫) জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভি, আই, পি লাউঞ্জে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক গোল টেবিল বৈঠক উল্লেখিত বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, বিচারপতি টি, এইচ, খান, ডঃ রফিকুর রহমান, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার আশরারুল হোসেন। আলোচক বৃন্দ চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপরও গুরুত্বারোপ করেছে বিধায় প্রসঙ্গক্রমে কয়েক জনের বক্তব্য তুলে ধরা হলো ঃ

আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, " তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ ফর্মূলাটি উদ্ভট কোন প্রস্তাব নয়। বরং নির্বাচনের ৩০ দিন আগে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের ঘোষণার সূত্র ধরেই এ ফর্মূলার সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো সুবিধা জনক সংখ্যক নিরপেক্ষ (উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে) ব্যক্তিকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পাস করিয়ে, এটা বর্তমান সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যায়"। ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আরও বলেন, "দেশের জনগণের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে দু'পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে এ সংকট সমাধান করা প্রয়োজন"। তিনি আরও বলেন, " বিরোধী দলের ফর্মূলা অনুযায়ী এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে বিরোধী দল বলছে, পরবর্তী সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনকে 'রেটিফিকেশন' করে নিবেন।" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " সংবিধান 'রেটিফিকেশনের বিষয়টি যত সহজে বলছেন বিষয়টি এত সহজে নয়।" [১৩৩] উক্ত বৈঠকের আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, "সরকার গঠনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য। তবে, দেশের শাসনতন্ত্রকে মেনেই রাজনীতি করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, " গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে শাসনতন্ত্র চর্চার কোনো বিকল্প নেই। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।" [১৩৪]

'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফাউন্ডেশন' আয়োজিত 'অবাধ, মুক্তও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপায়' শীর্ষক এ গোল টেবিল বৈঠকের আলোচক বৃন্দের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে বর্তমান সংবিধানিক কাঠামোর বাইরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়া আলোচক বৃন্দ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের সমঝোতা উদ্যোগ ঃ

বিরোধী দলের জাতীয় সংসদে অনুপস্থিতির বিষয়ে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স পাঠানোর প্রাক্কালে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জুলাই ১৯৯৫ এর প্রথম সপ্তাহে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এক একান্ত বৈঠকে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক বিরোধী দলীয় নেত্রীকে আলোচনার প্রস্তাব দেন। উক্ত বৈঠকে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আলোচনার পূর্বে তিনটি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ঠ ঘোষণা ছাড়া, কোনো আলোচনায় যাবে না। এগুলো হলোঃ [১৩৫]

১. প্রধানমন্ত্রীকে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দিতে হবে যে, তিনি নির্বাচনের ৯০ দিন আগে পদত্যাগ করবেন।
২. নির্বাচনের ৯০ দিন আগে একটি দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। এবং
৩. অবিলম্বে সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের ফর্মূলা ঃ

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহম্মেদ সংকট নিরসনে তার উদ্ভাবিত একটিফর্মূলা পেশ করেন। তিনি রাজনৈতিক সংকটের সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের পর ২৮ জুলাই(১৯৯৫) জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যে বক্তব্য রাখেন সেই বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে ১ আগষ্ট(১৯৯৫) একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা পেশ করেন যা ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদের 'পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা' যা 'ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের ফর্মূলা' নামে খ্যাত। ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ তার এ প্রস্তাবনা পেশ করার পূর্বে বিরোধী দলের নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের অবস্থানও নির্বাচনের একটি নির্দিষ্ট সময় পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘোষণা এবং বর্তমান সংবিধানিক কাঠামোর আওতায় তার এ প্রস্তাব পেশ করেন।

ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ [১৩৬]

১. কিছু সংখ্যক নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি, ধরা যাক ১০ জন, যারা সরকার ও বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য যারা পরবর্তীকালে একটি ক্যাবিনেটের দায়িত্ব নেবেন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী এদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

২. যেহেতু এখন সংসদে অনেক গুলো আসন খালি হয়ে গেছে। সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন করতে হবে। এটা নির্দলীয় ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই উপনির্বাচনে সর্বসম্মত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন। উপনির্বাচন সবগুলো শূন্য আসনে পূরণের জন্য করা যায়। আবার যে ক'জন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার থাকবেন তাদের সমন্বয়ে করা যায়।

৩. যদি সবগুলো শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয় তা হলে সবচেয়ে সম্ভব দুরবর্তী সময় নির্বাচনের জন্যে নির্ধারণ করে কাছাকাছি তারিখ মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই এবং প্রত্যাহারের জন্যে রাখা যায়। এটা যদি করা যায়, তা হলেও উপনির্বাচন এড়ানো সম্ভব। কারণ সর্বসম্মত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর। এরপর আর উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। সর্বসম্মত ভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের ব্যাপারে নোটিফিকেশনের পর তারা তাদের আসনে বসবেন। এরপরই সংসদ ভেঙ্গে দিলে আর উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না।

৪. বর্তমান সাংবিধানিক সমস্যা সংবিধানের আওতায় সমাধানের জন্যে সমঝোতার জন্যে নিম্ন লিখিত বিষয়ে ঐকমত্য প্রয়োজন ;

ক) নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি যারা নতুন মন্ত্রী সভা গঠন করবেন এবং তাদের মধ্যে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তার নাম নির্ধারণ ;

খ) নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার কখন থেকে কাজ শুরু করবে তার তারিখ নির্ধারণ ;

গ) সংসদ বাতিলের তারিখ নির্ধারণ ;

ঘ) নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ ;

এই প্রস্তাবনা পেশের ১দিন পর ২ আগষ্ট (১৯৯৫) এক সংবাদ সম্মেলনে গণফোরাম সভাপতি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডঃ কামাল হোসেন বলেন, " ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের দেয়া ফর্মূলা মতোই সাংবিধানিকভাবে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান সম্ভব।" [১৩৭] ৩ আগষ্ট ব্রিটিশ হাই কমিশনার পিটার জে, ফাউলার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "ইশতিয়াক ফর্মূলা বাংলা দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান দিতে পারে।" [১৩৮] ৫ আগষ্ট ১৯৯৫ বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করার জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু ৬ আগষ্ট আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২৮ ডিসেম্বর (১৯৯৪) ঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে, অন্য কোন ফর্মূলা বা প্রস্তাব বিবেচনা করবে না। এ ছাড়াও উক্ত বৈঠকে উপনির্বাচন প্রতিহত করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদের প্রস্তাবিত ফর্মূলার ভিত্তিতে সংকটের সমাধান বিরোধী দল আগ্রহী নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট কলাম লেখক ফয়েজ আহমদ তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন, " বেগম খালেদা জিয়া যখনই বলেছেন তিনি নির্বাচনের পূর্বে পদত্যাগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখনই এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই রাজনৈততক সংকট মিমাংসার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়নি। অপর দিকে বিরোধী দলের প্রধান নেত্রী শেখ হাসিনা মিমাংসারই কথা বলেছেন তবে তার শর্তে।" [১৩৯]

৮ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা আজকের কাগজের সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, "প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে আগামী সংসদে তাকে বৈধতা দিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানলে সরকারের পতন অনিবার্য।" পরবর্তী সংসদে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা না দেয়া হলে সাংবিধানিক সংকট সৃস্টি হবে কিনা ? এ প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন, "কেন বৈধতা দেয়া হবে না, এ ব্যাপারে ঐকমত্য হতে হবে। সকলে একমত হয়ে নির্বাচন করলে পরবর্তীতে একাদশ সংশোধনীর মতো একটা সংশোধন তেমন সমস্যা সৃষ্টি করবেনা।"[১৪০] বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এই 'পরবর্তী সংসদে বৈধতা দেয়া' বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিনি উক্ত সাক্ষাৎকারে '৯১ এর প্রসঙ্গ এনেছেন। '৯১ এ যা হয়েছে তা '৯৬ এ নির্বাচিত সকল দলই এ বৈধতা দানে অর্থাৎ সংবিধান সংশোধনে রাজী হবেন এমন গ্যারান্টি কিভাবে দিলেন। যেখানে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হচ্ছে না সেখানে পরবর্তী সংসদে ঐকমত্য কিভাবে হবে। তাছাড়া প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বিএনপি ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলের আন্দোলনের শরীক অন্যান্য দল ভবিষ্যত সংবিধান সংশোধনে ঐকমত্য হলেও বিএনপি যদি এর সাথে একমত না হয় তখন কি হবে। এক্ষানব্বইয়ের প্রসঙ্গেও যদি আসি তাহলে দেখা যাবে ১৯৯০ সালের তিন জোটের রূপ রেখায় আন্দোলনে শরিক ৩টি জোটই ওয়াদাবদ্ধ ছিল। ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টি বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী সরকারকে বৈধতা দেয়ার কোন ওয়াদা করেন নাই। অর্থাৎ তিন জোটের রূপ রেখার সাথে তারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ফলে পরবর্তীতে একাদশ সংশোধনীতে জাতীয় পার্টি সমর্থন দেয় নাই। কাজেই ১৯৯৫ এ বিএনপি'র প্রতিপক্ষ অন্যান্য বিরোধীদল। বিএনপি যেহেতু বিরোধী দলের দাবী তত্ত্বাবধায়ক Concept মানছেনা সে ক্ষেত্রে তারা শেখ হাসিনার দাবি অনুযায়ী পরবর্তীতে সংসদে বিরোধী দলের প্রস্তাবিত সরকারকে কেন বৈধতা দিবে। শেখ হাসিনা আন্দোলনে শরিক দলগুলোর দায়িত্ব নিতে পারেন কিন্তু বিএনপি'র দায়িত্ব নিবেন কিভাবে। বাস্তব অবস্থা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলেও দেখা যাবে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদকে বাদ দিয়ে ৭ম জাতীয় সংসদকে যদি বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় পরবর্তী সংসদ মনে করি, সেখানে ঐ সংসদে বিএনপি ১১৬টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আওয়ামী লীগ তো নয়ই বিএনপি ব্যতীত অন্য সকল দল ঐকবদ্ধ হয়েও ও সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ছিল না। বিএনপি যদি বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ না করে বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী কেবল পদত্যাগ করে নির্বাচনে যেতেন তা হলে পরবর্তীতে সাংবিধানিক সংকট অনিবার্য ছিল। কারণ বিএনপি যদি '৯১ এর জাতীয় পার্টির মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বৈধতা দানে বিরত থাকতেন তা হলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আরোহন কি সম্ভব ছিল ? কারণ বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী অসাংবিধানিক ভাবে গঠিতব্য সরকার বৈধতা না পেলে নির্বাচন অবৈধ হয়ে যেত এবং সাংবিধানিক শূন্যতা বিরাজ করতো। ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ ও প্রেস ক্লাবের গোল টেবিল বৈঠকে বলে ছিলেন, "সংবিধান রেটিফিকেশনের বিষয়টি যত সহজেই বলেছেন বিষয়টি এত সহজ কাজ নয়"। কাজেই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ না হলে সংবিধানিক

Dhaka University Institutional Repository

সংকট অপরিহার্য হয়ে দেখা দিত। কাজেই বিরোধী দলের নেত্রী যে ঐকমত্যের কথা বলেছেন, সেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে যদি রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে রাজনৈতিক দলসমূহ আন্তরিক হতেন তা হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করতো। রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতো। এ প্রসঙ্গে ফয়েজ আহমেদ অন্য এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন " জনগণের নিস্পৃহা বা উৎকণ্ঠা নেতৃবর্গকে তেমন কোন স্পর্শ করে না। তবুও অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বিবদমান পক্ষ দু'টির সদিচ্ছা থাকলে এবং পরস্পরের ছাড় দেয়ার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হলেও রাজনৈতিক কৌশলের দৃষ্টিতে এই সমস্যার সমাধান দুরূহ নয় বরং বলা যেতে পারে সংকটের মূল সূত্রটি কোথায়"।[১৪১] রাজনৈতিক সংকট সমাধানে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের উদ্যোগের পর কূটনৈতিক পর্যায় থেকেও বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু কোন উদ্যোগই সফল হতে পারে নাই। তবে এর পর রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিএনপি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিএনপি'র বিকল্প প্রস্তাব ঃ

৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে বিএনপি'র পক্ষ থেকে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক, নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রী সভা সহ পদ্যাগ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি ঐ ত্রিশ দিন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে সচিবদের দ্বারা দেশ চালাবেন। এই ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনায় সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিএনপি'র পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ও বাম ফ্রন্টকে দেয়া হয়। বাম ফ্রন্ট এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করলেও আওয়ামী লীগ এই প্রস্ততাবে আগ্রহী নয়। যদিও এ বছরের শুরুতে (১০ জানুয়ারী, ১৯৯৫) আওয়ামী লীগ এই ধরনের একটি প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাব মেনে নিতে ইচ্ছুক নয়। ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সভায় সরকারী দলের এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করা হয়। তবে এই প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রী পরিষদ পদত্যাগ করলেও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী পরিষদ স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। এই প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী পরিষদের কোনো উত্তরাধিকারের কথা বলা হয়নি সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের দায়িত্ব থেকে নিবৃত করা যাবে কিভাবে তা প্রস্তাবে বলা হয়নি।

পুনঃ কূটনৈতিক উদ্যোগ ঃ

৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আসন সমুহ শূন্য ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট মহাসংকটে রূপ নিয়েছে। উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সংকট সমাধানের যে উদ্যোগ ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ নিয়ে ছিলেন সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক বৃন্দ দেশের আইনজ্ঞ এবং রাজনীতি বিদদের সাথে আলাপ আলোচনার পর ১ অক্টোবর (১৯৯৫) একটি প্রস্তাব পেশ করেন। অবশ্য কূটনৈতিকদের এই প্রস্তাবের পূর্বে গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি মার্কিন দুতাবাস সহ কয়েকটি দেশের উর্ধ্বতন কূটনৈতিকদের সাথেও আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। যদিও তার উদ্যোগ ব্যক্তি পর্যায় ছিল কোন আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ছিলনা। ডঃ ইউনুসের উদ্যোগ সফল না হলেও কূটনৈতিক বৃন্দ বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় সংকট নিরসনের যে প্রস্তাবটি পেশ করেন তা হল ঃ [১৪২]

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রধানমন্ত্রী আগামী সংসদ নির্বাচন একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অধীনে হবে, এরকম ঘোষণা দেবেন।

২. এরপর নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির নাম চুড়ান্ত করার জন্যে সরকারী ও বিরোধী দল আলোচানায় বসবে এবং নাম চুড়ান্ত করবে।

৩. সর্ব সম্মত ঐ মনোনীত ব্যক্তি শূন্য ঘোষিত যে কোন একটি সর্বসম্মত আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবেন এবং নির্বাচিত হবেন।

৪. তার নির্বাচন এবং সাংসদ হিসেবে শপথ গ্রহনের পর প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে দেবেন।

৫. সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন।

৬. রাষ্ট্রপতি উত্তরাধিকারের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব পালন করে যেতে অনুরোধ করবেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন।

৭. রাষ্ট্রপতি তখন সর্বসম্মতিভাবে উপনির্বাচনে নির্বাচিত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

৮. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কোনো মন্ত্রী পরিষদ থাকবেনা তবে সকল রাজনৈতিক দলের মনোনীত একটি উপদেষ্টা মন্ডলী থাকবে।

৯. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো সময় সীমা থাকবে না, ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের পর তার দায়িত্ব পালন শেষ হবে।

১০। সরকার ও বিরোধী দল আলোচনায় সুবিধাজনক যে কোন প্রস্তাব পরিবর্তন করবে।

কূটনৈতিকদের এ প্রস্তাব ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদের প্রদত্ত ফর্মূলার মত হলেও ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের প্রস্তাব থেকে এই প্রস্তাবের পার্থক্য হলো, এ প্রস্তাবে কেবল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, উপদেষ্টা বা মন্ত্রী পরিষদের কথা বলা হয়নি তবে সকল দলের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা মন্ডলীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এই প্রস্তাবে অর্ন্তবর্তী সরকারের কোন সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচিত (Elected) প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়। এ প্রস্তাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে তার দায়িত্ব থেকে কিভাবে নিবৃত করা হবে সে ব্যাপারেও বলা হয়েছে। ফলে এই প্রস্তাবটি সংকট সমাধানের একটি উপযুক্ত প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সরকার এবং বিরোধী দলকে এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি স্থানে একত্রিত করা সম্ভব হয় নাই বিধায় এ প্রস্তাব ও ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। সংকট সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ ও ফর্মূলা ব্যর্থতা প্রসংগে আজকের কাগজ ৭ অক্টোবর (১৯৯৫) সংখ্যার এক প্রতিবেদনে দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানে বিগত ১৮ মাসে ১১টি উদ্যোগ ১৫টি ফর্মূলা দেয়া হয়েছিল কিন্তু ফলাফল শূন্য।

পাঁচ বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধনের ইতোপূর্বেকার যে সমস্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো তার সবগুলোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে দেশের প্রখ্যাত ৫জন বুদ্ধিজীবী সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাবেক বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের নেতৃত্বে অন্যান্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী গণ হলেন, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহম্মেদ, সাবেক কুটনীতিক ফখরুদ্দিন আহমেদ এবং লেখক কলামিষ্ট ফয়েজ আহমেদ। এই পাঁচজন বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কয়েক দফা বৈঠক করে সংকট সমাধানের উপায় খুঁজেন এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। উল্লেখিত

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিজীবীগণ ৯ অক্টোবর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে সংকট সমাধানের প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এবং সংকট সমাধানের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বুদ্ধিজীবীগণ ১৪ অক্টোবর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে এক বৈঠক করেন কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী তাদের ঘোষিত রূপ রেখা অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবেন না বলে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেন। ১৬ অক্টোবর বুদ্ধিজীবীগণ পুনরায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বুদ্ধিজীবীকে বলেন, "আমার পদত্যাগের পর বিএনপি'র একজন মনোনীত সংসদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হবেন।"[১৪৩] প্রধানমন্ত্রী আরও জানান যে, যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনে একজন 'টেকনোক্র্যাট' মন্ত্রী নিযুক্ত করতে ও রাজি আছেন। এরপর বুদ্ধিজীবীগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি খুজেন। তাদের ধারণা একজন সর্বসম্মত নিরপেক্ষ নির্দলীয় ব্যক্তির সন্ধান মিললেই সংকটের সমাধান সহজ হবে। কিন্তু সমস্যা হল বিরোধী দলের সংসদে প্রতিনিধিত্ব না থাকা। সংসদে কেবল মাত্র সরকারী দলের প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোন দলের প্রতিনিধি ছিলো না। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান যিনি হবেন, সাংবিধানিকভাবে তাকে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে ব্যারিষ্টার ইশতিয়াকের ফর্মুলা অনুযায়ী এ সংকটের সমাধান নিহিত রয়েছে। ১ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের সাথে তৃতীয় বৈঠকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে বিরোধী দল আলোচনার টেবিলে এসে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেন, তা হলেও তা বিবেচনা করবেন এবং সেই অনুযায়ী আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকের ১ দিন পর ২ নভেম্বর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতির নাম প্রস্তাব করেন। উক্ত বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেত্রী সরকারের কাছে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম আহবান করেন। বিরোধী দলের প্রস্তাবিত প্রধান বিচারপতি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করার অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য যে, ২৫ অক্টোবর (১৯৯৫) ৫ জন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ, কে, এম সাদেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন কমিশনকে আরও স্বাধীন ও শক্তিশালী করা যায়, যার মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ করেন। সুপারিশের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনের দপ্তর থেকে সরাসরি নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের কথা ও বলা হয়েছে। এছাড়াও আরও অধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এবং সরকারী এবং বিরোধী দলের জন্য রেডিও এবং টেলিভিশনে সমান সুযোগ দেয়ার কথাও সুপারিশে বলা হয়।

অবশেষে ৯ নভেম্বর (১৯৯৫) পাঁচজন বুদ্ধিজীবী নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে শেষে তাদের উদ্যোগকে স্থগিত রাখেন কারণ রাজনৈতিক সংকটের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'পক্ষকে এ টেবিলে আনা সম্ভব না এ সংকটের সমাধান করা সম্ভব। সরকার চায় সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় সংকট সমাধানের ; অন্য দিকে বিরোধী দল চায় সংবিধানের বাইরে তাদের প্রস্তাবিত ফর্মূলা অনুযায়ী যার ফলে সংকট যেই তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই থেকে গেল।

রাজনৈতিক সংকট নিরসনে বেগম জিয়া - শেখ হাসিনা পত্র বিনিময় ঃ

বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন যখন তুঙ্গে। সংকট সমাধানের সকল উদ্যোগ ব্যার্থ হলে বাংলাদেশের এই চরম রাজনৈতিক সংকটের মুখে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উপলব্ধি করে গণতন্ত্র রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংকট সমাধানের লক্ষ্যে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী সর্ব প্রথম পত্রের মাধ্যমে বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ

Dhaka University Institutional Repository

হাসিনাকে পত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের আহবান জানান। এই সূত্রে প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে কয়েকটি পত্র বিনিময় হয়েছে। যদিও এ পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে সংকটের সমাধান হয়নি তবে এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংকট সমাধানের সদিচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

২৮ অক্টোবর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে পত্র দিয়েছেন। ৩০ অক্টোবর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তর দেন। চিঠিতে শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নীগিতভাবে মেনে নিতে ও আলোচনার বিষয় বস্তু পূর্বেই ঠিক করার আহবান জানান। এছাড়াও বিরোধী দলীয় নেত্রী এ পত্রের মাধ্যমে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির ও আহবান জানান। শেখ হাসিনার ৩১ অক্টোবরের চিঠির জবাবে প্রধানমন্ত্রী ২ নভেম্বর (১৯৯৫) তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে রাজনৈতিক দ্বন্ধ পরিহার করে সংকট সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রীর আলোচ্য সূচি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, "আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্যাই যেহেতু এই মুহূর্তে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা, সেহেতু এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান "- কে আলোচ্য হিসাবে গ্রহণ করি। [১৪৪] এছাড়াও আলোচনার টেবিলে উভয় পক্ষের যে কোন বিষয় সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় সুযোগ থাকবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। (সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা প্রধানমন্ত্রীর এ দ্বিতীয় চিঠিটি পরিশিষ্ট-১ এ উল্লেখ করা হল।)

প্রধান মন্ত্রীর এ দ্বিতীয় চিঠির প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে আলোচনা করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "প্রধানমন্ত্রী অর্থপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সংকটের সমাধান চায় না, আন্দোলনকে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এ সব চিঠি লেখা হচ্ছে"[১৪৫] ৪ নভেম্বর (১৯৯৫) শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর জবাব পাঠিয়েছেন। শেখ হাসিনা তার দ্বিতীয় চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, " আমার ৩০শে অক্টোবর তারিখের পত্রে আমি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনষ্ঠানের বিষয়টি নীতিগত ভাবে গ্রহণ করে আলোচনা বসার পরিবেশ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, আপনি এই পত্রে সে মূল বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করেননি"। আলোচ্যসূচি ও তত্ত্বাবায়ক সরকারের দাবি সম্পর্কে পূর্নব্যক্ত করে শেখ হাসিনা উক্ত চিঠিতে আর ও উল্লেখ করেন যে ,"আলোচ্যসূচি পূর্বেই স্থির না করলে আমরা শুরুতেই অহেতুক তিক্ত বিতর্কে জড়িয়ে পরতে পারি। এমন একটা অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যেই আলোচ্য সূচি সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্ধ নিরসন করেই আমাদের আলোচনায় বসতে হবে। পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব ব্যতীত সমঝোতা হয় না । কিন্তু প্রাথমিক পদক্ষেপ গুলোর বিষয়ে অবশ্যই একমত হতে হবে" ।[১৪৬] উক্ত চিঠিতে আওয়ামী লীগ প্রধান নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীতিগত ভাবে মেনে নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর এ চিঠি প্রথম চিঠির উত্তরেরই পুনরুক্তি। তিনি এ চিঠিতে নতুন কিছুই উল্লেখ করেননি । বিরোধী দলীয় নেত্রীর দ্বিতীয় চিঠির প্রেক্ষিতে ১২ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনার কাছে তৃতীয় চিঠি পাঠিয়েছে। বেগম জিয়া তার তৃতীয় চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমার ও আপনার লিখিত পত্রের মূল বিষয় ছিল আসন্ন তৃতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তি পূর্ণ করাার পথে কোন অন্তরায় থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে দুর করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের পবিত্র রক্তে অর্জিত গণতন্ত্রকে আরও সংহত করা আমার পত্রে এ ব্যাপারে আমার সম্মতি ও আন্তরিক আগ্রহের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী পুনরায় ব্যক্ত করেন যে," আসুন আমরা বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনায় বসি। আপনারা বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কিত যে কোন বিষয় আলোচ্যসূচি হিসেবে

উত্থাপন করতে পারেন। তবে অর্থবহ আলোচনার স্বার্থে পূর্বশর্ত আরোপ করা সঠিক হবেনা।" [১৪৭] প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠির পর বিরোধী দলের কাছ থেকে আপাত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলের পক্ষথেকে আলোচনায় আসার কোন সদিচ্ছা ছিল না। কেননা প্রধানমন্ত্রী তার চিঠিতে বিরোধী দলের মূল দাবি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার দ্বিতীয় চিঠিতে যেখানে স্পষ্টভাবে" আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান "- কে আলোচ্যসূচি হিসেবে গ্রহন করার কথা বলে ছিলেন । কাজেই বিরোধী দল আসন্ন সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে আলোচনা করতে পারতেন। সরকারী তরফ থেকে এ কথা কখন ও বলা হয়নি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়ে আলোচনা করা যাবেনা । বিরোধী দল পূর্বশর্ত আরোপ করে আলোচনায় যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভের পর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী যখন ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করছিল তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন পূর্ব শর্ত ছাড়াই ইয়াহিয়া খান ও পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আলোচনার টেবিলে বসেছেন। এমনকি আলোচনার কোন অগ্রগতি না হওয়া সত্ত্বেও আলোচনা চালিয়ে গেছেন। তাছাড়া সমঝোতার লক্ষ্যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর হঠাৎ আক্রমন করে। যার পরিনতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই বঙ্গবন্ধুরই কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আলোচনায় অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টির আশংকায় আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। বিএনপি একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলের দাবির প্রেক্ষিতে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলো। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ২১ নভেম্বর (১৯৯৫) জাতীয় সরকার গঠনের আহবান করেন এবং সর্বোপরি ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতিকে ৫ম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ১ দিন পর ২৬ নভেম্বর বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর তৃতীয় চিঠি প্রেরণ করেন। উক্ত চিঠিতে বিরোধী দলীয় নেত্রী সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ৫ম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ায় বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত চিঠিতে তিনি রাষ্ট্রপতিকে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের পরামর্শ দেয়ার অনুরোধ করেন।

২ ডিসেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে সংকট নিরসনের প্রচেষ্টা হিসেবে তাঁর চতুর্থ এবং শেষ চিঠি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর চতুর্থ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, "বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মত বিনিময় করার জন্যেই আমি বারবার আপনাকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়েছি। আলোচনায় বসে যুক্তি ও সংবিধান অনুযায়ী আমরা যে সমঝোতায় উপনীত হবো তা বাস্তবায়নের জন্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।" তিনি উক্ত চিঠিতে আরও উল্লেখ করেন যে, "আপনার ও জানা আছে যে, শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রস্তাব করেছিলাম। আমরাই বিরোধী দলের সমান সংখ্যক সংসদ সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় নির্বাচন কালীন সময়ের জন্যে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে ছিলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানিয়েছি। এর কোনোটাই আমার ক্ষমতা দীর্ঘতর করার ইচ্ছা প্রমান করে না।" [১৪৮] এছাড়া উক্ত চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনের আহবান জানান। কিন্তু রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্যে বিরোধী দল আলাপ আলোচনায় রাজী হলেন না। দু'নেত্রীর পত্র বিনিময় থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে দু'দলের মত পার্থক্য খুব বেশী ছিলনা। প্রধানমন্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁর সদিচ্ছার প্রমান দিয়েছেন। কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবি থেকে একচুল পরিমানও ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী তার চিঠিতে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে যে কোন বিষয়ে আলোচনার কথা বলে ছিলেন। এমতাবস্তায় আলোচনার টেবিলে যদি দু'পক্ষ আসতেন তা হলে সংকটের অবশ্যই সমাধান হতো বলে আমার বিশ্বাস। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। যেহেতু উভয়েরই লক্ষ্য একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। তবে দৃষ্টিভঙ্গি একটু ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন বর্তমান সংবিধানের আওতায় সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রীর দাবি বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় সম্ভব ছিলো না। যদি উপনির্বাচনে বিরোধী দল অংশ গ্রহণে রাজী হতো তা হলেই বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্ভব ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পূর্বে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২১ নভেম্বর (১৯৯৫) উপনির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করে ছিলেন। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, " আমি মনে করি বর্তমান বিরাজমান সমস্যা সমাধানের এখনো পথ আছে এবং সাংবিধানিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। আমি আবার বিরোধী দল গুলোকে আহবান জানাই যে, আসুন আমরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য। বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, " কিন্তু বিরোধী দল গুলো যদি উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণে রাজি না হয়, সমঝোতার স্বার্থেও এটা না করে তা হলে আমি রাষ্ট্রপতিকে উপযুক্ত সময়ে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অনুরোধ করবো। এ ক্ষেত্রে আর উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, " সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় উপনির্বাচন অত্যাসন্ন এবং জাতীয় সংসদের সময় ও এসে গেছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দু'টো নির্বাচন করা খুবই কষ্ট সাধ্য। তিনি আরও বলেন, " এছাড়াও উপনির্বাচনের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হবেন অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাদের জাতীয় নির্বাচন মোকাবেলা করতে হবে। এ জটিলতা কারো প্রত্যাশিত নয়। এসব কারণে আগেই বলা হয়েছে যে, বিএনপি উপনির্বাচনে আগ্রহী নয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলো উপনির্বাচনের সুযোগ নিতে পারে।" সর্বশেষে তিনি বিবৃতিতে বলেন, " সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব উপনির্বাচনও নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা এবং এর আয়োজন করা। যে কোনো সময় কমিশন উপনির্বাচন ঘোষণা করবে।" [১৪৯] প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সরকারের আহবানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ২১ নভেম্বর রাতে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, " জাতীয় সরকার জনগণের দাবি নয় এবং এটা সংবিধানেও নেই। জাতীয় সরকার যদি প্রধানমন্ত্রী করতে চান তা হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আপত্তি কোথায়"। [১৫০] তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা জাতীয় সরকারের প্রধান কে হবেন সেটিই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। কারণ জাতীয় সরকারের প্রধান ব্যক্তি যদি কোন দলের না হন এবং তিনি যদি সংসদ সদস্য হন তাহলে জাতীয় সরকারকেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বলা যায় এবং সেক্ষেত্রে ঐ সরকার সাংবিধানিক সরকার হবে। জাতীয় সরকারের ধারণা সংবিধানে নেই সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ সংবিধানে বলা হয়েছে যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তাকে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কোন দলের হবেন কিংবা কোন দলের হতে পারবেন না এমন কথা সংবিধানে বলা নাই। কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের প্রতি যদি সকল সংসদের সমর্থন থাকেন তা হলে তাকে অ-সাংবিধানিক বলা যাবে কিভাবে। বরং বিরোধী দল সংবিধান সংশোধন ব্যতিরেকে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলেছেন তা অসাংবিধানিক। একই দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ কালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ. কে. এম সাদেক বলেন, "এখন তিনটি বিকল্প

Dhaka University Institutional Repository

আছে, উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে উপনির্বাচন করে সংকটের সমাধান ; দ্বিতীয়ত ; সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন, আর তা না হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে আমাদের উপনির্বাচন করতেই হবে। আমি রাজনীতিকদের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি, অপেক্ষা করছি প্রথম দু'টি বিকল্পের কিছু হয় কিনা।"[১৫১] কিন্তু রাজনীতিবিদরা কোন সমঝোতায় না পৌঁছাতে পারায় নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ঘ) উপনির্বাচনের প্রস্তুতি ও ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করেন। ২০ জুন (১৯৯৫) থেকে বিরোধী দলের আসন সমূহ শূন্য হওয়ার পর সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আছে। সেই অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) মধ্যে উপনির্বাচনের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন ৯ আগষ্ট (১৯৯৫) বন্যাজনিত দৈবদুর্বিপাকের কারণে সংবিধানের ১২৩(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিরোধী দলের শুন্য আসন গুলোর উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময় সীমা আরও ৯০ দিন বৃদ্ধি করেন। এই বর্ধিত সময় সীমা অনুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর (১৯৯৫) এর মধ্যে জাতীয় সংসদের শূন্য ১৪৫টি আসনের নির্বাচন সম্পন্ন করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। বন্যাপরিস্থিতির উন্নতির পর ও নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নাই, কারণ নির্বাচন কমিশন আশা করে ছিলেন রাজনীতিবিদরা সংকটের সমাধান করলে ১৪৫টি আসনের উপনির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২১ নভেম্বর সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারেও এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারের ১দিন পর ২২ নভেম্বর নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের ১৪৫টি শূন্য আসনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত সময় সূচি অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর(১৯৯৫) উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। এছাড়াও নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী ২৪ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র দাখিল, ২৫ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র বাছাই এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয় ২৯ নভেম্বর। উপনির্বাচনের এ তফসিল ঘোষণা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, "নির্বাচন কমিশন বন্যা জনিত দৈবদুর্বিপাকের কারণে জাতীয় সংসদের শুন্য ঘোষিত আসন গুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ৯০ দিন বর্ধিত করে। তবে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির পরপরই দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই নির্বাচন কমিশন শূন্য আসনগুলোতে নির্বাচনের তফসিল এ যাবত ঘোষণা করেনি। কিন্তু সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদের শুন্য আসন গুলোর নির্বাচন আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় নির্বাচন কমিশন ১৪৫টি নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচনের জন্যে এসময় সূচি ঘোষণা করেছে।"[১৫২] সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সময় সীমার সর্ব শেষ প্রান্তে এসে নির্বাচন কমিশন এ তফসিল ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের এ তফসিল ঘোষণা আনুষ্ঠানিকতা ছিল মাত্র। কেননা এমনি পরিস্থিতিতে সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন কেহই এই ভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহী নয়। প্রধানমন্ত্রী ২১ নভেম্বর এক বিবৃতিতে এ কথা স্পষ্ট করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপনির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিনই ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংবিধানের ৫৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পরামর্শ দেন। সংবিধানের ৫৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্যকোন সংসদ সদস্যের সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।" [১৫৩] প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশের পরপরই রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৫ মাস পূর্বেই ভেংগে দিলেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে কোন সংসদই তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে নাই। তবে পঞ্চম জাতীয় সংসদই বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম সংসদ হিসেবে কার্য-পালন করেছে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে। বিরোধী দলের ১৪৫ টি আসন শূন্য হওয়ার প্রেক্ষিতে চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থার মুখে ৪ বছর ৭ মাস ২০ দিনের মাথায় এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্ত হলো। ২২টি অধিবেশনের মাধ্যমে এ সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ৪০০ দিন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ফলে চলমান রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি সাংবিধানিক সংকট যুক্ত হলো। তবে এর ফলে সংকট সমাধানের সমঝোতার লক্ষ্যে আরও কিছু দিন সময় পাওয়া গেল। ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির ফলে নির্বাচন কমিশনকে ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) এর মধ্যে অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে নতুন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। ২৪ নভেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পূর্ব মুহূর্তে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রেক্ষিতে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের ও বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে, "১৯৯৩ সালে তিনটি বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিনটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা এবং তাদের মধ্যে কোন ঐকমত্য ও ছিলনা। বিরোধী দলের সংসদ বয়কট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বিরোধী দল সমূহ যদি সংসদ বয়কট না করে জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন তাহলে সংকটের সমাধান সম্ভব হতো। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ১৯৯০ এবং ১৯৯৫ এর প্রেক্ষাপট এক নয় বলে উল্লেখ করেন যে, ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকায় তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে সাংবিধানিক ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সম্ভব হয়ে ছিলো। কিন্তু ১৯৯৫ সালে সংসদীয় সরকার বজায় থাকায় সাংবিধানিক কাঠামোয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতিবাচক আন্দোলনের সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সংকট সমাধানের জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে পত্রের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা ভিত্তিতে সংকট সমাধানের অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী পূর্বশর্ত দিয়ে আলোচনায় যেতে অস্বীকার করেন। ফলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার পথ রুদ্ধ হলো। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, " আমরা আন্তরিকভাবেই অর্জিত গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য অবাধ, শান্তিপূর্ণ, সন্ত্রাস মুক্ত ও কারচুপিবিহীন নির্বাচন চাই। যে কোন সরকার কিংবা সরকার বিরোধী কোন শক্তি যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য ইতিমধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনকে অনেক বেশী শক্তিশালী করা হয়েছে। নির্বাচন পদ্ধতি উন্নত করা হয়েছে। এখন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন থেকেই নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন হবেন। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন যখন যে সহযোগিতা চাইবে- তা প্রদান করা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জালভোট নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ভোটার রেজিষ্ট্রেশন সহ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যবস্থার অধীনে জনগণ নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।" গণতন্ত্র ও সংবিধান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " জনগণের অধিকার ও স্বার্থের রক্ষাকবচ হলো গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হলো সংবিধান। জনগণের পক্ষের শক্তি বলেই আমরা গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপোষহীন, সংবিধানের মর্যদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এ ব্যাপারে আমাদের প্রতি আপনাদের পূর্ণ সমর্থন ও আস্থা রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার চেয়ে আপনাদের আবস্থা, সমর্থন ও ভালবাসার মূল্য আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে অনেক বেশী। আর সে কারণেই অতীতে ও যেমন ক্ষমতার লোভে কারও সাথে আতাঁত কিংবা আপোষ করিনি, এখনও কোন অন্যায় অসাংবিধানিক দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে পারিনা"।[১৫৪] উক্ত ভাষণে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এবং বিরোধী দল সমূহ উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে রাজি না হওয়ার কারণে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাষ্ট্রপতিকে ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী এ আশাবাদ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, সংবিধানের বাইরে তিনি কোন কিছু করবেন না। প্রধানমন্ত্রীর এ ভাষণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি অবিচল আস্থা ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখতে প্রধানমন্ত্রীর আর কোন বিকল্প ছিল না।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সর্ব শেষ প্রয়াস ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মহল থেকে জোর প্রচেষ্টা চলে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রয়াস হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রদুত ডেভিড এন মেরিল সরকার এবং বিরোধী দলের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রদুত আশাবাদ ব্যাক্ত করেন যে, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়। ২৯ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট এর এক বক্তব্যে বলা হয়, "that the U.S. Government would Continue to urge both the leaders of Bangldesh to resolve their differences so that free, fair and fully contested election could be help peacefully.[১৫৫]" যুক্ত রাষ্ট্রের উক্ত বক্তব্যে আশাবাদ ব্যাক্ত করা হয় যে, "The Government and the opposition in Bangladesh would demonstrate " creativity and flexibility to overcome a lengthly political statemate that threatened demoe ratic process and undermined economic program" [১৫৬]

২৭ নভেম্বর (১৯৯৫) আজকের কাগজে প্রকাশিত কূটনৈতিকদের প্রচেষ্টায় সর্বশেষ সমঝোতার রূপ রেখায় বলা হয়েছে ঃ

" প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন এবং মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেবেন। এরপর রাষ্ট্রপতি তাঁকে দায়িত্ব অব্যাহত রাখার জন্যে অনুরোধ করবেন। প্রধানমন্ত্রী সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন। এরপর রাষ্ট্রপতি তাঁর করণীয় নির্ধারণের জন্যে সর্বদলীয় বৈঠক আহবান করবেন। এ বৈঠকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দলীয় উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করবেন। এরপর বিষয়টির সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করার জন্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে একটি রেফারেন্স পাঠাবেন। এর মধ্যে বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হবে। সকল রাজনৈতিক দলের অনুরোধে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম. এ. সাদেক পদত্যাগ করবেন।" [১৫৭] এই সমঝোতা প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার ১দিন পর ১৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি পূর্ণ নয় বলে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে ১ ডিসেম্বর (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে বলেন, "বিরোধীদল যদি আরোচনার টেবিলে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে রাজি হয় এবং এটা যদি সংবিধানের মধ্যে হয় তা হলে এতে আমার আপত্তি নেই"।[১৫৮] অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সাংবিধানিক কাঠামোয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে রাজি ছিলেন। এর পূর্বে ২৬ নভেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এক টেলিফোন সংলাপে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী কে পদত্যাগের অনুরোধ করেন এবং রাষ্ট্রপতিকে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সরকার গঠনের সুপারিশ করতে বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রীর এ আহবান নাকচ করে দেন এবং তিনি শেখ হাসিনাকে পুনরায় আলোচনায় বসার আহবান জানান এবং কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বলেন।

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই ধরনের সরকার গঠনে সাংবিধানিক সমস্যা দেখা দিবে। কারণ রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেবল তাদের নিয়েই করতে পারেন যারা পূর্ববর্তী সংসদের সদস্য ছিলেন। ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পূর্বে ঐ সংসদে কেবল সরকারী দলের এবং সরকার সমর্থক অন্যান্য নির্দলীয় ও দলছুট কিছু সংসদ ছাড়া বিরোধী দলের কোন সংসদ সদস্য ছিলেননা। কাজেই বিরোধী দল সরকারী দলের সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে রাজি হবেন কেন। তছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সময় থাকবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

৪ ডিসেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বি,বি,সি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, " প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে তিনি তখন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে পারবেন"। তিনি উক্ত সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, " প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করার পরে বিরোধী দল আলোচনায় বসতে পারে। তখন আলোচনা করে ঠিক করতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন।"[১৫৯] কিন্তু আমাদের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা যায় না। তাঁর উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। এ কথা সংবিধানের ৫৭(৩) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে। তাছাড়া উত্তরাধিকারী নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে সাংবিধানিকভাবে। 'দৈনিক ইত্তেফাক'৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যার সম্পাদকীয়তেও বলা হয়েছে, "প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক নির্দলীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্যে রাজনৈতিকদের প্রতি আহবান জানাই।" উক্ত সম্পাদকীয়কে আরও বলা হয়েছে যে, " ক্ষমতার লড়াইতে সবাই মত্ত। কিন্তু বুঝতে হবে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা বিঘ্নিত হলে এই রাজনীতিকদের আপন পূর্বসুরীদের দুর্ভাগ্য বরণ করতে হবে।"[১৬০] ৫ জানুয়ারী (১৯৯৬) গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের রূপ রেখা দিয়ে রেফারেন্স পাঠাতে অনুরোধ করেন। একই দিন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক আহবান জানান। কিন্তু রাষ্ট্রপতির একক কোন ক্ষমতা নেই যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিরোধী দলের উক্ত দাবি পূরণ করতে পারেন। কারণ দ্বাদশ সংশোধনী পাশের পর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি মধ্যস্থতা করতে পারেন মিমাংসার প্রস্তাব ও উদ্যোগ নিতে পারেন কিন্তু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি সংবিধান পরিবর্তন করতে পারেন না, যা কেবল সংসদ সদস্যগণই পারেন।

ঙ) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন '১৯৯৬ ঃ

দেশের সাংবিধানিক ধারা বজায় থাকার লক্ষ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এর মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল সমূহকে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সরকারি দলের তরফ থেকে উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও কুটনৈতিক পর্যায় থেকেও উদ্যোগ নেয়া হয়ে ছিল। রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ তিন বার পরিবর্তন করা হয়। নির্বাচন কমিশন সর্ব প্রথম ৩ ডিসেম্বর (১৯৯৫) ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১৮ জানুয়ারী ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। মনোনয়ন

Dhaka University Institutional Repository

পত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করেন ১৭ ডিসেম্বর (১৯৯৫)। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কমিশনের এক ঘোষণায় বলা হয়,"রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ দেশের জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার কারণে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এর মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আগামী জানুয়ারী মাসের শেষার্ধ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরুর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।"[১৬১] নির্বাচন কমিশন এই তফসিল ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধী দল সমূহ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানান। পক্ষান্তরে তফসিল ঘোষণার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ, কে, এম, সাদেক এবং বিএনপি মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিরোধী দল এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৭২ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করেন। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৯৫) বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "That she was ready to open a dialogue with Begum Khaleda only after her resignation from the position of Prime Ministers"[১৬২] ১৫ ডিসেম্বর (১৯৯৫) নির্বাচন কমিশন চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধান ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গুলোর বৈঠক আহবান করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধান প্রধান বিরোধী দল সমূহ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বৈঠকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামাত বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জাসদ (রব) এর অনুপস্থিতিতে বিএনপি সহ ৬০টি রাজনৈতিক দলের ৮৬ জন প্রতিনিধি অংশগহণ করেন। বৈঠকে অংশ গ্রহণকারী দল সমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ পূনঃ নির্ধারণ করেন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) দ্বিতীয় বারের মত নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু বিরোধী দল তাদের দাবিতে অটল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিবর্তে নির্বাচন প্রতিহত করার কথা বলেন। সেই লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার নির্ধারিত নির্বাচনের তফসিল মোতাবেক নির্বাচনের মনোনয়পত্র দাখিলের সময় ৩ ও ৪ জানুয়ারী (১৯৯৬) ৪৮ ঘন্টা হরতার আহবান করেন। ফলে নির্বাচন কমিশন মনোনয়ন পত্র দাাখিলের শেষ সময় নির্ধারণ করেন ৮ জানুয়ারী (১৯৯৬) কিন্তু ৮ জানুয়ারী (১৯৯৬) নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ তৃতীয় বারের মত নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) নির্ধারণ করেন। নির্বাচনের পরিবর্তিতে তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৭ জানুয়ারী (১৯৯৬)। সরকারী দলের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে কেবল মাত্র সংবিধান রক্ষার জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়। যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে যে কোন কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে একদিকে যেমন সরকারের বৈধতা হারাবে অপর দিকে দেশ একা মহা সাংবিধানিক বিপর্যয়ে পতিত হবে। বিরোধী দল সমূহ নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন (১৭ জানুয়ারী) সকাল সন্ধ্যা হরতাল আহবান করেন। নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ তফসিল ঘোষণা করে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, "সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ৯০ দিন (২১ শে ফেব্রুয়ারী ৯৬) এর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। যেহেতু ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই শহীদ দিবস, ঈদুল-ফিতর, শবেই কদর, এবং জমাতুলবিদা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান রয়েছে। সেহেতু ১৫ ফেব্রুয়ারীর পর কোন অবস্থাতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, তাই ১৫ ফেব্রুয়ারী '৯৬ ভোট গ্রহণের চুড়ান্ত দিন ধার্য করে এই সংশোধিত সময় সূচি ঘোষণা করা হয়।" [১৬৩] কাজেই নির্বাচন কমিশনের এ বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক নির্বাচনের তারিখ আর পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং ঘোষিত তারিখেই নির্বাচন হতে হবে।

নির্বাচনের তফসিলকে সামনে রেখে মনোনয়ন পত্র দাখিলের ১দিন পূর্বে ১৬ জানুয়ারী (১৯৯৬) সরকার এবং বিরাধী দলের সংকট সমাধানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড এন

Dhaka University Institutional Repository

মেকিল, যুক্তরাজ্যের হাই কমিশনার পিটার জে ফাউলার, জাপানের ইয়শিকাজু কেনিকো, কানাডার জন জেস্কট, অষ্ট্রেলিয়ার এম পিনাল ও ইটালির ড ঃ রাফেন মিনিরো এই ৬ জন কুটনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বৈঠক করেন কিন্তু এতে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ব্যতীত নির্বাচনে যেতে অস্বীকার করেন। সরকারী দলের পক্ষ থেকে সংবিধানের আওতায় সর্বোচ্চ ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো। বিরোধী দলের দাবি পূরণ বিএনপির পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিরোধী দলের দাবি পূরণ করতে হলে আনুষ্ঠানিকতা হলেও ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন করতে হবে। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে গণফোরাম নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেছেন, "জনগণকে আস্থায় না এনে আওয়ামী লীগের বর্তমান আন্দোলনে জনগণ ক্ষুদ্ধ। সর্বস্তরের জনগণ তাদের কার্যকলাপে হতাশ এতে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এই আস্থাহীনতা নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর রাজনৈতিক দলের এই ভুলের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা সুযোগ পায়"। তিনি আরও বলেন, " সরকার পতনের বক্তব্য সংসদীয় পদ্ধতির ভাষা নয়।"[১৬৪]

মনোনয়ন পত্র দাখিল ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঃ

নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন ১৭ জানুয়ারী (১৯৯৬) প্রধান প্রধান বিরোধী দল সমূহের নির্বাচন বয়কটের মুখে সরকারী দল বিএনপি সহ ৪১ টি রাজনৈতিক দল ও জোট এবং নির্দলীয় প্রার্থীর পক্ষ থেকে মোট ১৯৮৭ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। এরমধ্য থেকে ১০৮ জনের মনোনয়ন পত্র বাতিল হলে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১৮৭৯ জন। তবে ২৩ জানুয়ারী মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে ৩৬৫ জন মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়ায় ১৫১৪ জন। এর মধ্যে ৪৭ টি আসনে একক প্রার্থী থাকায় ৪৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৭ জনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি আসনসহ দলের শীর্ষ স্থানীয় অধিকাংশ নেতা রয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত উল্লেখ যোগ্য শীর্ষ স্থানীয় বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ হলেন, স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, সংসদ উপনেতা ডাঃ এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মির্জা গোলাম হাফিজ, এস, এম, মোস্তাফিজুর রহমান, মহাসচিব ব্যারিষ্টার আব্দুস সালাম তালুকদার, কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ, এম, শামসুল ইসলাম, আব্দুল মতিন চৌধুরী, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, ব্যারিষ্টার আমিনুল হক, এম, এ, মান্নান, আমান উল্লাহ আমান, আব্দুল হাই, তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী সহ অনেকে। নির্বাচন কমিশন ২৭ জানুয়ারী (১৯৯৬) বিএনপির মোর্শেদ খান, বারিষ্টার নাজমুল হূদা ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নানকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এনিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সাংসদদের সংখ্যা দাড়ায় ৫০ জন। ফলে ২৫০টি আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিএনপি ছাড়া অন্য যে সব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলসমূহ হল, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ফ্রীডম পার্টি, এনডিএ, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল, প্রগশ, ভাষানী, ন্যাপ, সাতদলীয় ঐক্য জোট মুসলীম লীগ, ইউপিপি, খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক সংহতি, জনতা পার্টি, জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ, জাতীয় মুক্তী ঐক্য পরিষদ, কৃষক যুক্তফ্রন্ট, ন্যাপ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং বিএনপির কিছু বিদ্রোহী প্রার্থীও নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার শেষে ১৭ জানুয়ারী বাসসকে দয়া এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, "সরকার একক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে আরও গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা জনমত উপেক্ষা করে নীল নকশা অনুযায়ী এক দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই এক দলীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য জনগণ ভোট কেন্দ্রে যাবে না।"[১৬৫] পক্ষান্তরে ১৯ জানুয়ারী এনডিএ

Dhaka University Institutional Repository

একশব্দ মহাসচিব আনোয়ার জাহিদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনে যাবার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, " নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে দেশকে একটি সরকার বিহীন ভয়াবহ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার খেলায় এনডিএ নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেনা বলেই এনডিএ আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। [১৬৬] ২৩ জানুয়ারী (১৯৯৬) জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও টিভি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই বিএনপি এ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে, দেশবাসী ও সকল রাজনেতিক দলের প্রতি দেশ, গণতন্ত্র ও জনগণের স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানান। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, " এ নির্বাচন গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন।"[১৬৭] উক্ত ভাষণে বিরোধী দলের দাবি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, " ১৯৯৫ সালের ১০ জানুয়ারি বিরোধী দলীয় নেত্রী প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হলে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন। কিন্তু আমরা এতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও তিনি এবং তার সহযোগী দলগুলি নির্বাচনে অংশ নিতে রাজি হলেন না, বরং তাদের একটি দাবি মানতে রাজি হলে তারা অন্য একটি নতুন দাবি উত্থাপন করে থাকে।" [১৬৮] নির্বাচন বর্জনরত ও আন্দোলনরত তিন বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে প্রত্যাখ্যান করেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী এক বিবৃতিতে বিরোধী দল সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যকে মিথ্যাচার বলে আখ্যায়িত করেন। শেখ হাসিনা তার বিবৃতিতে আরও বলেন, "সকল বিরোধী দলকে বাইরে রেখে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর স্বঘোষিত খুনী ও সংবিধান হত্যাকরীদের এবং বহু খুনের দাগি আসামীদের নিয়ে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র হত্যার যে ষড়যন্ত্র করেছেন তাতে দেশবাসীর নিকট তাঁর স্বৈরাচারী চোহরা উন্মোচিত হয়েছে।"[১৬৯] আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দল সমূহের নির্বাচন বর্জন সহ নেতিবাচক আন্দোলন প্রসঙ্গে ২৫ জানুয়ারী (১৯৯৬) সিপিবি'র দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, " সংসদের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রাম পরিচালনার সঠিক কৌশল অবলম্বন না করে আওয়ামী লীগ একাত্তরের ঘাতক জাতীয় শত্রু জামাত এবং গণতন্ত্রের শত্রু পতিত স্বৈরাচার জাতীয় পার্টিকে নিয়ে সংসদ থেকে হটকারীভাবে পদত্যাগকরা সহ এক ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী পথে ঘটনাবলীকে প্রবাহিত করেছে। ফলে সব কিছু এক পরিকল্পিত অচলাবস্থার দিকে ধাবমান হয়েছে এবং সরকারকে এক তরফা নির্বাচন সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিয়েছে।" [১৭০] ২০ জানুয়ারি (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাতে ইসলামী পৃথক পৃথক চিঠিতে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন স্থগিত বা বাতিলের দাবি জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে যে চিঠি দিয়ে ছিলেন, ২৮ জানুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার উত্তরে বলেছেন, নির্বাচন বাতিল বা স্থগিত সম্ভব নয় বলে যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছেন তা হল " একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লংঘন করতে পারে না। ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ায় সংবিধান অনুযায়ী আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ বেঁধে দেয়া সময় সীমার মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নির্বাচন না হলে দেশের যে কোন নাগরিক কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীও যদি কমিশনের বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের দায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে মামলা দায়ের করেন, তাহলে কমিশনের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন আইনী সুযোগ থাকবেনা। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে। সুতরাং বিষয়টি বিরোধী দলের কাছে যত অনভিপ্রেতই হোক না কেন কমিশন অপরিত্যাজ্যভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য। কমিশন কোনভাবেই দেশের সংবিধান এবং অন্যান্য আইন ও বিধি লংঘন করতে পারে না। যদি সব দল নির্বাচনে অংশ না নেয় সে জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করা বাঞ্ছনীয় নয়।"[১৭১] কাজেই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেই বিরোধী দল সমূহের বাধাদান সত্ত্বেও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হচ্ছে। সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশনের এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যা প্রধান নির্বাচন কমিশনের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রী ২৩ জানুয়ারী

Dhaka University Institutional Repository

তার রেডিও টিভি ভাষণে ও সে কথা বলেছেন যে, ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন স্রেফ সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন।

৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) বিএনপি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় মেনিফেস্টো ঘোষণা করেন। উক্ত মেনিফেস্টোর দলীয় কর্মসূচি ছাড়াও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ করে বলা হয়, " নিয়মতান্ত্রিক ভাবে গঠিত গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী চলতে বাধ্য। যে কোন পরিস্থিতিতেই সংবিধান লংঘন করা কোন সরকার কিংবা নাগরিকের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিত ও নয়। সাংবিধানিক শাসন ও গণতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব উভয়কেই ধ্বংস করে। কাজেই গণতন্ত্রের স্বার্থে সাংবিধানিক শাসন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সাংবিধানিক শাসন অব্যাহত রাখতে হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনষ্ঠান করতেই হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদই শুধু প্রয়োজনে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। নির্বাচন বর্জন কিংবা নির্বাচনের বিরোধীতার মাধ্যমে সমস্যাকে জিইয়ে রাখা যায় জটিলতর করা যায়। কিন্তু যে সমস্যার সমাধানের জন্য সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন তেমন কোন সমস্যার সমাধা করা যায় না।"[১৭২] উক্ত মেনিফেস্টো বিএনপি পরবর্তী সংবিধান সংশোধনীর পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন। সংবিধানকে সমুন্নত ও সাংবিধানিক শাসন বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৯ নভেম্বর ১৯৯০ সালে প্রণীত তিন জোটের রূপ রেখার ৪ ধারার (ক) উপ ধারায় বলা হয়েছে, " জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হইবে এবং অসাংবিধানিক কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হইবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভুত কোন পন্থাই কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাইবে না।"।[১৭৩] মজার ব্যাপার হল মাত্র ৫ বছর পর ১৯৯৬ সালে তিন জোটের রূপ রেখার ভিত্তিতে গঠিত সরকারকেই নির্বাচন ব্যতীত ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে তিন জোটেরই শরিক জোট সমূহ নির্বাচন প্রতিহত করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেন। যেখানে তিন জোটের রূপ রেখায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহিঃভূত কোন পন্থায়ই কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না, সেখানে নিজেদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সংবিধানকে উপেক্ষা করে কোন সমঝোতায় না পৌছে দেশকে এবং নির্বাচিত সরকারকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বিরোধী দল জাতির সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী কাজে লিপ্ত রয়েছে। সাংবিধানিক ধারা অক্ষুন্ন রাখতে নিনিয়ানের ফর্মূলা কিংবা ইতিয়াকের ফর্মূলা অনুযায়ী কিংবা সর্বশেষ রাষ্ট্রপতির অধীনে জাতীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত সরকারের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিরোধী দল এ সাংবিধানিক সংকট উত্তরনে সহায়তা করতে পারতো। জাতীয় সরকারের মাধ্যমে গঠিত সংসদে ও বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করতে পারতেন। কিন্তু বিরোধী দল সকল সমঝোতার দ্বার রুদ্ধ করে সরকারকে ঠেলে দিলেন সংঘাতের দিকে।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত যে কোন কর্মসূচি প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সকল কর্মসূচি বাধাদানের লক্ষ্যে যেখানেই প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচী থাকে সেখানেই বিরোধীদল হরতাল পালন করেন। এছাড়াও নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিরোধী দল ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী লাগাতার ৪৮ ঘন্টা সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী হরতালের পাশাপাশি গণকার্ফু জারি করে।

১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের পূর্বে ১২ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্য রেডিও-টিভিতে দেয়া এক নির্বাচনী ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে তার আগ্রহের কথা পুণর্ব্যক্ত করে বলেন, "বিরোধী দল সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে রাজি হয়নি। ভবিষ্যতে নির্বাচনে সব দলের অংশ গ্রহণ করার জন্য এই নির্বাচন।" তিনি উক্ত ভাষণে

Dhaka University Institutional Repository

আরও বলেন, "সাংবিধানিক সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্য এই নির্বাচন করতেই হবে। আলোচনা আগে সফল হয়নি। পরে হতে পারে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সবাইকে নিয়েই নির্বাচন করা যায়।" প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, আপনারা ভোট দিন ধৈর্য ধরুন দেখুন আগামী সংসদে কি করতে পারি।"[১৭৪] প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে কিংবা বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে রাখতে বিএনপি আগ্রহী নয় বরং ভবিষ্যতে সকল দলকে নিয়ে একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই ১৫ ফেব্রুয়ারীর এ নির্বাচন।

নির্বাচনের প্রক্কালে ১৪ ফেব্রুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ. কে.এম. সাদেক জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া রেডিও এবং টেলিভিশনের এক ভাষণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা পুনঃ উল্লেখ করে বলেন, "একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা লংঘন করতে পারে না। এই নির্বাচন না হলে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং গণতন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। বর্ণিত অবস্থায় যত অনভিপ্রেতই হোক না কেন সাংবিধানিক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণেই নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অপরিত্যাজ্যভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য। দেশের আইন ও বিধির মধ্যে থেকে নির্বাচন কমিশন দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করে একাধিকবার উপনির্বাচন এবং সাধারণ নির্বাচনের তফসিল পুনঃ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও সমঝোতা হয়নি। ফলে দেশের সকল দলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। যদিও সকল রাজনৈতিক দলের অংশ গ্রহণের ম্যাধমে নির্বাচন সম্ভব হলে তা আরও সুন্দর হতো।"[১৭৫]

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) বিরোধী দলের ব্যাপক বাধাদান, হরতাল-গণকার্ফূ ও সহিংসতার মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্বাচন প্রতিরোধ সহিংসতার কারণে সকল আসনে সুষ্ঠভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। সহিংসতার কারণে নির্বাচনের দিন ১৩ জন মারা যায়।[১৭৬] এবং আহতের সংখ্যা অনেক। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়। ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে প্রায় ২৫% ভোটার অংশ গ্রহণ করেন। তবে দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকদের ধারণা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি আরও কম ছিল। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন 'বিতর্কিত নির্বাচন' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের দিন এক সাংবাদিক সম্মেললনে তিন বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে কয়েকটি নির্দেশ নামা ঘোষণা করে বলেন, "জনগণ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। এই সরকারের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নেই।"[১৭৭] শেখ হাসিনার মতে জনগণ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করায় সরকার আইনগত ও নৈতিক ভাবে সরকার পরিচালনার অধিকার হারিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি যে সমস্থ নির্দেশ নামা প্রদান করেন তাহল ঃ[১৭৮]

* সাংবিধানিক শূন্যতা দূর করার জন্য প্রশাসন ও আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত করা হোক।
* প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনা করবেন সংশ্লিষ্ট সচিবরা।
* টিএনও, ডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, এমপি, পুলিশ কমিশনাররা সংশ্লিষ্ট সচিবদের দ্বারা পরিচালিত হবেন।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সকল রাজনৈতিক দলকে বৈঠকে বসার আমন্ত্রন জানাতে পারেন।

উল্লেখিত নির্দেশ নামা ছাড়াও নির্বাচন বাতিল এবং সরকারের পদত্যাগের লক্ষ্যে বিরোধী দল ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অসহযোগ কর্মসূচি পালনকালে বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের ফলে অসহযোগ কর্মসূচির মেয়াদ ২ দিন বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ২৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টা পর্যন্ত এ অসহযোগ কর্মসূচি পালিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনোত্তর এক

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, " এই নির্বাচনে যে সব দল অংশ নেয়নি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আলোচনা যতদুর এগিয়ে ছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করতে চাই। আলোচনায় সবাই মিলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই যাতে ভবিষ্যতে সকল দল অংশ গ্রহণ করতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন, "দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য এই নির্বাচনের প্রয়োজন ছিলো।"[১৭৯]

২৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন কমিশন ২০৮ টি আসনের ফলাফল গেজেট প্রকাশ করেন। ১০টি আসনে নির্বাচন হয়নি জানা যায়। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ৫০ টি আসনে বিএনপি'র ৫০ জন শীর্ষস্থানীয় নেতা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বাকী আসন সমূহে আংশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী যে সমস্ত কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে নাই সে সমস্ত আসনে পরবর্তীতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

বিরোধীদল কর্তৃক ইতোপূর্বে ঘোষিত অসহযোগ কর্মসূচীর প্রথম দিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারী তিন দলীয় বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক বিবৃতিতে বলেন, "সরকার সংবিধানের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।"। সংবিধানের ১২৩(৩) (খ) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, "সংবিধান অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ছিল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ও সাংবিধানিক ভাবে অবৈধ ও বেআইনী হয়েছে পড়েছে।"[১৮০] বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এই বিবৃতির মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, সেগুলো হলো ঃ

১. এই বিবৃতির মাধ্যমে তিনি (শেখ হাসিনা) প্রথম বারের মত ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা স্বীকার করলেন।

২. ১৫ ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে সরকার ও নির্বাচন কমিশন কোন ভুল করেন নাই।

৩. সংবিধানের বাইরে তিনি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মূলা দিয়েছেন তা যে অবৈধ তা প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন।

৪. এই বিবৃতির মাধ্যমে তিনি ম্যাকিয়াভেলীর 'দ্বৈত নৈতিকতা'কে অনুসরণ করেছেন। যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী।

৫. সরকার নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন না করতে পারায় প্রকারন্তরে নিজেকেই দায়ী করলেন।

এখন প্রশ্ন হল নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন না করতে পারার জন্য কে দায়ি ? বিরোধী দল নির্বাচনের পূর্বে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবৈধ আখ্যায়িত করেছিলেন। বিরোধী দলকে নির্বাচনে রাজী করাতে, প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচন কমিশন, কূটনৈতিক বৃন্দের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিরোধী দল তাদের প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করে দেশকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করতে ব্রতী হলেন। নির্বাচনের দিন হরতাল সহ গণকার্ফু দিয়ে নির্বাচন আংশিক প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে। নির্বাচনে অসংখ্য লোক হতাহত হয়েছে। ৫ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির পর ৯০ দিনের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সংবিধান লংঘিত হবে এ কথা নির্বাচনের পূর্বে কখনও বুঝতে চান নাই। নির্বাচনের পরে এসে তিনি বলছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে "নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে না পারায়" সংবিধান লংঘিত হয়েছে। অথচ এই বিরোধী দলীয় নেত্রীই নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য জীবন বাজি রেখেছেন। কাজেই নির্বাচন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন না পারায় যদি সংবিধান লংঘিত হয় তবে তার দায়ভার বিরোধী দলের ওপর বর্তাবে না ? নির্বাচনের পূর্বে তিনি বলেছিলেন ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবৈধ, নির্বাচনের পরে এসে বলছেন নির্বাচন করতে না পারায় সরকার অবৈধ। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কোন বক্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক। এই ধরণের বক্তব্য বিবৃতি ম্যাকিয়াভেলীর দ্বৈত নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা হলে এ কথা বলা যায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার জন্য যে নির্বাচন করেছে তা যথাযথ ও সঠিক ছিল। বরং প্রধানমন্ত্রী যদি নির্বাচন না করে পদত্যাগ করতেন তা হলে তাহাই হতো অসাংবিধানিক।

প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসে সম্মতি ঃ

৩ মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক রেডিও-টিভি ভাষণে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবি অনুযায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল উত্থাপন ও পাসের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন এবং ১২ ফেব্রুয়ারী তাঁর ভাষণে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছিলেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায়। এ ব্যাপারে তার প্রয়াস ছিল আন্তরিক বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ইতোপূর্বে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের লক্ষ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সমূহও বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী একটি অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যাক্ত করে বলেন, " আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলতে চাই যে, দেশের সকল রাজনেতিক দল ও ব্যাক্তিকে নিয়েই আমরা জাতীয় নির্বাচন করতে চেয়েছিলাম এবং আগামীতেও একসাথে নির্বাচন করতে চাই। কিন্তু সংবিধানের বিধান না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের এই সমস্যা আর থাকবে না। এমতাবস্থায় আমরা এখন থেকেই বিদ্যমান সমসার সাংবিধানিক ও বাস্তব সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারি। কারণ আমরা সকল সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে আন্তরিক ভাবেই আগ্রহী।" প্রধানমন্ত্রী দেশ, জাতি, জনগণ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে এ জটিল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠনের জন্য দেশবাসী ও সকল রাজনৈতিক দলের কাছে ৩টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গুলো হলো ঃ [১৮১]

(১) দেশ ও জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সকল জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় সরকার গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত এই সরকার দৈনন্দিন সরকারী কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করবেন। কোন নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করার পূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকবেন।

(২) ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা এ বিষয়ে সংবিধানের প্রাসঙ্গিক সংশাধনী বিল আনবো যত শীঘ্র সম্ভব।এই সংশোধনী অনুযায়ী গণভোটের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) অতঃপর নূন্যতম সময়ের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উক্ত তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে খোলামন নিয়ে আলোচনার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল দল অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমে একদিকে বিরোধী দলের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণহওয়া এবং অন্যদিকে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলো। কিন্তু তিনটি বিরোধী দলই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় বসার প্রস্তাব তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঐ দিনই বিরোধী দলীয় নেত্রী এক বিবৃতিতে মন্তব্য করে বলেন যে, "বেগম জিয়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা উল্লেখনেই। তিনি কখন পদত্যাগ করবেন তারও উল্লেখ নেই এবং কখন পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন হবে

সেই বিষয় ও সুনির্দিষ্টভাবে কোন প্রস্তাব দেন নি।"[১৮২] কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং তাঁর দেয়া তিনটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং নির্বাচনের সময়সীমা কোন সমস্যা নয়। কারণ তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, সর্বাপেক্ষা গ্রহনযোগ্য সমাধানের ভিত্তিতে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবিলম্বে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩ মার্চ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত বিবৃতির সাথে ৩টি দাবিও পেশ করেন। তাঁর দাবি গুলো হলো ঃ [১৮৩]

১) পনেরো ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বাতিল করতে হবে,

২) অবিলম্বে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, এবং

৩) নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করতে হবে।

৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে এক পত্রের মাধ্যমে ৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে প্রদত্ত তিনটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনার আহবান জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী উক্ত পত্রের কোন জবাব দেন নি তবে ৬ মার্চ তিনি এক বিবৃতির মাধ্যমে ৫ দফা দাবি পেশ করেন। দাবি গুলো হলো ঃ [১৮৪]

১) ৯ মার্চের মধ্যে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দান ;

২) নির্বাচনের প্রক্রিয়া বন্ধ ঘোষণা ; নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগ ;

৩) ১০ মার্চের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে আন্দোলনরত সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও মে মাসের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান ;

৪) নির্বাচনকালে হতাহতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ; এবং

৫) দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান।

বিরোধী নেত্রীর এ বিবৃতির পাশাপাশি একই দিন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপি'র এক বিশাল জনসভা থেকে ও আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিরোধী দলকে এগিয়ে আসার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, "হরতাল অবরোধ ও সন্ত্রাস করে সমস্যার সমাধান হবে না। খোলা মনে আলোচনার মাধ্যমেই কেবল সমস্যার সমাধান সম্ভব।" [১৮৫]

রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ঃ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সমঝোতার উদ্যোগ ঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ৩মার্চ (১৯৯৬) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণে নি রপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল সমূহকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য উপায় খুঁজে বের করার যে প্রস্তাব দেন তাঁর প্রেক্ষিতে বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রত্যাখ্যান করেন তারা রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সংলাপের প্রস্তাব করেন। ৪ মার্চ বিরোধী দল সমূহ যৌথ সমাবেশ শেষে এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেন যে, এ সরকারের সাথে তারা কোন আলাপ আলোচনা করবেন না তবে রাষ্ট্রপতি যদি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তবে আলাপ আলোচনায় বিরোধী দল রাজি আছেন। ৮ মার্চ সরকারী দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে উদ্যোগ নেয়ার ইতিবাচক সাড়া দেন। এর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ৯ মার্চ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। রাষ্ট্রপতির পক্ষথেকে ১০ মার্চ (১৯৯৬) আলোচনার আহবান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তিন জোট নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন ও এনডিপি নেতা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীকে চিঠি দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি বিরোধী দল সমূহ ৯ মার্চ থেকে সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি পালন শুরু করেন। ৯ মার্চ সন্ধায় বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব সাংবাদিকদের বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাই তিনি জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য অসহযোগ কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহবান জানান। রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে ১০ ও ১১ মার্চ যথাক্রমে বিরোধী দল এবং সরকারী দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। ১০ মার্চ বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ সহ তিন দল ইতোপূর্বের পেশকৃত তিনটি দফা পুনরায় রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করেন। এগুলো হলোঃ-১ ৬ষ্ঠ-জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ২. প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, ৩. নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। এছাড়াও ঐ দিন আওয়ামী লীগ নেত্রী দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "সংবিধানের ৪৮ ধারায় 'রেসিডিউয়াল পাওয়ার প্রয়োগ করে ৯৩ ধারায় অর্ডিন্যান্স জারি করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন এবং মে মাসের মধ্যে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতিকে দেয়া বিরোধী দলের এই সাংবিধানিক পরামর্শ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১০ মার্চ বি,এন,পি'র যুগ্ম মহাসচিব বলে, "অধ্যাদেশ জারি করে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নেই। এ জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন দরকার"। [১৮৬] প্রকৃত পক্ষে আওয়ামী লীগ সভা নেত্রী সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে '৯৩ ধারায় যে অধ্যাদেশ জারি করতে বলেছেন সে সম্পর্কে বলা যায় যে সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করে এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। সংবিধানের '৯৩' ধারায় রাষ্ট্রপতিকে যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেখানেও কিছু শর্ত যুক্ত আছে। সাংবিধানের ৯৩(১) ধারার শর্তাংশে বলা হয়েছে ঃ [১৮৭]

"তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা যাইবেনা,

ক) যাহা এই সংবিধানের অধীনে সংসদের আইন দ্বারা আইন সঙ্গতভাবে করা যায় ;

খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়, অথবা

গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রনীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।"

সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে যদি অধ্যাদেশের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হয় তবে ৯৩(১) ধারা শর্তাংশের (খ) উপধারা লংঘিত হবে। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হলে সংবিধানের কোন কোন বিধান পরিবর্তন করতে হবে এবং কোন কোন বিধান রহিত করতে হবে। যা রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের মাধ্যমে করতে পারেন না। কাজেই বিরোধী দলের এ দাবিটি ও অসাংবিধানিক।

১১ মার্চ বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানান যে, মে মাসের মধ্যে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাদের কোন আপত্তি নেই। এর ফলে বিরোধী দলের তিনটি দাবির মধ্যে প্রধান দু'টি দাবি পূরণ হলো। কেবল মাত্র ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবিটি অবশিষ্ট রইলো। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে, ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিল করবেন কিনা ? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, "সংসদ বাতিল করলে নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হবে কি করে ও কিসের মাধ্যমে হবে ? সংসদ থাকবেনা, তা হলে বিল পাশ করবে কে?" [১৮৮] মূলত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদই একমাত্র রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে পারে। কাজেই মুহূর্তে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের গুরুত্ব খুবই বেশী। যদিও এই সংসদের সৃষ্টি একটি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে। তবুও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের একমাত্র স্থান। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ করার পর এমনিতেই এ সংসদের বিলুপ্ত করা হবে। কেননা ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলে বিএনপি সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা পেয়েছে। আর সেজন্যই বেগম খালেদা জিয়া নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়েছে। এত

দিন বেগম জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে সংবিধানের পরিপন্থী বলেছেন। মূলতঃ বিরোধী দল যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে বলে ছিল তা সাংবিধানিক ছিল না। বিএনপি যদি সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করে তবে তা সাংবিধানিক হবে। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারা নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে।

১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি সমঝোতার সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে বিএনপিসহ বিরোধী দল সমূহের কাছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য চিঠি পাঠান। এর ১ দিন পর ১৩ মার্চ (১৯৯৬)আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি, জামায়াত ইসলামী, ওয়ার্কাস পার্টি, গণফোরাম ও ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির চিঠির জবাব দেয়া হয়। তবে তাদের চিঠিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন রূপ রেখা বা মতামত দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে লেখা আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর তিনটি চিঠির ভাষ্য ও বক্তব্য প্রায় একই। উক্ত তিনটি চিঠিতে রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, "আশা করি আপনি ১৫ ফেব্রুয়ারীর অবৈধ নির্বাচন বাতিল ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নিশ্চিত করে সংকট সমাধানের দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে মে মাসের মধ্যেই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দেশবাসীকে সংঘাত ও সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করবেন।"[১৮৯] তিনটি বিরোধী দলের উক্ত চিঠিতে কিভাবে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন সে সম্পর্কে কোন সুপারিশ দেয়া হয়নি। ইতোপূর্বে বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা সংবিধানের ৪৮ ও ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধ্যাদেশের মাধ্যমে যেভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলে ছিলেন তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন তাঁর চিঠিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের পরামর্শ নেয়ার প্রস্তাব করে উল্লেখ করেন," "রেফারেন্সের বিষয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিদের পরামর্শ সমৃদ্ধ হলে তা সুপ্রিম কোর্টের জন্য সহায়ক হতে পারে"।[১৯০] কিন্তু ডঃ কামাল হোসেন এ মতামত ও সংকট সমাধানের সুস্পষ্ট কোন মতামত নয়। বিরোধী দলের উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিরোধী দলে কেবল মাত্র ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্তিরর দাবি ছাড়া অন্য সকল দাবি মেনে নিয়েছে। যেখানে বিরোধী দলের মূল দাবি ছিল অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, এছাড়াও মে মাসের মধ্যে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, সরকার সেই দাবিও মেনে নিয়েছে এবং বিরোধী দলের ফর্মুলা অনুযায়ীই সমঝোতার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে তা সত্ত্বেও সমঝোতার স্বার্থে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সাড়া না দিয়ে পত্রের মাধ্যমে কত গুলো শর্ত দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। সরকারি দল দাবি পুরনে আন্তরিক না হলে ৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হতো না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিয়েই। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেরপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর আহবানে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাড়া দেয়নি কারণ বিরোধী দলীয় নেত্রীর দাবি ছিলো আলোচনার পূর্বেই ঠিক করতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়া হবে কিনা। তখন সাংবিধানিক ভাবে সরকারি দলের পক্ষে বিরোধী দলের দাবি পূরণ করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু নির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ারপর বিরোধী দল অন্য শর্ত দিয়ে সংকট সমাধানের সুযোগ সরকারী দলতে দিতে অস্বীকার করলো। বিরোধী দলের মনোভাব যা তাতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে তারা আগ্রহী নয় এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে আগ্রহী। যা তিন জোটের রূপ রেখারও পরিপন্থী। সংকট সমাধানের রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ১৫ মার্চ (১৯৯৬) একটি বিবৃতিতে বলেন, " সংবিধানের ব্যাপক পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন আইন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রেসিডেন্টের সীমাবদ্ধতা রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান সংযোজনের জন্য সংবিধান সংশোধন এবং পরবর্তীতে গণভোটের প্রয়োজন রয়েছে।" রাষ্ট্রপতি উক্ত বিবৃতিতে আরও বলেন," সংশ্লিষ্ট দল সমূহ তাদের নিজ নিজ অবস্থানে আরও নমনীয়তা না দেখালে জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছানো যাবে না।" [১৯১] রাষ্ট্রপতির এ বিবৃতিতে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন," প্রেসিডেন্টের বিবৃতি সংকট সমাধানের পরিবর্তে দেশকে নৈরাজ্য সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রেসিডেন্টের বিবৃতি তারই ইঙ্গিত বহন করে।"[১৯২] কার্যতঃ রাজনৈতিক দল সমূহ রাষ্ট্রপতির উদ্যোগে সাড়া না দিয়ে দেশকে সংঘাক ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের রাষ্ট্রপতির সর্বশেষ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ আন্দোলনের চুড়ান্ত পরিনতি ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য রাষ্ট্রপতির উদ্যোগের পাশাপাশি আন্দোলনরত বিরোধী দল সমূহ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিল, বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ৯ মার্চ(১৯৯৬) থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ বিএনপি সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬) তিন বিরোধী দল সমূহ এ অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা কালে জনগণকে আহবান জানান যাতে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে সকল প্রকার সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা বন্ধ রাখা সহ সড়ক, নৌ ও রেলপথে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের সকল বন্দর ও বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে কেবল মাত্র সকাল ১০টা থেকে রিক্সা চলাচলের কথা বলা হয়। ৯ মার্চ থেকে এ অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি সফল করার জন্য ব্যাপক বোমাবাজি, গাড়ী ভাঙচুর, জালাও পোড়াও সহ হিংসাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করা হয়।

৯ মার্চ থেকে দেশের আইন শৃংখলার ব্যাপক অবনতি ঘটে। কার্যতঃ সারাদেশ অচল হয়ে পড়ে। ১৭ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে একটি তেল ভর্তি জাহাজে বোমা নিক্ষেপ করলে সরকার বন্দরের নিয়ন্ত্রনের ভার নৌবাহনীর হাতে ছেড়ে দেয়। অসহযোগের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা অচল থাকায় বন্দর সমূহে আমাদনীকৃত পন্যের স্তূপে পরিনত হয়। ফলে ১৮ মার্চ বেনাপোল স্থল বন্দরে এক অগ্নিকান্ডে ৫০০ কোটি টাকার আমাদনি পন্য পুড়ে যায়। শুধু পন্য সামগ্রী নয় "যানবাহন চলাচল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অচলবস্থা সৃষ্টি করার ফলে গোটা দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।"[১৯৩] ১৯ মার্চ বিরোধী দল সমূহ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই সংসদ ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন। কারণ ঐ দিন ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন বসে। বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলন আরও জঙ্গীরূপ ধারন করে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার এবং বিরোধী দলের সংঘর্ষে আহত ও নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে বিরোধী দল সরকারের পতন ঘটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অন্যদিকে সরকারী দল ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের পর ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক।

২৩ মার্চ থেকে বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঐ দিন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে প্রেসক্লাবের সম্মুখে স্থাপন করা হয় 'জনতার মঞ্চ'। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত জনতার মঞ্চে বিরোধী দল অবস্থান ধর্মঘট করে। মেয়র হানিফ 'জনতার মঞ্চ' থেকে ঘোষণা করেন খালেদা জিয়া সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত দিবা রাত্র 'জনতার মঞ্চে' অবস্থান ধর্মঘট চলবে। মেয়র হানিফ নিজেকে ঢাকার একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে ঘোষণা করেন, "We donot obey the illegal Prime Minister Begum Khaleda."[১৯৪] সিরাজুদ্দিন আহম্মেদ মেয়র হানিফের উদ্বৃতি দিয়ে আরও উল্লেখ করেন, "He urged the army, Bangladesh Rifles,

Dhaka University Institutional Repository

and the Police to join them and the people instead of protecting the illegal Government of Begum Khaleda" [১৮৫] ২৪ মার্চ প্রত্যুষে পুলিশ 'জনতার মঞ্চ' ভেঙ্গে দিলে জনগণ পুনরায় জনতার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করে। ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সচিবালয় অফিসার কর্মচারী এক সমাবেশে মিলিত হন। উক্ত সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও প্লানিং কমিশনের সদস্য ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীর সচিবদের পক্ষে বিরোধী দলের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও সমাবেশে যোগদান করেন ও বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁরা (সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী) অবৈধ সরকারের অধীনে কোন কাজ করবেনা এবং বিএনপি'র মন্ত্রী সভার পদত্যাগ দাবি করেন। ২৭ মার্চের মধ্যে উক্ত দাবি মানা না হলে তাঁরা সরাসরি জনগনের সাথে আন্দোলনে মিলিত হবে। ২৫ মার্চ ২৮ জন সচিব ও উর্ধ্বন আমলা এক যৌথ বিবৃতিতে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। ইতোমধ্যে ২৬ মার্চ প্রত্যুষে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বহু প্রতিক্ষীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের পর এমনিতেই সরকারের সময়সীমা যখন সীমিত হয়ে আসছে তখন সুযোগ বুঝে আমলারা তাদের চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করে বিদায়ী সরকারের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ২৭ মার্চ কেবিনেট সচিব আয়ুবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩৫ জন সচিব রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে তারা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। একই দিন সচিবালযের কর্মচারীবৃন্দ রাষ্ট্রপতিকে একটি স্মারক লিপি প্রদান করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ও খালেদা জিয়ার পদত্যাগ দাবি করেন। ইতোমধ্যে দেশের সকল জিলা সদরে 'জনতার মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশ কার্যতঃ অচল। সচিবালয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। সচিবালয় সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ২৮ মার্চ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সচিবালয় ভিআইপি গেটে সমাবেশ করেন। সমাবেশ শেষে সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের নেতৃত্বে কর্মকর্তাদের একটি অংশ 'জনতার মঞ্চে' গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে আরোহন করে তাদের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করেছেন এবং চাকুরী বিধি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ লংঘন করেছেন। ২৯ মার্চ বিএনপি তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সম্মুখে "গণতন্ত্র মঞ্চ" প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'গণতন্ত্র মঞ্চ" বিএনপি'র দলীয় নেতাকর্মীদের মনোবল দৃঢ় রাখতে সহায়তা করেছে। ৩০ মার্চ খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে ৯ মার্চ থেকে লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশঃ-

বিরোধী দলের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাবণের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির নেয়া উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর বি এন পি একক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভবন ঘেড়াও কর্মসূচি ঘোষনা করে। ১৪ মার্চ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনে নির্বচানের অনুষ্ঠানের জন্য তফসিল ঘোষনা করেন। ১৬ মার্চ বি এন পি দলীয় ৩০ জন মহিলা সংসদ সদস্য প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশের ব্যাপারে বিরোধী দল সরকারকে কোন রুপ সহযোগিতা না করার ফলে এবং অসহযোগ কর্মসূচি অব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

থাকায় সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলের আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করতে চাচ্ছে। ১৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে বলেছেন "নির্দলীয় সরকারের বিল পাশ করার পর আমি পদত্যাগ করবো"। [১৯৬] ১৮ মার্চের মধ্যে জাতীয় সংসদের ৩০২ জন সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণ করেন।

১৯ মার্চ (১৯৯৬) রাষ্ট্রপতি বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ২৭ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নবগঠিত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নবগঠিত মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করেন। নতুন মন্ত্রী সভায় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ১৩ জন কেবিনেট মন্ত্রী ও ১৩ জন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে সর্বপ্রথমে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার নির্বাচিত হন সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন এল.কে. সিদ্দিকী। এরপর সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, " সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা নিয়ে ৬ষ্ঠ সংসদ তার কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।" বর্তমান সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল গুলির অংশগ্রহণ না করাকে তিনি পরিতাপের বিষয় হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, "এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা প্রতিকুলতার ও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব অপরিসীম বলে উল্লেখ করেন এবং দায়িত্ব পালনে, সফলতা কামনা করেন।" [১৯৭]

২০ মার্চ নবগঠিত মন্ত্রী সভা জাতীয় সংসদের সকল সাধারণ জাতীয় নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব সম্বকলিত। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলের খসড়া অনুমোদন করেছে। ২১ মার্চ (১৯৯৬) বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ নামেএকটি বিল উত্থাপন করা হয়। জাতীয় সংসদে এই বিল উত্থাপিত হলে ঐ দিনই আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর লিয়াঁজো কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিফ্রিং কালে আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ নাসিম বলেন, "অবৈধ সংসদের কোন আইন বা বিধান দেশের জনগণ মানবে না এবং এর দ্বারা বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটকে আরও জটিল ও ঘনীভূত করা হবে।" [১৯৮]

২৬ মার্চ (১৯৯৬) প্রত্যুষে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবিকৃত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পর্কিত বিল সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ করা হয়। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ নামে এ বিলে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কিংবা আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি কিংবা সকল দলের কাছে গ্রহণ যোগ্য কোন নির্দলীয় ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবে। যদি ঐ রূপ কোন ব্যক্তি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে রাষ্ট্রপতি নিজে ঐ দায়িত্ব পালন করবে। প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার বা বিলুপ্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো সংবিধান সংশোধনের পর গণভোটের আয়োজন করা হবে। কিন্তু সংবিধানের ত্রয়োদশতম সংশোধনী পাশ করা হয়েছে গণভোটকে পরিহার করে। অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানাবলী সংবিধানের ৫৮(ক) এর পর ২ক এ নতুন পরিচ্ছেদ যুক্ত করে এ বিধান করা হয়েছে। যার ফলে গণভোটের আর প্রয়োজন হবে না। কেননা সংবিধানের বর্তমান স্বরূপ অনুযায়ী ধারা ৮,৪৮,৫৬ এবং ১৪২ ধারা সমূহ পরিবর্তন করতে হলে গণভোটের প্রয়োজন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযোজন করতে গিয়ে উক্ত ৪টি ধারায় কোন পরিবর্তন আনা হয় নাই। ফলে রাষ্ট্রপতি ২৮মার্চই উক্ত বিলে সম্মতি দানের সাথে সাথে বিলটি আইনে পরিনত হয়। এ বিল পাশের ফলে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ হলো, তেমনি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর প্রতিশ্রুত সংবিধান সম্মতভাবেই বিরোধী দলের এ দবি পূরণ করলেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ দেয়া হলো।

ছ) খালেদা জিয়ার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ঃ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিল অনুমোদন লাভের পর বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সময়ের ব্যাপারে হয়ে দাড়ায়। এই বিলপাসের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সকল বাধা অপসারিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ৩০ মার্চ (১৯৯৬) 'জনতার মঞ্চ' থেকে সরকারকে পদত্যাগের চূড়ান্ত আলটিমেটাম দেয়া হয়। অপরদিকে একই দিন "গনতন্ত্র মঞ্চ "থেকে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপিকে একমাত্র জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বেগম জিয়া উক্ত সমাবেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সাংবিধানিক সমাধান করতে পারায় দেশ বাসীকে অভিনন্দন জানান। এবং উক্ত সমাবেশ থেকে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দেন। অবশ্য ইতোপূর্বে ২৯ মার্চ রাতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে যথাশীঘ্র সম্ভব নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ ক্রমে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রন জানান। বিচারপতি হাবিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রন গ্রহণ করেন। এর ফলে ৩০ মার্চ (১৯৯৬) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রম ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নয়া পল্টনে 'গণতন্ত্র মঞ্চের' জনসভা থেকে বঙ্গভবনে এসে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার পর পরই রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে শপথ পড়ান। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হল। এর ফলে বিরোধী দল সমূহের দীর্ঘ দুই বছরের ও বেশী সময় ধরে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটে এবং জাতি একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বপ্ন দেখে যেখানে সকল দলের অংশ গ্রহন নিশ্চিত হবে। পক্ষান্তরে একই সাথে একটি স্বৈরাচারী সরকারের অবসানের পর ১৯৯১ সালে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ৫ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের ঘটনা বহুল গণতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটে। খালেদা জিয়ার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন প্রসঙ্গে জনতার মঞ্চের রূপকারও ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "This victory is not a victory of any Party, nor of any individual, this victory is the victory of the people, This victory is the victory of democracy." [১৯৯] আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, " এ বিজয় জনতার বিজয়।"[২০০] এ প্রসঙ্গে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া প্রতিক্রয়া ব্যক্ত করে বলেন, " আন্দোলনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসে ছিলাম এখন জনতার দাবি মেনে নিয়েছি। গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার স্বার্থে সরে দাড়িয়েছি।"[২০১] প্রকৃত পক্ষে খালেদা জিয়ার এই পদত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতা পরিরর্তনে গণতন্ত্র এবং সাংবিধনিক ধারা বজায় থাকায় রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

৩০ মার্চ বিচারপতি হাবিবুর রহমানের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিপূর্ণতা লাভ করে ৩ এপ্রিল (১৯৯৬)। ঐ দিন প্রধান উপদেষ্টার সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সংবিধান অনুযায়ী ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন সম্পন্ন করেন। উপদেষ্টাগণ হলেন, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর সেগুফতা বখত চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অবঃ) ডাঃ আব্দুর রহমান খান, গ্রামীন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস, মোহাম্মদ শামসুল হক, সৈয়দ মঞ্জুরে এলাহী, প্রাক্তন সচিব এ, জেড, এম নাসিরুদ্দীন, অধ্যাপক ডঃ নাজমা চৌধুরী এবং ইঞ্জিনিয়ার ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা পরিষদের ওপর বাংলাদেশের পরবর্তী ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। উপদেষ্টাগণ তাদের দক্ষতা যোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতা দ্বারা তাদের ওপর অর্পিত এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবেন।

জ) খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল ঃ একটি বিশ্লেষণ ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলের অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ ছিল হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন। যা ছিল ঐ সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বজায় থাকা একান্ত অপরিহার্য। কেননা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নির্ভর করে। হরতাল ধর্মঘটের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়ে এবং একই সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটায়। যদিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় হরতাল ধর্মঘট একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল ধর্মকট ব্যাপক মাত্রায় পালিত হওয়ায় এ বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই আমার গবেষণায় এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে চাই এ কারণে যে প্রকৃত পক্ষে খালেদা জিয়ার শাসনালে মোট কতদিন হরতাল ধর্মঘট পালিত হয়েছে এবং এর ফলে ঐ সময়ে বাংলাদেশের কতটুকু অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। আমরা দেখি রাজনৈতিক বক্তৃতায় ও পত্র পত্রিকায় বলা হয়ে থাকে যে খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৭৩ দিন হরতাল পালিত হয়েছে । এই ১৭৩ দিন হরতারের পরিসংখ্যানও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। কি কি কারণে এ সমস্ত হরতাল পালিত হয়েছে সে কথাও কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। এ কথা সবার জনা যে, খালেদা জিয়ার শাসনামলের অধিকাংশ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠায় কতদিন হরতাল হয়েছে ? হরতাল ধর্মঘটের অন্যান্য কারণ গুলো কি ছিল? হরতালের সময় স্থান ও কোন কোন দিবসে হরতাল পালন করা হয়েছে। এবং সর্বপরি এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির একটি চিত্র তুলে ধরা।

হরতাল একটি গুজরাটি শব্দ হরতাল শব্দটির হর (প্রত্যেক) + তাল(তালা) অর্থাৎ 'প্রতি দরজায় তালা' থেকে এসেছে। বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, "হরতাল অর্থ"-ধর্মঘট, বিক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য যানবাহন, হাট বাজার দোকানপার্ট অফিস আদালত ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করা।" [২০২] হরতাল, ধর্মঘটের ইংরেজী শব্দ 'Strike'। Chambers 20th Century Dictionary তে Strike শব্দের পরিভাষায় বলা হয়েছে, " To leave off or refuse to continue" [২০৩] হিন্দিতে যাকে বলা হয় 'বন্‌ধ'। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে আমরা হরতাল বলতে বুঝি, কোন একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে জনমত সৃষ্টি ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সকল প্রকার যানবাহন, দোকানপাট, হাটবাজার, অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ রাখা বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'হরতাল' একটি অন্যতম রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন ইস্যুতে সর্ব প্রথমেই 'হরতাল' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়াও যে কোন ছোটখাট বিষয়ে ও 'হরতাল' পালন করা হয়ে থাকে। যে কোন পেশাজীবী শ্রেণী তাদের দাবি আদায়ে বেছে নেয় ধর্মঘট। 'হরতাল' এবং ধর্মঘটের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য না থাকলেও আমাদের দেশে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে। 'হরতাল' সর্বব্যাপী অর্থাৎ হরতাল পালনে দেশের সকল পেশা, শ্রেণী, যানবাহন, অফিস, আদালত ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদিকে স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে ধর্মঘট যে কোন পেশাজীবী শ্রেণী কেবল মাত্র নিজেদের সংগঠন বা পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং এর কর্মকান্ড কর্মবিরতি বা সম্মিলিত ভাবে নির্দিষ্ট দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা দাবি পূরণের আশ্বাস না দেয়া পর্যন্ত কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে বা অনুপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করা , যেমন কোন পেশাজীবী শ্রেণীর ধর্মঘট, পরিবহন ধর্মঘট, ডাক্তার ধর্মঘট শিক্ষক ধর্মঘট, সরকারী কর্মচারী ধর্মঘট ইত্যাদি প্রকৃতির ধর্মঘট রয়েছে। ধর্মঘটের ফলে একটি পেশা অন্য পেশাকে ধর্মঘটে আমন্ত্রন জানায় না। তবে কয়েকটি পেশাজীবী শ্রেণী সম্মিলিতিভাবে ধর্মঘট পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে হরতাল সকল পেশা, শ্রেণী ও সকল সেক্টরে পালনের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

'হরতাল' এবং ধর্মঘট ছাড়াও হরতালের বিকল্প বা পরিপুরক আরও দুটি কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। তা হল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন। অবরোধ কর্মসূচি ধর্মঘটের মত তবে এতে পরিবহন সেক্টরে অর্থাৎ রেল, সড়ক, নৌ ও বিমান পথে যানবাহন চলাচলে বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে। অবরোধ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকে বলে এ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে স্পর্শ করে। তাই খালেদা জিয়ার শাসনামলে অবরোধ কর্মসূচিকে হরতালের পর্যায় ভুক্ত করে আলোচনা করা হল। অসহযোগ আন্দোলন হরতালের থেকে একটু কঠিন কর্মসূচি। অসহযোগ আন্দোলন হরতালের অনুরূপ তবে হরতালে যেমন সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হয়, অসহযোগ আন্দোলনে বিরত থাকার পাশাপাশি সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষের সাথে অসহযোগিতা করার কথা বলা হয়। যেমন ১৯৯৬ সালে বিরোধী দল দাবি আদায়ে অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে ছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ দিনগুলিতে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে একটানা ২৪ দিন পর্যন্ত অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে ছিলো। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে রেকর্ড পরিমাণ হরতাল অবরোধ, অসহযোগ কর্মসূচি ও ধর্মঘট পালন করা হয়েছে। এ গবেষণায় দেখা গেছে খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন পালন করা হয়েছে ২০৬ দিন এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন ধর্মঘট পালিতহয়েছে ৪৯ দিন। উক্ত সময়ে ৮ (আট) ঘন্টার হরতাল থেকে শুরু করে ৯৬ ঘন্টার হরতাল পর্যন্ত পালিত হয়েছে। পরপর ৭দিন হরতাল পালিত হয়েছে। একবার ৯৬ ঘন্টার হরতাল প্রসঙ্গে ডঃ কামাল হোসেন আজকের কাগজের সঙ্গে আলাপকারে বলেন, " ৯৬ ঘন্টা হরতালের বদলে ৯৬ ঘন্টা সংলাপ চাই। সমস্ত জাতি চায়।" [২০৪] তৎকালীন হরতাল প্রসঙ্গে ডঃ আহম্মদ শরীফ বলে ছিলেন, " হরতাল এ জনসাধারণের স্বার্থের কোন বিষয় জড়িত নেই। ক্ষতির বিষয়টি জড়িত"। তৎকালীন রাজনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখছিনা। একজন গদির কথা ভাবছেন অন্যজন ক্ষমতায় টিকে থাকার কথা ভাবছেন। এর মধ্যে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নেই। "[২০৫] হরতাল ও ধর্মঘটের মধ্যে যে ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে হরতালের পর্যায় ভূক্ত অন্যান্য কর্মসূচি অর্থাৎ অবরোধ এবং অসহযোগ আন্দোলন কে হরতাল এর অন্তর্ভূক্ত করে বিশ্লেষণ করা হল। ধর্মঘট যেহেতু বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে থাকে তাই ধর্মঘট সম্পর্কে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হলো। খালেদা জিয়ার ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণের পর থেকে অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ থেকে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত বিরোধী দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন এবং ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হয় তার তারিখ স্থান বা আওতা সময় হরতালের কারণ, হরতাল আহবানকারী সংগঠনের নাম সহ বছর অনুযায়ী পরিশিষ্ট-৩ এ দেখান হলঃ

সারণী ঃ ৫.৫

১৯৯১- ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে পালিত হরতাল; অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিসংখ্যান।

সাল	হরতাল	অবরোধ	অসহযোগ আন্দোলন	মোট
১৯৯১	৬	৩	-	৯
১৯৯২	১১	-	-	১১
১৯৯৩	১৪	১	-	১৫
১৯৯৪	২৯	৩	-	৩২
১৯৯৫	৬৮	১৭	-	৮৫
১৯৯৬	২৬	১	২৭	৫৪
১৯৯১-১৯৯৬	১৫৪	২৫	২৭	২০৬

পরিশিষ্ট -৩ এর বিবরণ ও সারণী ৫.৫ এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মোট হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচী পলন করা হয়েছে ২০৬ দিন। এর মধ্যে হরতাল ১৫৪দিন, অবরোধ ২৫দিন এবং অসহযোগ আন্দোলন পালন করা হয়েছে ২৭ দিন। উল্লেখ্য উল্লেখিত সময়ে পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে যে ধর্মঘট পালন করা হয়েছে সে হিসেব এক্ষেত্রে ধরা হয়নি। ধর্মঘট ব্যতীত বিরোধী দল কর্তৃক একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ২০৬দিন হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচী পালন বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড।

সারণী (৫.৬) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১- ১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে বিরোধী দল যে ২০৬ দিন হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচী পালন করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ চিহ্নিত করে কি কারণে কত দিন হরতাল পালন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সারণীতে হরতালের প্রধান ১০টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে রয়েছে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, গোলাম আযমের বিচার, ছাত্র নেতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যার প্রতিবাদে, রংপুর, বগুড়া সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে, এরশাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার, পাট বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি, মাগুড়া ও মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে, সার সংকটের কারণে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং সর্বশেষে অন্যান্য কারণ রাখা হয়েছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে, পুলিশি হামলা, মিথ্যামামলা প্রত্যাহার, শেখ হাসিনার প্রাণ নাশের চেষ্টার প্রতিবাদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ঘটনায় পালিত হরতাল সমূহ।

১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ সহ একটি পরিসংখ্যান সম্মিলিতভাবে দেয়া হলঃ (সারণী ঃ ৫.৬ দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৫.৬

১৯৯১- ১৯৯৬ পর্যন্ত হরতাল অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহের পরিসংখ্যান।

হরতালের কারণ	ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে	গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে	ছাত্র নেতা/ রাজনৈতিক নেতা হত্যার প্রতিবাদে	বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবিতে	এরশাদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে	পাট বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে	উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে	সার সংকটের কারণে	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে	অন্যান্য কারণে	মোট	প্রতিমাসে গড়ে হরতাল
১৯৯১ মার্চ-ডিঃ	-	-	২দিন	-	-	৩দিন	-	-	-	৪দিন	৯ দিন	.৯দিন বা ১দিন প্রায়
১৯৯২	১দিন	৪দিন	১দিন	-	-	-	-	-	-	৫দিন	১১ দিন	.৯২ দিন বা ১দিন প্রায়
১৯৯৩	৩ দিন	৩ দিন	১ দিন	-	-	১ দিন	২দিন	-	-	৫দিন	১৫ দিন	১.২৫ দিন
১৯৯৪	১ দিন	২ দিন	৩ দিন	৩ দিন	-	-	৪দিন	-	১৩ দিন	৬দিন	৩২ দিন	২.৬৭ দিন
১৯৯৫	১ দিন	১দিন	১৬ দিন	২ দিন	২ দিন	১০ দিন	-	১১ দিন	৩৪ দিন	৮দিন	৮৫ দিন	৭.০৮ দিন
১৯৯৬ ৩০ মার্চ পর্যন্ত	-		৫ দিন	-	-	-	-	-	৪৫ দিন	৪দিন	৫৪ দিন	১৮ দিন
মোট	৬দিন	১০ দিন	২৮ দিন	৫ দিন	২ দিন	১৪ দিন	০৬ দিন	১১ দিন	৯২ দিন	৩০ দিন	২০৬ দিন	৩.৪৩ গড়ে মাসে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণে দেখা গেছে খালেদা জিয়ার শাসনামলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশী ৯২ দিন হরতাল অবরোধও অসহযোগ কর্মসূচী পালিত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অন্যান্য কারণে ৩০ দিন হরতাল হয়েছে। এর কাছাকাছি ২৮ দিন হরতাল হয়েছে ছাত্র নেতাও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হত্যার প্রতিবাদে। তালিকায় সবচেয়ে কম হরতাল হয়েছে এরশাদের মুক্তিও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ২ দিন। বছর অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালে সবচেয়ে বেশী হরতাল অবরোধ হয়েছে তবে আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশী হয়েছে ১৯৯৬ সালের তিন মাসে (৩০ মার্চ পর্যন্ত) ৫৪ দিন। অর্থাৎ মাসে গড়ে ১৮ দিন হরতাল অবরোধ হয়েছে। খালেদা জিয়া সরকারের শেষ মাসে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের ৯ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিন অসহযোগ আন্দোরনের ফলে দেশ কার্যতঃ অচল ছিল। সারণীতে দেখা যায় সবচেয়ে কম হরতাল ১৯৯১ সালে। ঐ বছর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত অবরোধ সহ মোট হরতাল হয়েছে ৯ দিন। গড়ে মাসে ১দিন। ১৯৯২ সালে মোট ১১ দিন হরতাল হয়েছে যা মাসে গড়ে প্রায় ১ দিন যা ১৯৯১ সালের থেকেও কম। এরপর থেকে হরতালের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৯৩ সালে মোট ১৫ দিন হরতাল হয়েছে যা গড়ে মাসে ১.২৫ দিন। ১৯৯৪ সালে মোট ৩২ দিন যা মাসে গড়ে ২.৬৭ দিন বা প্রায় ৩ দিন। ১৯৯৪ সালে মোট ৮৫ দিন হরতাল হয়েছে যা গড়ে মাসে ৭.০৮ দিন অর্থাৎ ৭দিনের একটু বেশী। তবে রেকর্ড পরিমাণ হরতাল ও অসহযোগ আনন্দালন হয়েছে ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৬ সালের তিন মাসে ৫৪ দিন হরতাল অসহযোগ আন্দোলন পালন করা হয়েছে। যা গড়ে মাসে ১৮ দিন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে ৫ বছরে অর্থাৎ ৬০ মাসে মোট ২০৬ দিন হরতাল, অবরোধ অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে যা গড়ে ৩.৪৩ দিন। অর্থাৎ মাসে সাড়ে তিন দিন হরতাল হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এত বেশী হরতাল কোন সরকারের বিরুদ্ধে পালন করা হয় নাই।

সারণী ঃ ৫. ৭

হরতালের সময় ও স্থান ভিত্তিক পরিসংখ্যান

বৎসর	পূর্ণ দিবস হরতাল	অর্ধ দিবস হরতাল	দেশব্যাপী	ঢাকা/ রাজধানী	ঢাকার বাইরে	মোট	লাগাতার ৩৬ ও ৪৮ ঘন্টা ২ দিন	লাগাতার ৭২ ঘন্টা ৩ দিন	লাগাতার ৯৬ ঘন্টা ৪দিন
১৯৯১	৫ দিন	৪ দিন	৫ দিন	২	২	৯	-		-
১৯৯২	৫	৬	৪	২	৫	১১	-		-
১৯৯৩	৩	১২	৮	২	৫	১৫	-		-
১৯৯৪	২৬	৬	১৫	৬	১১	৩২	২ বার		-
১৯৯৫	৫০	৩৫	৩৭	১৭	৩১	৮৫	৩ বার	৩ বার	৩ বার
১৯৯৬	৪৮	৬	৩৫	৪	১৫	৫৪	২ বার		-
মোট	১৩৭	৬৯	১০৪	৩৩	৬৯	২০৬	৭ বার	৩ বার	৩ বার

অন্যদিকে সারণী (৫.৭) বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, (১৯৯১- ১৯৯৬) পর্যন্ত যে ২০৬ দিন হরতাল হয়েছে তার মধ্যে পূর্ণ দিবস হরতালের সংখ্যা ১৩৭ দিন এবং অর্ধ দিবস হরতাল হয়েছে ৬৯ দিন। তা ছাড়া লাগাতার ৩২ ঘন্টা ও ৪৮ ঘন্টা হরতাল হয়েছে ৭ বার, ৭২ ঘন্টার হরতাল ৩ বার ৯৬ ঘন্টার ২ বার এবং ১৯৯৫ সালের ১১ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত পরপর ৬ দিন (৪ দিন দেশব্যাপী এবং ২দিন রাজধানী কেন্দ্রিক) হরতাল পালন করে অর্থনৈতিক চাকা সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছে। তাছাড়া ১৯৯৬ সালে ৯ মার্চ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত পরপর ২২ দিন অসহযোগ আন্দোলনের ফলেও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সহ সব কিছু অচল ছিল; হরতালের আওতা বা হরতালের স্থান ভিত্তিতে দেখা যায় যে, উল্লেখিত ৫ বছরে দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে ১০৪ দিন, ঢাকা বা রাজধারনী কেন্দ্রিক ৩৩ দিন এবং রাজধানীর বাইরে হরতাল হয়েছে ৬৯ দিন।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে এই ব্যাপক হরতাল কর্মসূচী পালনের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য ও অর্থনীতিবিদগণের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিদিন হরতালে ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২০ সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ক্ষমতায় থাকার সময় বি, এন, পি প্রতিদিন হরতালের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছে, হিসাব দিয়েছে যে, একদিন হরতালে দু'শ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, অর্থনীতি ধংস হয়" [২০৬] সেই হিসেব অনুযায়ী ২০৬ দিনে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে ৪১২০০ কোটি টাকা। যা বাংলাদেশের দুই বছরের বাজেটের সমান। এই বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠা উন্নয়নশীল দেশের মত একটা দেশের জন্য খুবই অসম্ভব ব্যাপার। শুধু হরতাল নয় ধর্মঘটের ফলেও দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

নিম্নে খালেদা জিয়ার শাসনামলে পালিত বিভিন্ন সংগঠন ও পেশাজীবি শ্রেণীর আহুত ধর্মঘটের বিবরণ দেয়া হয়।

ধর্মঘটঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশা জীবী ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে ধর্মঘট কর্মসূচীও পালন করা হয়েছে। হরতাল অবরোধের ন্যায় ধর্মঘটের ফলেও দেশের অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়েছে অসংখ্যবার কেবল মাত্র পেশাজীবী ছাড়াও রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকেও কখন ও কখন ও ধর্মঘট পালন করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে বিভিন্ন পেশাও শ্রেণীর পক্ষ থেকে যে ধর্মঘট পালন করা হয়েছে তার সবগুলো নিম্নের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না করে সরাসরি অর্থনীতির ওপর যে সকল ধর্মঘট বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সে গুলো তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে একটি বিবরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত ধর্মঘট অর্থনীরি ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনা অথচ বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণী কর্তৃক পালিত হয়েছে। যেমন বি সি,এস সমন্বয় পরিষদ ডাক্তার নার্স ও বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘট তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না করে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯১ - ১৯৯৬ পর্যন্ত ধর্মঘটের একটি বিবরণ পরিশিষ্ট-৩ এর শেষাংশে একটি তালিকায় দেয়া হলঃ

পরিশিষ্টের তালিকায় উল্লেখিত ৫১ দিন ধর্মঘট ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণী আরও অনেক ধর্মঘট পালন করেছে, যেমন ৩ জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে বাংলাদেশ কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগ সমিতি তাদের পেশাগত বিভিন্ন দাবিতে ১ দিন দেশ ব্যাপী ধর্মঘট করেছে। বিসিএস প্রকৃতি সমন্বয় পরিষদ ১১ জানুয়ারী ১৯৯৪ থেকে ১৩ জানুয়ারী ১৯৯৪ পর্যন্ত ৩ দিন দেশ ব্যাপী ধর্মঘট পালন করেছে। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন দু'দফায় ১ জানুয়ারী ১৯৯৪ থেকে ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪ পর্যন্ত ১০ দিন এবং ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ থেকে ৫ মে ১৯৯৪ পর্যন্ত ১৫ দিন সহ মোট ২৫ দিন দেশব্যাপী ধর্মঘট করেছে। বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকরা তাদের বেতনের শতকরা ১০০% সরকার থেকে দেয়ার দাবীতে ২ দফায় ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে ৯৬ দিন ধর্মঘট পালন করেছে। ১৯৯২ সালের ১৮ জানুয়ারী থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩৪ দিন এবং ১৯৯৪ সালের ১৮ এপ্রিল থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী ৬২ দিন ধর্মঘট পালন করেছে। শুধু ধর্মঘট নয় বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকরা মহা অবস্থান, হরতাল সহ আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছে। ১৭ জনু ১৯৯৪ বিরোধী দলীয় নেতাদের আহ্বানে শিক্ষক কর্মচারীরা মহা অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি স্থগিত করেন। তালিকা বহির্ভূত উল্লেখিত ধর্মঘটের ফলে সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সরকারের প্রশাসনিক ভিতকে দুর্বল করেছে ; আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছে।

তালিকা বিশ্লেষণ ঃ

তালিকায় প্রদত্ত যে ৫১ দিন ধর্মঘট পালিত হয়েছে হরতাল ধর্মঘটের সঙ্গানুযায়ী এগুলোও হরতালের পর্যায়ভূক্ত হতে পারে। তবুও এগুলো রাজনৈতিক দল কর্তৃক আহুত না হয়ে এবং সর্বব্যাপী বিস্তৃত না থেকে কোন

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল। ধর্মঘট হলেও এগুলোও অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কেননা যে ধর্মঘট সমুহ পালিত হয়েছে তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে। তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল ৫১ দিন ধর্মঘটের মধ্যে ৩৩ দিনই ছিল পরিবহন ধর্মঘট। বাকী ১৮ দিনের মধ্যে ১০ দিন পাট বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে এবং ৬ দিন স্কপের বিভিন্ন দাবি পূরণে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ফরে এ ১৬ দিনে মিলকারখানা বন্ধ রেখে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি স্তব্ধ রাখা হয়েছে। বাকী ২ দিন ছিল রিক্সা ধর্মঘট। ফলে দেখা যাচ্ছে ৪৯ দিনের ধর্মঘটে ও দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ইতোপূর্বে হরতালের আলোচনা থেকে দেখা গেছে যে, হরতালে প্রতিদিন ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, ধর্মঘটে ও অন্ততঃ পক্ষে প্রতিদিন যদি ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয় তবুও ৫ বছরে ৫১ দিনে ৫,১০০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যা বাংলাদেশের সর্বোবৃহৎ প্রকল্প যমুনা সেতুর বাজেটের চেয়েও বেশী। ফলে এই ধর্মঘটের ক্ষতির দ্বারা যমুনা সেতুর মত একটা প্রকল্প হাতে নেয়া যেত। খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক হরতাল ধর্মঘট প্রসঙ্গে ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন উল্লেখ করেন একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে এবং আমাদের মতো পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম অনুন্নত দেশে ঘন ঘন ধর্মঘট একদিকে যেমন বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার আলোকে বর্হিবিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বহুলাংশে নষ্ট করে অন্য দিকে শিল্প কারখানায় ও ক্ষেত খামারে উৎপাদন ব্যহত করে। দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পঙ্গু করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে গোটা জাতিকে এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়। [২০৭] সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৩৮ সংখ্যায় মাহমুদ শফিক এক নিবন্ধে একটি বিদেশী পত্রিকার ভাষ্য উল্লেখ করে লিখেছেন, "১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর দরিদ্র বাংলাদেশ যে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে তা ম্লান হতে চলেছে। বিরোধী রাজনৈকি দল গুলোর ক্রমাগত হরতাল, অবরোধ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে দারিদ্রের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা দেশটির অক্লান্ত প্রয়াস থমকে গিয়েছে। ১৯৯১ সালের পর তৈরী পোশাক শিল্প, সম্পদের প্রবৃদ্ধি, রপ্তানীর প্রসার, স্থিতিশীল মুদ্রামান, আত্মকর্মসংস্থান, কৃষি ও শিল্পে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, গত বিশ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত বিদ্বেশ ও অসহিষ্ণুতার রাজনীতিতে গরীব দেশটির সম্মুখ যাত্রা স্থির হয়ে পড়ায় জনগণ এখন হতাশায় ভুগতে শুরু করেছে।" [২০৮] খালেদা জিয়ার শাসনামলে মূলতঃ হরতাল ধর্মঘটের মাধ্যমে দেশের বিকাশমান অর্থনীতি দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলনের উল্লেখিত বিশ্লেষণ ও আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে ১৯৯১ এর মার্চ থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ৫ বছরে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন ও ধর্মঘট সহ মোট রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে ২৫৭ দিন। ধর্মঘটকে এ তালিকা থেকে বাদ দিয়েও দাড়ায় ২০৬ দিন। 'অবরোধ' কর্মসূচিকে যদি এ তালিকা থেকে বাদ দেই তাহলে দাড়ায় ১৮১ দিন অর্থাৎ কেবল মাত্র হরতাল এবং অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে ১৮১ দিন। যা ১৭৩ দিনের থেকে বেশী। অসহযোগ আন্দোলন হরতাল থেকে বাদ দেয়া যায় না। কারণ অসহযোগ আন্দোলনের সময় হরতাল কর্মসূচিও পালিত হয়েছে আরও কঠোরভাবে। হরতালকে আরও জঙ্গী ও সর্বাত্মক রূপ দেয়ার জন্যই অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। কাজেই অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি সমুহ আলাদাভাবে দেখানো হলেও অসহযোগ আন্দোলনের দিন গুলোতে হরতালও ছিল। অন্যদিকে যে ৫১ দিন ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হয়েছে এগুলোকেও হরতালের পর্যায়ভুক্ত করে আলোচনা করা যেত। তাহলে দেখা যায় যে ধর্মঘট সহ মোট হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে ২৫৭ দিন। ৬০ মাসে ২৫৭ দিন হরতাল ধর্মঘট মাসে গড়ে ৫.২৮ দিন হরতাল ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে। যার ফলে দেশে ব্যাপক পরিমাণে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিকে বাধা গ্রস্থ করেছে। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করেছে। অথচ একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থিতীশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকা একান্ত অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক হরতাল ধর্মঘট সত্ত্বেরও

রাজনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকতো তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাঙ্খিত লক্ষ্য মাত্রায় পৌছতে পারতো।

মূল্যায়ন ঃ

সংবিধানের ত্রয়োদশতম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক অভূত পূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল বিতর্কিত ও স্বল্পস্থায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস হয়েছে তবুও এর গুরুত্ব এবং প্রভাব বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুদুর প্রসারী। কেননা এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চালু হল। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের শেষের দিক থেকে বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি তুলে এবং ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের প্রথমার্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দল ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে। ফলে ঐ সময়ে দেশে চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করে। এই আন্দোলনের চুড়ান্ত পরিনতি লাভ করে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে। ১৯৯৪ সাল থেকেই ঐ সংকট সমাধানের অজস্র উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো। কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি স্যার নিনিয়ান ষ্টিফেনের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর সর্ব শেষ রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ ব্যর্থ হলে, সকল উদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও সরকারও বিরোধী দলের মধ্যে সংকট সমাধানের পার্থক্য ছিল খুবই ক্ষীণ, বিরোধী দল আন্তরিক হলে ১৯৯৫ সালের শেষার্ধে উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংকট সমাধান হতে পারতো। কিন্তু বিরোধী দল উপনির্বাচনের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। বিরোধী দল নেত্রী সংবিধান সংশোধন ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানান এবং সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতি ছিলেন না। সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ও বিএনপি সরকারের ছিল না। প্রকৃত পক্ষেই এটা একটা সাংবিধানিক সংকট ছিল। তাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, তাঁর ভাষায় সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। বিরোধী দল ঐ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচনের পর ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবি জানান। বিরোধী জোট নেত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন তিনি কোন ভাবেই ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন মেনে নিবেন না। এ কারণে ৯ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত তারা অসহযোগ কর্মসূচি পালন করেন। অথচ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদই হল সংকট সমাধানের একমাত্র কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের পর প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে তৎক্ষণাৎ নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে গ্রহণ করেন। অথচ ৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া রেডিও টিভির ভাষণে বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দল অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি প্রত্যাহার না করে দীর্ঘ ২২ দিন দেশকে অচল করে দিয়ে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত রাখলেন। রাষ্ট্রপতি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেয়া সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিরোধী দল তাতে ইতিবাচক সাড়া দেয় নাই বিরোধী জোট নেত্রী শেখ হাসিনা অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা কালে বলে ছিলেন, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু যেভাবে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তিনিও তেমনি ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পার্থক্য হলো ১৯৭১ সালে অসহযোগ কর্মসূচি পালন কালে ব্যাংক বীমা সহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল ছিল। এবং বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে সরকারী দলের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিরোধী দলকে আলোচনার টেবিলে আনতে সক্ষম হন নাই। যার ফলে সরকার এককভাবে তড়িঘড়ি করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস করেন। যদি বিরোধী দল প্রধানমন্ত্রীর ৩ মার্চের ভাষণের পর রাষ্ট্রপতির আহবানে সাড়া দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে সহায়তা করতো তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ত্রুটি বিচ্যুতি পরবর্তীতে ধরা পড়েছে তাও থাকতো না। ২২ দিন অসহযোগ কর্মসূচি পালনের প্রয়োজন হতো না। ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে সংশোধিত সংবিধান যখন বিরোধী দল মেনে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে অসহযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

জাতিকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তা না দিলেও পারতো। আর এসব কিছুই হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে। এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে খালেদা জিয়ার শাসনামলে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের ফলে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ প্রশস্ত হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি মানদন্ড। খালেদা জিয়ার এই দীর্ঘ ৫ বছরের শাসনামলের মধ্যে বিরোধী দল কর্তৃক হরতাল ধর্মঘট অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে মোট ২৫৭ দিন। এর মধ্যে কেবল মাত্র তত্ত্বাবধঅয়ক সরকারের দাবিতে হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে ৯২ দিন। এই হরতাল, ধর্মঘট এবং অবরোধের ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতায় অসংখ্য নীরিহ মানুষের প্রাণ সংহার হয়েছে। 'আজকের কাগজ' ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ থেকে ২৩ মার্চ ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ ঐ দুই মাসে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত পুনঃ নির্বাচন প্রতিহত ও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে রাজনৈতিক সহিংসতা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে ছাত্র জনতা এবং সাংবাদিক সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৯৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত দুই বছরের আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা কয়েকশত। এর জন্য দায়ি সরকার এবং বিরোধী দল উভয়ই। বিরোধী দল যেমন তাদের দাবিতে অনড় থেকেছে তেমনি সরকারি দল যদি ১৯৯৪ সালে বিরোধী দলের গণ পদত্যাগের পূর্বে অন্ততঃ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে রাজি হতো তা হলে ও সংকটের সমাধান হতে পারতো। জনগণকে জিম্মি করে উভয় দলই তাদের নিজ নিজ স্বার্থে অটল থেকে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে আন্তরিক ছিলেন না।

যাই হোক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এ বিজয় জনগণের বিজয়। পক্ষান্তরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, জনগণের দাবি মেনে নিয়েছি। মূলতঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা কারো জয় পরাজয় নয়। বরং বলা যয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাভাবিক সূত্র অনুযায়ী ঘটেছে। কারণ আমরা জানি David Easton এর System theory অনুযায়ী রাজনৈতিক পরিবেশের (Environment) মধ্য থেকে জনগণের কাছ থেকে দাবি (Demand)উত্থাপিত হয় এবং সেই দাবির পক্ষে রাজনৈতিক দল সমূহ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system) সেই দাবি পর্যালোচনার পর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (Feed Back) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (জাতীয় সংসদ) এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বশেষ পর্যায় সিদ্ধান্তসমূহ Out put হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করা হয়। এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম। কাজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল Political system অনুযায়ীই হয়েছে। ফলে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অগ্রগতি (Political Development) সাধিত হয়েছে বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়নে ক্ষেত্রে অভূত পূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

পাদ টীকা
৬ষ্ঠ অধ্যায়

১. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ,* ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৩ ইং, পৃঃ ৩৮৬।

২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ঃ ১৯৯৪ ইং পৃঃ-২৭।

৩. এম, এ ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৮৬।

৪. *প্রাগুক্ত।*

৫. *প্রাগুক্ত* ।

৬. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৮৮ ও ৩৮৯।

৮. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৯০।

৯. আবদুল মতিন, *খালেদা জিয়ার শাসনকাল ঃ একটি পর্যালোচনা,* ঢাকাঃ র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশনস ১৯৯৭ ইং পৃঃ ৬০।

১০. *'আজকের কাগজ',* ঢাকা ঃ ২ আগষ্ট ১৯৯২ ইং।

১১. শাহরিয়ার কবির, *গণআদালতের পটভূমি,* ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং,পৃঃ ১৩০।

১২. *দৈনিক খবর,* ঢাকাঃ ৮ মার্চ ১৯৯২ ইং।

১৩. *প্রাগুক্ত,* ১৯ মার্চ ১৯৯২ ইং।

১৪. গণআদালতের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ১) এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, ২) ডঃ আহমেদ শরীফ ৩) স্থপতি মাযহারুল ইসলাম খান, ৪) ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ, ৫) ফয়েজ আহমেদ, ৬) অধ্যাপক কবির চৌধুরী ৭) কলিম শরাফী ৮) মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ৯) লেঃ কঃ (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান, ১০) লেঃ কঃ (অঃ) আবু ওসমান চৌধুরী ও ১১) ব্যারিষ্টার শওকত আলী, [সূত্র ঃ দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং]

১৫. 'গণআদালতের স্বাক্ষীগণ হলেন, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ডঃ মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক, শাহরিয়ার কবির, মুশতারী শফি, সাইদুর রহমান, অমিতাভ কায়সার, হামিদা বানু, মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, আলী যাকের, ডঃ মুশতাক হোসেন এবং তিনজন বীরঙ্গনা মহিলা।

১৬. *দৈনিক সংবাদ,* ঢাকাঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং।

১৭. *প্রাগুক্ত।*

১৮. *প্রাগুক্ত।*

১৯. *প্রাগুক্ত,* ২৪ মার্চ ১৯৯২ ইং।

২০. *'দৈনিক খবর',* ঢাকা ঃ ২৫ মার্চ ১৯৯২ ইং।

২১. '১২ জন বিচারক, ৪ জন কৌশলী, ৭ জন স্বাক্ষী এবং সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব সহ মোট ২৪ জন।

২২. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪০২।

২৩. আমান-উদ-দৌলা, *একাত্তরের ঘাতকদের কেন বিচার চাই,* ঢাকা ঃ অল্প কথা, ১৯৯৩ ইং পৃঃ ৩১।

২৪. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২১।

২৫. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫।

২৬. আব্দুল মতিন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬১।

২৭. *দৈনিক সংবাদ,* ঢাকাঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং।

২৮. *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৩৩।

২৯. *প্রাগুক্ত।*

৩০. আমান-উদ-দৌলা, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩।

৩১. শাহরিয়ার কবির, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০১।

৩২. দৈনিক সংবাদ, ঢাকাঃ ২৭ মার্চ ১৯৯২ ইং।

৩৩. *প্রাগুক্ত।*

৩৪. *প্রাগুক্ত।*

৩৫. আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৬ ও ৬৭।
[মূল সূত্রঃ দৈনিক 'জনতা', ঢাকাঃ ২৬ মার্চ, ১৯৯২ ইং]

৩৬. আব্দুল মতিন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৮।
[মুল সূত্র- দৈনিক সংবাদ ঢাকাঃ ১০ এপ্রিল ১৯৯২ ইং]

৩৭. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৪১৫।

৩৮. *প্রাগুক্ত।*

৩৯. *'আজকের কাগজ',* ঢাকা ঃ ২৩ জুন ১৯৯৪ ইং।

৪০. *প্রাগুক্ত।*

৪১. *প্রাগুক্ত।*

৪২. *প্রাগুক্ত* ৬ আগষ্ট ১৯৯২ইং।

৪৩. *প্রাগুক্ত* ১০ আগষ্ট, ১৯৯২ ইং।

৪৪. আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৫,৭৬।
৪৬. *দৈনিক ইনকিলাব*', ঢাকাঃ ১৩ আগষ্ট ১৯৯২ ইং।
৪৭. *প্রাগুক্ত*।
৪৮. '*আজকের কাগজ*', ঢাকা ঃ ২ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৪৯. *প্রাগুক্ত*।
৫০. *প্রাগুক্ত*।
৫১. *প্রাগুক্ত*।
৫২. *প্রাগুক্ত*।
৫৩. *প্রাগুক্ত*, ৭ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৫৪. '*দৈনিক ইনকিলাব*', ঢাকাঃ ২১ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৫৫. *প্রাগুক্ত*, ২২ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৫৬. আব্দুল মতিন, *প্রাগুক্ত*।
৫৭. '*আজকের কাগজ*', ঢাকা ঃ ২১ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৫৮. *প্রাগুক্ত*, ২০ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৫৯. '*দৈনিক ইনকিলাব*', ঢাকাঃ ২২ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৬০. *প্রাগুক্ত*, ২৮ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৬১. *আজকের কাগজ*, ঢাকা ঃ ২৯ মার্চ ১৯৯৪ ইং।
৬২. *প্রাগুক্ত*, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ইং।
৬৩. *প্রাগুক্ত*, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ইং।
৬৪. *প্রাগুক্ত*, ৮ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।
৬৫. *প্রাগুক্ত*, ৫ মে, ১৯৯৪ ইং।
৬৬. '*সাপ্তাহিক বিচিত্রা*', ঢাকাঃ ২৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ১ জুলাই, ১৯৯৪ ইং পৃঃ।
৬৭. M. Nazrul Islam, *Parliamentary Democracy in Bangladesh : An Assessment, Perspectives in Social Science, a compilation volume of seminar paper*, Center for Advanced in Social Sciences [Sayed Gias Uddin Ahmed Edited] Volume-5, October 1998, p-64.
৬৮. '*আজকের কাগজ*', ঢাকাঃ ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ইং।
৬৯. *প্রাগুক্ত*, ২৮ জুন ১৯৯৪ ইং।
৭০. *প্রাগুক্ত*, ২১ জুন ১৯৯৪ ইং।
৭১. আহমেদ নূরে আলম, *বামফ্রন্ট ও বর্তমান রাজনীতি*, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৩ বর্ষ-১৯ সংখ্যা, ৩ সেপ্টেম্বর '৯৪ ইং, পৃঃ ৩১।
৭২. *প্রাগুক্ত*।
৭৩. *প্রাগুক্ত*।
৭৪. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকাঃ ২৩ বর্ষ ১০, সংখ্যা, ২৯ জুলাই '৯৪ ইং- পৃঃ ৩৫।
৭৫. '*আজকের কাগজ*' ঢাকাঃ ১২ মে ১৯৯৪ ইং।
৭৬. *প্রাগুক্ত*, ১৪ মে, ১৯৯৪ ইং।
৭৭. *প্রাগুক্ত*, ১৯ মে, ১৯৯৪ ইং।
৭৮. *প্রাগুক্ত*, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং পৃঃ ৪।
৭৯. *প্রাগুক্ত*, ৮ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং পৃ. ৪।
৮০. *প্রাগুক্ত*, ১৬ মে, ১৯৯৪ ইং।
৮১. *প্রাগুক্ত*, ১২ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।
৮২. *প্রাগুক্ত*, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং।
৮৩. আহমেদ নূরে আলম, '*তত্ত্বাবধায়ক না অন্তর্বর্তী*'-, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ২৩ বর্ষ-২৬ সংখ্যা, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং পৃঃ ২১।
৮৪. '*আজকের কাগজ*' ঢাকাঃ ১৬ মে ১৯৯৪ ইং।
৮৫. M. Nazrul Islam, *Ibid*, P- 64, 65.
৮৬. '*দৈনিক ইত্তেফাক*', ঢাকা ঃ ১ মে, ১৯৯৪ ইং।
৮৭. '*আজকের কাগজ*', ঢাকা ঃ ৩ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং।
৮৮. *প্রাগুক্ত*, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. *প্রাগুক্ত*।
৯০. *'দৈনিক ইনকিলাব,'* ঢাকাঃ ৪ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।
৯১. *'আজকের কাগজ'* ঢাকা ঃ ৫ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং ।
৯২. *প্রাগুক্ত,* নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং।
৯৩. *প্রাগুক্ত,* ১০ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।
৯৪. *প্রাগুক্ত,* ১৩ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।
৯৫. *প্রাগুক্ত,* ১৮ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং
৯৬. *প্রাগুক্ত*।
৯৭. *'দৈনিক ইনকিলাব',* ঢাকা ঃ ২১ নভেম্বর ১৯৯৪ ইং।
৯৮. আহমেদ নূরে আলম, *সংলাপ ঃ সরকার চায় ঃ বিরোধী দল চায় নাঃ জনগণ কি চায় ?* সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ২৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং পৃঃ ২১।
৯৯. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৩।
১০০. *'আজকের কাগজ'* ঢাকা ঃ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।
১০১. *প্রাগুক্ত,* ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।
১০২. *প্রাগুক্ত,* ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।
১০৩. *প্রাগুক্ত,* ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।
১০৪. মোস্তাফা কামাল, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ঃ খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ,* ঢাকাঃ শিব্বির প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৯৪।
১০৫. *'দৈনিক ইত্তেফাক'* ঢাকা ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং।
১০৬. Enayetullah Khan, Bluff all around : *situation becoming increasingly unpredictable Government's authority eroding,* The weekly "Holiday", *Dhaka* : February 3, 1995.
১০৭. *'আজকের কাগজ'* ঢাকা ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং।
১০৮. *প্রাগুক্ত*।
১০৯. *প্রাগুক্ত*।
১১০. Shamim Ahmed, *A unique form of 'Protest, The weekly ' Holiday'* April 28 1995.
১১১. Shamim Ahmed, *BNP & AL launch Polls like campaign. The weekly "Holiday,"* May 9,1995.
১১২. *সংসদ বিতর্ক, বাংলাদেশ ৫ম জাতীয় সংসদের ২০তম অধিবেশনের সরকারী প্রতিবেদন,* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সোমবার, ১৯ জুন, ১৯৯৫ ইং, দ/১।
১১৩. *গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* [১৯৯৪ সালের ৩০ শে জনু পর্যন্ত সংশোধিত] *প্রাগুক্ত*। ভাগ, ১ম পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩), পৃঃ ৩৫।
১১৪. *'আজকের কাগজ',* ঢাকা ঃ ২৫ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১১৫. *প্রাগুক্ত,* ৭ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১১৬. *প্রাগুক্ত,* ১৭ ও ১৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১১৭. *প্রাগুক্ত* ।
১১৮. *প্রাগুক্ত,* ১৭ ও ২০ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১১৯. *প্রাগুক্ত,* ১৭ ও ১৯ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১২০. *প্রাগুক্ত* ১৮ ও ১৯ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১২১. *প্রাগুক্ত* ২০ ও ২১ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১২২. *প্রাগুক্ত,* ২১ ও ২৪ জুলাই ১৯৯৫ ইং
১২৩. *প্রাগুক্ত,* ১৮, ১৯ ও ২১ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১২৪. *প্রাগুক্ত*।
১২৫. *প্রাগুক্ত* ১৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১২৬. *প্রাগুক্ত*।
১২৭. *প্রাগুক্ত* ২৪ জুলাই ১৯৯৫ ইং।
১২৮. *প্রাগুক্ত*।

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. *প্রাগুক্ত*, ২৮ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১৩০. *আজকের কাগজ*, ঢাকা, ২৯ জুলাই ১৯৯৫ ইং।

১৩১. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক*, সরকারী প্রতিবেদন, বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, খন্ড -২১, সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৯/৫০

১৩২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৫৬(৪) পৃঃ ৪১।

১৩৩. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ৭ জুলাই, ১৯৯৫ ইং।

১৩৪. *প্রাগুক্ত।*

১৩৫. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকা ঃ ৭ জুলাই, ১৯৯৫ ইং।

১৩৬. *'দৈনিক ইনকিলাব'*. ঢাকা ঃ ২ আগষ্ট ১৯৯৫ ইং।

১৩৭. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ৩ আগস্ট ১৯৯৫ ইং।

১৩৮. *প্রাগুক্ত*, ৪ আগষ্ট, ১৯৯৫ ইং।

১৩৯. ফয়েজ আহমদ, *পরস্পরের দাবি প্রত্যাখ্যানের মধ্যেই নির্বাচনী প্রস্তুতি ঃ 'দৈনিক জনকণ্ঠ'*, ঢাকা ঃ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪০. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকা ঃ ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।

১৪১. ফয়েজ আহম্মদ, *রাজনীতি - ৯৫ (দ্বিতীয় খন্ড)* ঢাকা ঃ মুক্তধারা ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৪৫।

১৪২. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ২ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং।

১৪৩. *প্রাগুক্ত*, ঢাকা ঃ ১৭ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং।

১৪৪. ২ নভেম্বর (১৯৯৫) তারিখে আওয়ামী লীগ প্রধান *শেখ হাসিনা* কাছে লেখা প্রধান মন্ত্রীর পত্র থেকে উদ্বৃত।

১৪৫. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকা ঃ ৪ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৬. *প্রাগুক্ত*, ৫ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৭. *প্রাগুক্ত*, ১৩ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৮. প্রাগুক্ত, ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৪৯. *প্রাগুক্ত*, ২২ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫০. *প্রাগুক্ত*।

১৫১. *প্রাগুক্ত*।

১৫২. প্রাগুক্ত, ২৩ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ৫৭(২), পৃঃ ৪১

১৫৪. ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। সূত্রঃ আজকের কাগজ, ঢাকাঃ২৫ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৫. Sirajuddin Ahmed, *Sheikh Hsina, Prime Minister of Bangladesh*, Hakkani Publishers Dhakka : 1998, P-156

১৫৬. Shamim Ahmed, *Curcial Day's Ahead*, The weekly Holiday, December 1, 1995।

১৫৭. *' আজকের কাগজ*, ঢাকা ২৮ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৮. প্রাগুক্ত, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৫৯. প্রাগুক্ত, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং।

১৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকাঃ ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৬১. *আজকের কাগজ*, ঢাকা ৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং।

১৬২. Sirajuddin Ahmed, *Ibid*, p-156.

১৬৩. *'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'*, ঢাকাঃ ২৪ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১২ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৭।

১৬৪. মাহমুদ শফিক, *'নির্বাচনের পক্ষ বিপক্ষ*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা ২৪ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা ২৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং, পৃ ঃ ২৯।

১৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০।

১৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩১।

১৬৭. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং পৃঃ ১১।

১৬৮. *প্রাগুক্ত।*

১৬৯. *প্রাগুক্ত।*

১৭০. মাহমুদ শফিক, *নির্বাচন ' ৯৬, দেয়ালে পিঠ নয় ....* সাপ্তাহিক বিচিত্রা, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ২৫।

১৭১. *প্রাগুক্ত*।

১৭২. মাহমুদ শফিক, *নির্বাচন ১৯৯৬*, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৪ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকাঃ ২০ নভেম্বর ১৯৯০ ইং।
১৭৪. *মাহমুদ শফিক*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২।
১৭৫. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা ১ মার্চ ১৯৯৬ ইং পৃঃ ১৭।
১৭৬. Sirajuddin Ahmed, *Ibid*, p-160
১৭৭. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, *প্রাগুক্ত*।
১৭৮. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারী - ১৯৯৬ ইং।
১৭৯. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্তঃ ১৫।
১৮০. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত।
১৮১. প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৩ মার্চ (১৯৯৬) এর রেডিও টিভি ভাষণ, সূত্রঃ *দৈনিক ইত্তেফাক* ; ঢাকা ঃ ৪ মার্চ ১৯৯৬ ইং
১৮২. *'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'* ঢাকাঃ ২৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৮ মার্চ (১৯৯৬) ইং, পৃঃ ১৩।
১৮৩. *প্রাগুক্ত।*
১৮৪. আহমেদ নূরে আলম, *রাষ্ট্রপতির উদ্যোগ কি সফল হবে ? 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'*, ঢাকা ঃ ২৪ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ১৫ মার্চ ১৯৯৬ ইং, পৃ-১৪।
১৮৫. *প্রাগুক্ত।*
১৮৬. *প্রাগুক্ত।*
১৮৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ ৯৩ (১) এর শর্তাংশ, পৃঃ ৯৭।
১৮৮. আহমেদ নূরে আলম, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ১৫।
১৮৯. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকাঃ ২৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২২ মার্চ ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ১৫।
১৯০. *প্রাগুক্ত।*
১৯১. *প্রাগুক্ত।*
১৯২. *প্রাগুক্ত।*
১৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩।
১৯৪. Sirajudding Ahmed, *Ibid* page - 168
১৯৫. *Ibid*.
১৯৬. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৩।
১৯৭. *প্রাগুক্ত*, ২৪ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৯ মার্চ ১৯৯৬ ইং পৃঃ ৮
১৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১১।
১৯৯. Sirajuddin Ahmed, *Ibid*, Page - 172.
২০০. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকা ঃ ৩১ মার্চ ১৯৯৬ ইং।
২০১. *প্রাগুক্ত ;*
২০২। আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৯৯ বাং ঃ পৃঃ ৬৫৯।
২০৩। E. M. Kirkpatrick Edited, *Chambers 20th Century Dictionary*, New Delhi : Allied Publishers Ltd. New Edition 1983, P- 1281.
২০৪। *আজকের কাগজ*, ঢাকা ঃ ১১ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং
২০৫। *প্রাগুক্ত*, ১৬ অক্টোবর ১৯৯৫।
২০৬। *সাপ্তাহিক বিচিত্র* , ঢাকা ঃ ২৬ বর্ষ, ২০ সংখ্যা ৩ অক্টোবর '৯৭ পৃ : ২৭।
২০৭। ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন, *বাংলাদেশ ঃ সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ পৃঃ ৫৩,৫৪।
২০৮। মাহমুদ শফিক, নির্বাচন' ৯৬ দেখালে পিঠ নয় ...., *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
খালেদা জিয়ার শাসনকালঃ মূল্যায়ন

ভূমিকাঃ খালেদা জিয়ার শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা করতে হলে উক্ত সময়ে খালেদা জিয়া সরকারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, সংসদীয় কার্যক্রম ও নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯১ বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত তাই একটি সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। অর্থনৈতিক গতিধারা আলোচনা করার পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রসংগে অর্থনীতিবিদদের মতবাদ আলোচনা করার পাশাপাশি উন্নয়নের মডেল সমূহ ও এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন আলোচনা করা প্রয়োজন। কাজেই অর্থনৈতিক গতিধারা পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা খালেদা জিয়ার শাসন কালে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবো। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণালাভ করলে রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ও ধারণা লাভ করা যাবে।

কেবল মাত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডই নয় খালেদা জিয়ার শাসনকালের মূল্যায়ন করতে হলে সংসদীয় কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬) পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণই হল সংসদ। সংসদই সকল ক্ষমতা উৎস। তাই উল্লেখিত সময়ে সংসদের কার্য প্রণালী, সংসদ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন। অন্যান্য সংসদের সাথেও কোন কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলাচনা প্রয়োজন রয়েছে যার মাধ্যমে ৫ম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

সর্বোপরি খালেদা জিয়ার সরকারের মূল্যায়ন করতে হলে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার ও উক্ত নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী খালেদা জিয়ার শাসনকালের উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা প্রয়োজন।

অতএব, উল্লেখিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে একদিকে খালেদা জিয়া সরকারের কর্মকান্ড সম্পর্কে যেমন ধারণা লাভ করা যাবে অন্যদিকে এর আলোকে উন্নয়ন সম্পর্কে ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

ক) অর্থনৈতিক গতিধারা (১৯৯১ - ১৯৯৬)

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের পর্যালোচনা করতে হলে, খালেদা জিয়ার শাসনামলের অর্থনৈতিক গতিধারাকেও পর্যালোচনা করা দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে। L.W. Pye তার Aspect of Political Development গ্রন্থেও বলেছেন, "Political Development as the political pre-requisite of Economic Development" [১] উক্ত পুস্তকে তিনি আরও বলেন,- "the economests were quick to point out that political and social conditions could play a decisive role in impeding or facilitating advance in per capita income, and thus it was appropriate to conceive of political development, as the state of the polity which might facilitate economic growth."[২] S.P. Huntington অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, তিনি তার গ্রন্থে আমেরিকার উদাহরণই দিয়ে উল্লেখ করেন, "American Thinking the causal chain was: economic assistance promotes economic development, economic development promotes political stability".[৩] কাজেই অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। আবার দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশে এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারনেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রায়শই ব্যহত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হয় না। তা ছাড়া রাজনীতি এবং অর্থনীতি পরস্পর ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ডঃ আবদুল অদুদ ভূইয়া, Dominick Harrod এর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন, " Politices and economics are inextricably bound up with one another when politics is taken to mean the frame work of ideas for running society".[৪] আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে অধ্যাপক স্নাইডার (Snider) বলেন যে, "দীর্ঘ মেয়াদে মাথা পিছু উৎপাদন বৃদ্ধিই হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন"[৫] অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে একই পুস্তকে অধ্যাপক পিএ ব্যরান (P.A. Baran) এর বক্তব্য থেকে ও দেখা যায়, "বস্তুগত সম্পদের মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধিই হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।" [৬]

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন নির্দিষ্ট মডেল বা নিয়মে সম্পাদিত হয় না। এক একটি দেশ এক একটি মডেলের ভিত্তিতে উন্নয়ন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত মডেল ক্রিয়াশীল সেগুলো থেকে কয়েকটি মডেল আলোচনা করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

Adam Smith Modelঃ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ মুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামোয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বিশ্বাসী, ছিলেন। তার মতে, "মুক্ত বা অবাধ অর্থনৈতিক তত্ত্ব অর্থাৎ Laissez Fair Theory বা Let Alone Theory অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করবে।"[৭] অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

Keynesian Model: প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ জন, এম, কীনস তার অর্থনৈতিক ধারণা ও মতবাদ প্রকাশ করেছেন "General Theory of Employment, Interests and Money" গ্রন্থে। এই মডেলের মূল বক্তব্য হলো, " একটি দেশের সামগ্রিক আয় সে দেশে বিদ্যমান পূর্ণ কর্মসংস্থানের (Full Employment) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কর্মস্থান স্তর যত অধিক হবে জাতীয় আয় ও তত বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থান কি পরিমান হবে তা নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর। আবার এ কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়"[৮] এ ছাড়াও কিনসে সঞ্চয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, সঞ্চয় বৃদ্ধি হলে বিনিয়োগ বাড়বে। নতুন বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর ফলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। যা প্রকারন্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবে।

Capitalist Modelঃ পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ কম থাকে বলে এই ব্যবস্থায় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এ ব্যবস্থার উৎপাদন উপকরণ গুলো পুঁজিপতিদের মালিকানাধীনে থাকে এবং শ্রমিকরা তাদের জীবিকার্জনের জন্য শ্রম বিক্রি করে। এতে উৎপাদন সম্পর্ক (Relation of Production) উৎপাদন শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সে সঙ্গে শ্রম বিভাগের ও (Division of Labour) প্রসার ঘটে। সমাজ ব্যবস্থায় সূচিত হয় এক বিরাট পরিবর্তন।"[৯]

রাজনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে উল্লেখিত অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের আলোকে বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার শাসনামলে গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপ এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। আমরা জানি খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এর মডেল অনুযায়ী খালেদা জিয়ার শাসনামলে মুক্ত বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করছে। তা ছাড়া পুর্ব থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি মিশ্র অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ধাবমান। আবার জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে কীনসীয় মডেল ও কার্যকর। কাজেই খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখিত তিনটি মডেলই ক্রিয়াশীল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রন অনেক খানি হ্রাস করা হয়েছে। শুল্কের মাত্রা যৌক্তিক আকারে নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন শিল্পনীতি সংস্কারের মাধ্যমে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। কর কাঠামো ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর (VAT) আরোপ করায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখিত সময়ে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমানো হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক খাত সমূহের উন্নয়নের যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে গুলো আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোক পাত করা হল।

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ বি এন পি ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) ঘোষণা করে ছিল এরশাদের পতনের পর এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ভার পুরোটাই খালেদা জিয়া সরকারের উপর বর্তায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ৬ মার্চ প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬২ হাজার কোটি টাকার সংশোধিত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) অনুমোদন লাভ করে। সরকারী খাতে ৩৪ হাজার ৭শ কোটি টাকা এবং বেসরকারী বিনিয়োগে অবদান ২৭ হাজার ৩'শ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়। পরিকল্পনার সংশোধিত আকারের মধ্যে ৩৪ হাজার ৫শ ৫০ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ খাত এবং ২৭ হাজার ৪'শ ৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে পূরণ করার কথা বলা হয়। সরকারী খাতে বিনিয়োগের আভ্যন্তরীন সম্পদের পরিমান ১১ হাজার ৯শ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমান ধরা হয়েছে ২২ হাজার ৮'শ কোটি টাকা। বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ২২ হাজার ৬শ ৫০ কোটি টাকা, আভ্যন্তরীন সম্পদ থেকে এবং ৪ হাজার ৬শ ৫০ কোটি টাকা বিদেশী খাত থেকে।[১০] এ ছাড়াও সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নিম্নে খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের ওপর আলোচনা করা হল।

ক) **প্রবৃদ্ধি ঃ** একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় আয় ও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক। খালেদা জিয়ার শাসনামলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) গতি ছিল উর্ধ্বমূখী। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে অর্থাৎ খালেদা জিয়া সরকারের বিদায়ের সময় দেশের মোট জিডিপি ছিল প্রায় ১৩০১১৮ কোটি টাকা বা ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত বছরে (১৯৯৫/৯৬) প্রকৃত জিডিপি'র (১৯৮৪/৮৫ স্থির মূল্যে) প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৭%।[১১] খালেদা জিয়ার সরকার যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ ১৯৯০/৯১ সালে মোট জিডিপি ছিল ৮৩৪৩৯ কোটি টাকা এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪%। ১৯৯১/৯২ সালে ছিল ৪.২% ; ১৯৯২/৯৩ সালে ৪.৫%, ১৯৯৩/৯৪ সালে ৪.২% এবং ১৯৯৪/৯৫ সালে এ হার ছিল ৪.৪%। সারণী (৬.১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৮০-৮৪ সালে গড় জিডেপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.১%, আবার ১৯৮৫-৮৯ সাল পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির এ গড় ছিল ৩.৪% কেবল ১৯৮৯/৯০ সালে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৬ এ পৌছায়। কিন্তু ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫/৯৬ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধির হার অর্থনৈতিক গতিশীলতা নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.১

সমষ্টিক অর্থনীতি নির্দেশিকা, আর্থিক বছর ১৯৮০-৯৬

	১৯৮০-৮৪(গড়)	১৯৮৫-৮৯(গড়)	১৯৮৯-৯০	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%) (স্থির মূল্যে)	৩.১	৩.৪	৬.৬	৩.৪	৪.২	৪.৫	৪.২	৪.৪	৪.৭
মাথাপিছু আয় (টাকা)	৩০৬৬	৫২৪০	৬৮৬১	৭৬১৩	৮১৩৭	৮৩৭৫	৮৯১৩	৯৯৪৩	১০৮২১
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	১৪৫	১৭৪	২০৮	২১৩	২১৩	২১৪	২২৩	২৪৭	২৬৫
(জিডিপির তুলনায় শতকরা হার)									
সঞ্চয়									
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১.৬	২.৯	২.৭	৪.১	৫.৮	৭.০	৭.৫	৭.৭	৭.৮
জাতীয় সঞ্চয়	৪.৪	৫.৮	৯.২	১০.৯	১৩.০	১৪.৪	১৫.০	১৫.৬	১৫.৩
বিনিয়োগ									
মোট বিনিয়োগ	১৪.৪	১২.৭	১২.৮	১১.৫	১২.১	১৪.৩	১৫.৪	১৬.৬	১৭.০
সরকারী	৬.২	৬.২	৬.৪	৫.৭	৫.৫	৬.৪	৭.৬	৭.২	৬.৩
বেসরকারী	৮.১	৬.২	৬.৪	৫.৮	৬.৬	৭.৯	৭.৮	৯.৪	১০.৭
ভোগ	-	৯৬.৮	৯৭.৩	৯৫.৯	৯৪.২	৯৩.০	৯২.৬	৯২.৩	৯২.২
বাজেট									
মোট আয়	৮.৯	৯.০	৯.৩	৯.৬	১০.৯	১২.০	১১.৭	১২.১	১১.৯
কর থেকে আয়	৭.২	৭.২	৭.৮	৭.৮	৮.৮	৯.৬	৯.২	৯.৫	৯.৪
মোট ব্যয়	১৮.৪	১৬.৬	১৭.১	১৬.৪	১৫.৯	১৭.৬	১৮.০	১৯.২	১৮.১
সার্বিক বাজেট ঘাটতি	-৯.৩	-৭.৫	-৭.৯	-৭.২	-৫.৯	-৫.৯	-৫.৯	-.৭.১	-৬.২
লেনদেনের ভারসাম্য									
রপ্তানী	৫.৪	৬.০	৬.৮	৭.৩	৮.৪	৯.৮	৯.৮	১২.০	১১.৯
আমদানী	১৮.৩	১৫.৮	১৬.৯	১৫.০	১৪.৮	১৬.৮	১৬.২	২০.২	২০.৪
মূল্য স্ফীতির হার	১৩.৪	১০.১	৯.৩	৮.৯	৫.১	১.৩	১.৮	৫.২	৫.০
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (মিঃ মার্কিন ডলার)			৫২০	৮৮০	১৬০৮	২১২১	২৭৬৫	৩০৭০	২০৩৯
বিনিময় হার (টাকা মার্কিন ডলার)	২০.১০	২৯.৯৯	৩২.৯৩	৩৫.৬৮	৩৮.১৫	৩৯.১৪	৪০.০০	৪০.২০	৪০.৮৪

উৎস ঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ; জুন ১৯৯৬ ইং পৃঃ পরিশিষ্ট - ৩।

সারণী ৬.২ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এশিয়ার অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশের প্রবৃদ্ধি বিগত ১৯৯৪-৯৬ সময়ে নিম্নমুখী। বিশেষ করে কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং থাইলেন্ডের প্রবৃদ্ধি ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ সালে কম । হংকং ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সালের প্রবৃদ্ধি ৪.৭% বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালের প্রবৃদ্ধির সমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একদিকে উর্ধ্বমুখী এবং অন্যদিকে কয়েকটি সমৃদ্ধশালী দেশের কাছাকাছি কিংবা সমান। অন্যদিকে সারণীতে প্রদর্শিত সার্কভূক্ত ৫টি দেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী ৬.৮, দ্বিতীয় অবস্থানে নেপাল এবং পাকিস্তান ৬.১ এর পরই বাংলাদেশের অবস্থান ৪.৭ এবং সর্ব নিম্নে শ্রীলংকার অবস্থান ৩.৮। সুতরাং বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভাল অবস্থানে বলা চলে।

মাথাপিছু আয়ঃ সারণী ঃ ৬.১ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়ও উর্ধ্বমুখী খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯০/৯১ সালে ৭৬৩১ টাকা বা ২১৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫/৯৬ সালে ১০৮২১ টাকা বা ২৬৫ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১৯৮০-৮৪ সালের যার গড় ছিল ৩০৬৬ টাকা বা ১৪৫ ডলার এবং ১৯৮৫-

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণী (৬.২) দ্বারা এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক ভূক্ত দেশ সমূহের (১৯৯৪-৯৬), ৩ বছরের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (Out put) দেখান হল।

সারণী ৬.২
এশিয়ার অন্যান্য দেশ ও দঃ এশিয়ার কয়েকটি দেশের ৩ বছরের প্রবৃদ্ধি

এশিয়ার কয়েকটি দেশ				সার্কভূক্ত কয়েকটি দেশ			
দেশ	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	দেশ	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬
হংকং	৫.৪	৪.৭	৪.৭	বাংলাদেশ	৪.২	৪.৪	৪.৭
কোরিয়া রিপাবলিক	৮.৬	৯.০	৭.০	ভারত	৭.২	৭.১	৬.৮
সিঙ্গাপুর	১০.৫	৮.৮	৭.০	নেপাল	৭.৯	২.৯	৬.১
ইন্দোনেশিয়া	৭.৫	৮.২	৭.৮	পাকিস্তান	৪.৫	৪.৪	৬.১
মালেয়েশিয়া	৯.১	১০.১	৮.৮	শ্রীলঙ্কা	৫.৭	৫.৬	৩.৮
ফিলিপিনস	৪.৪	৪.৮	৫.৫				
থাইল্যান্ড	৮.৯	৮.৭	৬.৭				

সূত্রঃ *Trade And Development Report, 1997*. Report by Secretariat of the United Nations conference on Trade and Development. United Nations, New York and Geneva, 1997. P-14.

৮৯ সালের গড় ৫২৪০ টাকা ১৭৪ ডলার । সুতরাং দেখা যাচ্ছে খালেদা জিয়ার শাসনামলে মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে।

খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগঃ

"আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ১৯৯০/৯১ সালে মোট দেশ উৎপাদনের ৪% হতে ১৯৯৫/৯৬ সালে ৭.৮% এ বৃদ্ধি পায়। তবে বিগত ১৯৯২/৯৩ হতে ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত সঞ্চয়ের হার ৭.৮% এর মধ্যে সীমিত রয়েছে।[১২] একই সময়ে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বেড়েছে ১৯৯০/৯১ সালের ১০.৯% হতে ১৯৯৫ এ ১৫.৩%। অপর দিকে একই সময়ে বিনিয়োগ বেড়েছে ১১.৫% হতে ১৭% এ তবে উক্ত সময়ে সরকারী বিনিয়োগের থেকে বেসরকারী বিনিয়োগ হার বেশী। ১৯৯০/৯১ সাল থেকে ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৭% থেকে ৬.৩% এ মাত্র পক্ষান্তরে একই সময়ে বেসরকারী বিনিয়োগ ৫.৮% হতে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুন ১০.৭% এ উন্নীত হয়েছে। (সারণী ৬.১ দ্রষ্টব্য)।

গ) রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাঃ

একটি সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মূল চালিকা শক্তি রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা।" বাংলাদেশে ১৯৯০/৯১ থেকে ক্রমবর্ধমান করভিত্তি প্রশস্থ করণ এবং নিয়ন্ত্রিত রাজস্ব ব্যয়ের কারণে একদিকে যেমন রাজস্ব উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। অপর দিকে তেমনি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র সমুহে, যেমন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ক্ষেত্রে বর্ধিত বরাদ্দ সরকারী ব্যয়ের মান উন্নত করেছে।"[১৩] ডঃ এমাজ উদ্দিন আহম্মদ বলেন, "১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ থেকে পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির শুষ্ক ঘাটেও লেগে ছিল প্রাণ বন্যার স্পর্শ। প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসেনি বটে, তথাপি অর্থনীতির কাঠামোগত সমন্বয় সাধন, বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করণ প্রভৃতির মাধ্যমে যে শুভ সূচনা হয়েছিল তার ফলে উন্নয়ন মূলক কর্ম কান্ডের ব্যয় ভারের শতকরা ৪৩ ভাগ পর্যন্ত মিটানো সম্ভব হয়েছিলো আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে, এবং তা মাত্র তিন বছরের মধ্যে" ।[১৪] বস্তুতঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের

অর্থনীতির একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে উঠে ছিল। ১৯৯১ সালে এই সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কর ব্যবস্থার সহজীকরণ এবং শুল্ক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করতে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছিলেন সে গুলো হলোঃ

১. **মূল্য সংযোজন করঃ** খালেদা জিয়ার সরকারের কর সংস্কারের কেন্দ্র বিন্দু হলো মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তন। রাজস্ব ব্যবস্থাকে আধুনিক গতিশীল ও উৎপাদনশীল কর ব্যবস্থার জন্য মূল্য সংযোজন কর বা VAT আরোপ করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের ৯ জুন জাতীয় সংসদ কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর বিল, ১৯৯১ পাস হয়ে ১৯৯১ সালের ২২নং আইন হিসেবে ১০ জুলাই ১৯৯১ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর একই দিন গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিনত হয়। ১ জুলাই (১৯৯১) থেকে কার্যকর এ মূল্য সংযোজন কর বিদ্যমান বিক্রয় করের পরিবর্তে প্রবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতে, এ নতুন কর ব্যবস্থাপনায় আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশ এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্তে প্রবেশ করবে। কর ভিত্তি সম্প্রসারিত হওয়া ছাড়া সরকারী প্রশাসন এবং করদাতা ব্যবসায়ী লেনদেনে বাধ্যতামূলকভাবে হিসাব নিকাশ সংরক্ষনে যত্নবান হবে। রাজস্ব আয়ের কাঠামোতেও নতুন ধারা সূচনা হবে। সর্বোপরি এ নতুন ব্যবস্থায় কর রাজস্ব আদায় ত্বরান্বিত হবে।"[১৫] প্রথমে কিছু কৃষি পণ্য ও প্রাথমিক পণ্য ব্যতীত সকল আমদানী পণ্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট আরোপ করা হয়ে ছিল পরবর্তীতে এ মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধি করা হয়। বস্তুত এ মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকারের কর কাঠামো শক্তিশালী হয়ে ছিল। বর্তমানে সরকারের রাজস্ব আদায়র ক্ষেত্রে ভ্যাট একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া।

২. **শুল্ক কাঠামো সহজীকরণঃ** ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে শুল্ক কর কাঠামো সহজীকরণের উদ্দেশ্যে আমদানী পর্যায়ের উন্নয়ন সারচার্জ ও রেগুলেটরী ডিউটি প্রত্যাহার করে, উহার ফলে যে রাজস্ব ঘাটতি হইবে তাহা পূরণ করার জন্য কতিপয় পণ্য ব্যতীত সকল পণ্যের উপর শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে"।[১৬] শুল্ক কাঠামো সহজীকরণ করার ফলে আমাদানী বৃদ্ধি পায় যার ফলে শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়।

৩. **শুল্ক কাঠামো যুক্তিযুক্ত করণঃ** ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে কর সংস্কার পদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শুল্ক কাঠামো যুক্তিযুক্ত করণ যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ হার সমূহ হ্রাস, হারের সংখ্যা কমানো বরং শুল্ক স্তর বা ব্র্যান্ড সমূহ সংকোচন । এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গড় আমদানি শুল্কের হার ১৯৯০/৯১ সালের ৮৫% থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালে ২২% এ নেমে আসে এবং দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের মাত্রা, যা অতিমাত্রা বেশী ছিল তা যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে আনা হয়েছে। শুল্ক হার হ্রাসের কারণে আমদানী বেড়েছে, যার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, করের হার হ্রাস করা সত্ত্বেও আমদানী শুল্ক আগামীতে ও তার চিরাচরিত রাজস্ব আহরণকারী ভূমিকা পালন করবে। কর ব্যবস্থার অসংগতি দূর ও স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট হার ও কর হারের বহুমাত্রিকা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে।[১৭]

৪. **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ঃ** ১৯৯৫/৯৬ সালের বাজেটও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সংস্কার অব্যাহত রাখা হয়েছে। ঐ বছর প্রত্যক্ষ আয়কর বিধিও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে সবধরণের করপোরেট আয় করের হার কমানো হয়েছে। রপ্তানী ক্ষেত্রে আয়করের ৫০% রেয়াতের সুবিধা চা, পাট এবং চামড়ার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বোনাস শেয়ার ছাড়া অন্য সকল শেয়ার হস্তান্তর জনিত মূলধন লাভ এর ক্ষেত্রে কর মওকুফ করা হয়েছে। স্বনিরূপনের জন্য ন্যূনতম করের পরিমান ১৮০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকায় হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়াও বীমা শিল্পসহ মূলধন লাভের ওপর প্রযোজ্য করের হার কমানো হয়েছে।

পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে আমদানী শুল্ক, আবগারী শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করের বিরোধ সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে আপীল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। বিশ্ব শুল্ক সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুসারে শুল্ক আইনের প্রথম তফসিলে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুল্কের সর্বোচ্চ হার ৬০% থেকে ৫০% এ হ্রাস করা হয়েছে। ব্যাপক হারে শুল্ক হার কমানো হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান হারে শুল্ক হার হ্রাস করণ প্রক্রিয়া ১৯৯৫/৯৬ অর্থবছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে / ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে বহু সংখ্যক শিল্পজাতও অন্যান্য উপকরণের ১০২৮ টি পণ্যের শুল্ক হার ৩০% হতে ২২.৫% এ হ্রাস করা হয়। এছাড়াও আরও অনেক পন্যের উপর আরোপিত নিম্ন শুল্ক হার আরো হ্রাস করা হয়।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

কর ব্যবস্থার উল্লেখিত সংস্কার ছাড়াও ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত বাজেটে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সহ বিবিধ পণ্য সমূহের শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে। কর ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে। কর ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে ১৯৯৩/৯৪ সালের অর্থনৈতিক জরিপ রিপোর্টে বলা হয় "এক দিকে অনুন্নয়ন খাতের চলতি ব্যয় বৃদ্ধি রোধ কল্পে গৃহীত ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচী ও কৃচ্ছতা সাধনের ফলে ভোগ ব্যয় (Consumption Expenditure) ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। অপরদিকে, রাজস্ব আয়সহ অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি কল্পে গৃহীত সক্রিয় সমর্থক (Pro-active) নীতি মালার ফলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (Domestic Savings) ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায়।"[১৯] কর ব্যবস্থার এই ব্যাপক সংস্কারের ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সহজতর হয়েছে, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশিষ্ট ৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৫/৮৬ সাল থেকে ১৯৯০/৯১ এর তুলনায় ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিক্রয় করে পরিবর্তে মূল্য সংযোজন কর আরোপের ফলে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০/৯১ সালে যেখানে বিক্রয় কর থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি ৮২০ কোটি টাকা, যেখানে ১৯৯১/৯২ সালে প্রথম বছরেই মূল্য সংযোজন করের মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয়েছে প্রায় দ্বিগুন ১৬৭৫ কোটি টাকা, পরবর্তী বছরে ১৯৯২/৯৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫০০ কোটি টাকা এবং সরকারের শেষ- অর্থ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৫/৯৬ সালে মূল্য সংযোজন কর বাবদ রাজস্ব প্রাপ্তি ৩৭৪২ কোটি টাকা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সংস্কার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আই এম এফ) এর আবাসিক প্রতিনিধি সালেদিন কেনিসিও ৪ অক্টোবর (১৯৯৩) এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "বহুদেশ অর্থনীতি সংস্কার কালীন সময়ে স্থবির থাকলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি রয়েছে। সংস্কারকালে বহুদেশের অর্থনীতি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্য করা গেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক"।[২০] কাজেই দেখা যাচ্ছে কর ব্যবস্থা সংস্কারের ফলে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যা কিনা বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রসংশিত হয়েছে।

ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) ও অভ্যন্তরীণ সম্পর্কঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্ধ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। বিএনপি সরকার গঠনের পূর্বে ১৯৯০/৯১ সালে যেখানে এডিপির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫৬৬৮ কোটি টাকা, ১৯৯৫/৯৬ সালে সেখানে লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছিল দ্বিগুনের ও বেশী ১২১০০ কোটি টাকা। বিএনপি সরকারের ব্যাপক কর সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় খালেদা জিয়া সরকারের শেষ বছরগুলোতে এডিপি'র একটি বৃহত্তর অংশের অর্থায়ন দেশীয় সম্পদ দ্বারা যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

বিএনপি সরকার ১৯৯১ সালের ১৯ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের পর পূর্ববর্তী সরকারের এডিপি'র মূল লক্ষ্য মাত্রা বৃদ্ধি করে ৫৬৬৮ কোটি টাকা থেকে ৬১২৬ কোটি টাকায় উন্নীত করেন এর মধ্যে দেশীয় সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সম্পদ ২৫% যা পুর্ববর্তী সরকারের ছিল -১০%[২১]। ১৯৯১/৯২ সালে বিএনপি একক ভাবে ক্ষমতায় ছিল, ঐ বছর এডিপির লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল ৭৫০০ কোটি টাকা, সংশোধিত লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৭১৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে দেশীয় অর্থায়ন ছিল ২১২৮ কোটি টাকা যা এডিপি'র শতকরা হিসেবে আভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩৫.৩৩%। পরবর্তী বছর ১৯৯২/৯৩ সালে আভ্যন্তরীণ অংশ ছিল ৩৩.৩৩%, ১৯৯৩/৯৪ সালে আভ্যন্তরীণ অংশ ৪০.১৯% এ বৃদ্ধি পায়। তবে এডিপি'র সর্বাধিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় ছিল ১৯৯৪/৯৫ সালে ঐ বছর এডিপি'তে লক্ষ্য মাত্র ছিল ১১০০০ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রায় তা বৃদ্ধি করে ১১১৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করেন। প্রকৃত ব্যয় অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী ১০৩০৩ কোটি টাকা। ঐ বছর এডিপি'র অর্থায়নে আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪৭৯৮ কোটি টাকা যা শতকরা হিসেবে ৪৩.০৩%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও এডিপি অর্থায়নে দেশীয় সম্পদের পরিমাণ ঃ

বছর	মূল লক্ষ্য মাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ব্যয়	এডিপির জন্য আভ্যন্তরীণ সম্পদ	এডিপির শতকরা হিসেবে আভ্যন্তরীণ সম্পদ
১৯৯০/৯১	৫৬৬৮	৬১২৬	৫২৭০	১৩২৮	২৫.২০%
১৯৯১/৯২	৭৫০০	৭১৫০	৬০২৪	২১২৮	৩৫.৩৩%
১৯৯২/৯৩	৮৬৫০	৮১২১	৬৫৫০	২১৮৩	৩৩.৩৩%
১৯৯৩/৯৪	৯৭৫০	৯৬০০	৮৯৮৩	৩৬১০	৪০.১৯%
১৯৯৪/৯৫	১১০০০	১১১৫০	১০৩০৩	৪৭৯৮	৪৩.০৩%
১৯৯৫/৯৬	১২১০০	১০৪৪৭	১০০১৬	৪৪১৪	৪২.২৫%
১৯৯৬/৯৭	১২৫০০	১১৭০০	১১০৪১	৫৭২৫	৪৮.৯৬%
১৯৯৭/৯৮	১২৮০০	১২২০০	১১০৩৭	৫৫২১	৪৫.২৫%
১৯৯৮/৯৯	১৩৬০০	১৪০০০	১২৫০৯	৪৩৪৭	৩১.০৫%

সূত্রঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ১৯৯৬ এবং ২০০০*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২৮, ২৯ এবং ২৬, ২৮।

১৯৯৫/৯৬ সালের বার্ষিক এডিপি অনুমোদনকালে এনইসির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ''বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্যের সাথে দেশীয় অবদান বর্তমানে ৪৩ শতাংশ। বিগত সরকারের সময় যা ছিল শূন্যের কাছাকাছি।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''দারিদ্র বিমোচনে, নিরক্ষরতা দূরীকরণে কর্মসংস্থানের প্রসার ছাড়াও সরকার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, রফতানি আয় বৃদ্ধি করেছে। জাতীয় আয় এবং বিনিয়োগ ও বেড়েছে''[২২]। ১৯৯৫/৯৬ সালে এডিপি'র লক্ষ্য মাত্রা বৃদ্ধি করে ১২১০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হলেও ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দারুনভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৯৬ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে ৫৪ দিনই ছিল হরতাল ধর্মঘট অসহযোগ আন্দোলন, অর্থাৎ মাসে গড়ে ১৮দিন। ফলে সরকার তার শেষ মাস গুলিতে কোন কাজ করতে পারেন নাই। তা সত্ত্বেও আর্থিক বছর শেষে সংশোধিত ১০৪৪৭ কোটি টাকার মধ্যে দেশীয় সম্পদের অর্থায়ন ৪৪১৪ কোটি টাকা যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছিল। যার শতকরা হার ৪২.২৫। পূর্ববর্তী বছরের থেকে সামান্য কম। তবে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে দেশীয় অর্থায়ন ৪২.২৫% আশাতীত ছিল। যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করতো, সরকারকে কাজ করতে দেয়া হতো, উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত থাকতো তাহলে এডিপি'র অর্থায়নে দেশীয় সম্পদের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে যদি তুলনা করি তাহলেও দেখা যাবে খালেদা জিয়ার শাসনকাল এডিপি'র অর্থায়নে দেশীয় সম্পদের যোগান এবং এডিপি'র লক্ষ্যমাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী ছিল। ১৯৯৫/৯৬ বছরে অর্থাৎ খালেদা জিয়ার শাসনামলের শেষ বর্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও এডিপির লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২১০০ কোটি টাকা ঐ বছর এডিপি'তে আভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাণ ছিল ৪২.২৫% পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮/৯৯ বছরে এডিপি'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন ১৩৬০০ কোটি টাকা এবং ঐ বছর দেশীয় অর্থায়নের অংশ ছিল মাত্র ৩১.০৫% যদিও আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম বছর ১৯৯৬/৯৭ সালে আভ্যন্তরীণ অংশ ৪৮.৯৬% ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ছিল বিএনপি'র গৃহীত অর্থনৈতিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতার ফলে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর এডিপি'তে দেশীয় অর্থায়নের পরিমাণ নিম্নমুখী লক্ষ্য করা যায় ১৯৯৬/৯৭ সালের ৪৮.৯৬% থেকে ১৯৯৭/৯৮ সালে হ্রাস পেয়ে ৪৫.২৫% এ নেমে আসে এবং ১৯৯৮/৯৯ সালে ব্যাপক হ্রাস পেয়ে ৩১.০৫ এ নেমে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে খালেদা জিয়ার সরকার যেখানে ১৯৮৯/৯০ সালের -১০% থেকে বিদায়ের বছর ৪২.২৫% এ

Dhaka University Institutional Repository

উন্নীত করেন সেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের এ হার নিম্নমুখী সুতরাং এ ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকারের অর্থনৈতিক ফল ইতিবাচক ছিল এ কথা বলা যায়।

ঙ) মুদ্রা পরিস্থিতিঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে দেশের সার্মগ্রিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত নীতি অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। উল্লেখিত শাসনকালে অনুসৃত নীতিতে বেসরকারী খাতের চাহিদা সমন্বিত করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা সৃষ্টি এবং মূল্য স্ফীতি নিয়ন্ত্রনের উপর জোর দেয়া হয়েছিল। যুগপৎভাবে স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য বিবেচনা করে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের চলমান পরিবর্তনের ধারার প্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে পরোক্ষ নীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনের নীতি অনুসরণ বলবৎ রাখা হয়। "অনেক উন্নয়নশীল দেশ মুদ্রা নীতি প্রণয়নে নানাবিধ কারণে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সরকারের রাজস্ব ঘাটতি পূরনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থায়ন প্রায়ই অপরিহার্য হয়ে দাড়ায় এবং এতে বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারের এহেন আর্থিক দাবী পূরণের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে মূল্য স্ফীতির হার নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়ায়। এমতাবস্থায়, শুধু যে সম্পদের প্রবাহ ব্যহত হয় এবং বিনিয়োগের মানের উপর প্রভাব পড়ে তাই নয়, উৎপাদন ও রপ্তানীর সাবলীলতা ও (Buoyancy) খর্ব হয় যার ফলে মুদ্রার বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।"[২৩] ঢাকাস্থ বিশ্ব ব্যাংক মিশনের প্রধান ক্রিষ্টোফার আর উইলোবী ১৯৯৩ সালের ৩ অক্টোবর দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ঐ বছরের বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর আলোচনা কালে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেন, "বাংলাদেশের মুদ্রা স্ফতির হার খুবই কম। ---- মুদ্রাস্ফতির কম এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এই সরকারের । বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করছে, এতে আমি সন্তুষ্ট। এর ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবে। এতে দক্ষতা বাড়বে । পন্যের মান বাড়বে। বাংলাদেশের পণ্যের মান ভাল। শ্রম বাজার সস্তা বলে পণ্য সস্তায় পাওয়া যাবে। এদেশের শ্রমিকরা দক্ষ। অথচ এদের দুর্ভাগ্য, আজ পাট শিল্প রুগ্ন। এ জন্য দায়ী রাজনীতিকরা । বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এদের বিভ্রান্ত করছেন, বিপথগামী করছেন।"[২৪]

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুদ্রার রিজার্ভ ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া সরকারের পতনের পর বর্তমান সরকারের অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে মুদ্রার রিজার্ভ ব্যাপক হারে হ্রাস পেতে থাকে। সারণী ঃ ৬.৪ এ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দেখান হলঃ

সারণী- ৬.৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮১/৮২ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ১২১ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত কখনও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তিন অংকে পৌঁছায়নি অর্থাৎ ১০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় নাই। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৮/৮৯ সালে সর্বোচ্চ ৯১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাগ্রহণের ১ বছরের মধ্যে ১৯৯১/৯২ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পূর্ববর্তী বছরের দ্বিগুন অর্থাৎ ১৯৯০/৯১ সালের ৮৮০ মিঃ ডলার থেকে ১৯৯১/৯২ সালে ১৬০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এরপর থেকে রিজার্ভের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ১৯৯৪/৯৫ সালে রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ৩০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ১৯৯৫/৯৬ সালে সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্থবির থাকায় ১৯৯৫/৯৬ সালে রিজার্ভের পরিমাণও হ্রাস পেয়ে ২০৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে আসে। যদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল থাকতো তা হলে রিজার্ভ বৃদ্ধির যে ধারাবাহিকতা ছিল তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩০০ থেকে ৩৫০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারত। পক্ষান্তরে বিএনপির পতনের পর ১৯৯৬ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যাপকহারে হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯৫/৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.৪

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১৯৮১/৮২ - ১৯৯৮/৯৯ পর্যন্ত

বছর (জুন স্হিতি)	মার্কিন মিলিয়ন ডলার	বছর (জুন স্থিতি)	মার্কিন মিলিয়ন ডলার
১৯৮১/৮২	১২১	১৯৯০/৯১	৮৮০
১৯৮২/৮৩	৩৫৮	১৯৯১/৯২	১৬০৮
১৯৮৩/৮৪	৫৪০	১৯৯২/৯৩	২১২১
১৯৮৪/৮৫	৩৯৫	১৯৯৩/৯৪	২৭৬৫
১৯৮৫/৮৬	৪৭৬	১৯৯৪/৯৫	৩০৭০
১৯৮৬/৮৭	৭১৫	১৯৯৫/৯৬	২০৩৯
১৯৮৭/৮৮	৮৫৬	১৯৯৬/৯৭	১৭১৯
১৯৮৮/৮৯	৯১৩	১৯৯৭/৯৮	১৭৩৯
১৯৮৯/৯০	৫২০	১৯৯৮/৯৯	১৫২৩

উৎসঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০০০, পৃষ্ঠাঃ ১৭৩

সালে বিএনপি'র শেষের বছর যেখানে রিজার্ভ ছিল ২০৩৯ মিঃ মার্কিন ডলার সেখানে ১৯৯৬/৯৭ আওয়ামী লীগের প্রথম বছর রিজার্ভ হ্রাস পেয়ে ১৭১৯ মিঃ মার্কিন ডলারে পৌছে। এর পর এই হ্রাসের ধারা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৯৮/৯৯ সালে বর্তমান সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নেমে আসে ১৫২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা বিএনপি সরকারের ১৯৯৪/৯৫ সালের রিজার্ভের অর্ধেকের ও কম। কাজেই দেখা যাচেছ খালেদা জিয়ার শাসনামলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সরকারের শাসনামলে থেকে খুবই শক্তিশালী ছিল যা অর্থনৈতিক উন্নতির মানদন্ড নির্দেশ করে।

বৈদেশিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তিঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে বৈদেশিক সাহায্য আনুপাতিক হারে অন্যান্য বছরের তুলনায় খুব বেশী ছিল না। ১৯৭৯/৮০ সাল থেকে ১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য ও অবমুক্তির ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় কোন বছর অঙ্গীকার একটু বেশী এবং কোন বছর কম। তবে খালেদা জিয়ার শাসনামলের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক মুদ্রার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অবমুক্তি আনুপাতিক হারে বেশী ছিল, এমন কি কখনও অঙ্গীকারের চেয়ে অবমুক্তি বেশী ছিল । কিন্তু বর্তমান সরকারের তিন বছরের মধ্যে কখনও অঙ্গীকারের চেয়ে অবমুক্তি আনুপাতিক হারে অনেক কম ছিল। সারণী ৬.৫ পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫/৯৬ এর মধ্যে ১৯৯২/৯৩ সালে মোট অঙ্গীকার কম থাকলেও ঐ বছর সরকারের ইতিবাচক কার্যক্রমের ফলে অবমুক্তির পরিমাণ ছিল আরও বেশী ১২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৬৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । ১৯৯০/৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.৫

বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অংগীকারও অবমুক্তি ঃ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	অংগীকার(Commitment)			ব্যয়ন (Disbursement)		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৮৯/৯০	৮৮৫	১২৯০	২১৭৫	৭৬৬	১০৪৪	১৮১০
১৯৯০/৯১	৪৮৫	৮৮৫	১৩৭০	৮৩১	৯০১	১৭৩২
১৯৯১/৯২	১১৪০	৭৭৫	১৯১৫	৮১৭	৭৯৪	১৬১১
১৯৯২/৯৩	৭৩৪	৫৪০	১২৭৪	৮১৮	৮৫৭	১৬৭৫
১৯৯৩/৯৪	৪৬৪	১৯৪৬	২৪১০	৭১০	৮৪৯	১৫৫৯
১৯৯৪/৯৫	৮৬১	৭৫১	১৬১২	৮৯০	৮৪৯	১৭৩৯
১৯৯৫/৯৬	৮৬৪	৪১৬	১২৮০	৬৭৭	৭৬৬	১৪৪৩
১৯৯৬/৯৭	৮৪২	৮১৯	১৬৬১	৭৩৬	৭৪৫	১৪৮১
১৯৯৭/৯৮	৫৮৫	১২০৬	১৭৯১	৫০৩	৭৪৮	১২৫১
১৯৯৮/৯৯	৮৬২	১৭৮৭	২৬৪৯	৬৬৯	৭৬৮	১৫৩৬

উৎসঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০* ঃ পৃঃ ১৭৩

বছরের শেষ পর্যায়ে ক্ষমতা গ্রহণ সত্ত্বেও ঐ বছর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ১৩৭০ মিলিয়ন ডলার থাকলেও অবমুক্তির পরিমান ছিল ১৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঐ বছর অনুদান হিসেবে ৪৮৫ মিলিয়ন ডলার অঙ্গীকার থাকলেও অবমুক্তির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন ৮৩১ মিলিয়ন ডলার, একই সঙ্গে ঋণ হিসেবে ৮৮৫ মিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি হলেও অবমুক্তি ছিল ৯০১ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯১/৯২ এবং ১৯৯৩/৯৪ সালে অঙ্গীকারের তুলনায় অবমুক্তি কম ছিল, কিন্তু ১৯৯৪/৯৫ এবং ১৯৯৫/৯৬ সালে অঙ্গীকারের চেয়ে অবমুক্তির পরিমাণ ছিল বেশী । কাজেই দেখা যাচ্ছে সার্বিকভাবে খালেদা জিয়া সরকারের ৫ বছরের মধ্যে ৩ বছরই প্রতিশ্রুতির তুলনায় অবমুক্তি বেশী ছিল এবং ২ বছর প্রতিশ্রুতির তুলনায় অবমুক্তি কম ছিল। এছাড়াও খালেদা জিয়ার সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের বছরও প্রতিশ্রুতি তুলনায় অবমুক্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশী ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকারের ৩ বছর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৯৬/৯৭, ১৯৯৭/৯৮ এবং ১৯৯৮/৯৯ সালে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির তুলনায় অবমুক্তি ব্যাপক পরিমানে কম। এর মধ্যে ১৯৯৮/৯৯ সালে যেখানে প্রতিশ্রুতি ছিল ২৬৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে অবমুক্তি হয়েছে ১৫৩৬ মিঃ মাঃ ডলার। আওয়ামী লীগ সরকারের তিন বছরের মধ্যে দেখা যায় যেখানে সর্বোচ্চ অবমুক্তি ছিল ১৫৩৬ মিঃ মাঃ ডলার সেখানে বিএনপি'র পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ অবমুক্তি ছিল ১৭৩৯ মিঃ মাঃ ডলার এবং সর্বনিম্ন ছিল ১৪৪৩ মিঃ মাঃ ডলার। কাজেই এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেশী মাত্রায় সচল ছিল।

টাকার বিনিময়ে যোগ্যতা ঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে মুদ্রা ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর্থিক খাতে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল টাকার বিনিময়ে যোগ্যতা। ১৯৯৩ সালে টাকাকে আন্তর্জাতিক অর্থ তারল্যের স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে টাকাকে বিনিময়যোগ্য করে তোলা হয়। যার ফলে টাকার অবস্থান আরও শক্তিশালী ও মজবুত হয়। মোহাম্মদ হাননান 'বাংলাদেশ ১৯৯৩' বইয়ে টাকাকে পূর্ণ বিনিময় যোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৩টি কারণ বর্ণনা করেন। কারণ গূলো হলোঃ[২৫]

ক) টাকার শক্তি বৃদ্ধি করে আস্থার সৃষ্টি করা যাতে করে বিনিয়োগকারীগণ, বিশেষত বৈদেশিক বিনিয়োগ কারীরা আকৃষ্ট হয়।

খ) আন্তর্জাতিক বানিজ্য সূবিধা বৃদ্ধি করা। আমদানিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে এসে রপ্তানির মাত্রা বৃদ্ধি করা,

এ লক্ষ্যে শুল্ক মুক্তি ও আমদানি নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নটি এসে পড়ে।

গ) সর্বশেষে টাকার শক্তি বৃদ্ধির ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাজার ও উদার অর্থনীতির সাথে আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থা তথা বাজারের সংযোগ সাধন।

সূতরাং দেখা যাচ্ছে টাকাকে বিনিময়যোগ্য করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত আরও মজবুত করা হলো।

টাকার বিনিময় হার (অবমূল্যায়ন)ঃ

রপ্তানী ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য সরকার মার্কিন ডলারের সাথে টাকার নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য একটি সরকারকে তার মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এই অবমূল্যায়ন খুব বেশী হলে অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতা গ্রহনের সময় ১ মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ৩৫.৬৮ টাকা (গড়) (সারণীঃ ৬.৬ দ্রষ্টব্য)। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছর শেষে এ বিনিময় হার ছিল ৪০.৮৪ টাকা। কাজেই এখানে দেখা যাচ্ছে বিএনপি সরকার তার ৫ বছরে ৫.১৬ টাকা টাকার অবমূল্যায়ন করেছে। সাপ্তাহিক রোববার ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং সংখ্যার উল্লেখ করেন, ১৯৯১- ১৯৯৬" কালীন বিএনপি সরকারের আমলে ২৩ দফায় ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে ৪.৬৯ টাকা। [২৬]

সারণী ঃ ৬.৬

বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার

বৎসর	টাকা-ডলার গড় বিনিময়	বৎসর	টাকা-ডলার গড় বিনিময়
১৯৭১/৭২	৭.৩০	১৯৮৬/৮৭	৩০.৬৩
১৯৭২/৭৩	৭.৮৭	১৯৮৭/৮৮	৩১.২৪
১৯৭৩/৭৪	৭.৯৬	১৯৮৮/৮৯	৩২.১৪
১৯৭৪/৭৫	৮.৮৭	১৯৮৯/৯০	৩২.৯২
১৯৭৫/৭৬	১৫.০৫	১৯৯০/৯১	৩৫.৬৮
১৯৭৬/৭৭	১৫.৪৩	১৯৯১/৯২	৩৮.১৫
১৯৭৭/৭৮	১৫.১২	১৯৯২/৯৩	৩৯.১৪
১৯৭৮/৭৯	১৫.২২	১৯৯৩/৯৪	৪০.০০
১৯৭৯/৮০	১৫.৪৯	১৯৯৪/৯৫	৪০.২০
১৯৮০/৮১	১৬.২৬	১৯৯৫/৯৬	৪০.৮৪
১৯৮১/৮২	২০.০৭	১৯৯৬/৯৭	৪২.৭০
১৯৮২/৮৩	২৩.৮০	১৯৯৭/৯৮	৪৫.৪৬
১৯৮৩/৮৪	২৪.৯৪	১৯৯৮/৯৯	৪৮.০৬
১৯৮৪/৮৫	২৫.৯৬	১৯৯৯/২০০০(জুলাই-জানুয়ারী)	৪৯.৮৫
১৯৮৫/৮৬	২৯.৮৯	আগষ্ট/২০০০	৫৪.১৫

উৎসঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০* পৃঃ ১৬৯

৪.৬৯ টাকা[২৬] বিএনপি সরকারের আমলে টাকার এই অবমূল্যায়ন পূর্ববর্তী বছরগুলির সাথে সামঞ্জস্য করে করা হয়েছিল উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় ১৯৮৬/৮৭ থেকে ১৯৯০/৯১ এই পাঁচ বছরে টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল ৫.০৫ টাকা। অর্থাৎ যা কিনা বিএনপি সরকারের সময়ের অবমূল্যায়নের সমান। কিন্তু বর্তমান সরকার ১৯৯৫/৯৬ সালের ৪০.৮৪ টাকা থেকে ২০০০ সালে ৫৪.১৫ টাকায় বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করেছে। বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় ধরণের অবমূল্যায়ন ঘটে গত ১০ আগষ্ট ২০০০ইং। ১৩ আগষ্ট ২০০০ইং থেকে কার্যকর এ বিনিময় মূল্য একবারে ৬ শতাংশেরও বেশী অবমূল্যায়ন করা হয়। এর পূর্বে গত ৩০ নভেম্বর (১৯৯৯) ৩%

Dhaka University Institutional Repository

অবমূল্যায়ন করে ছিল। এই নিয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ গত চার বছরে ১৭ দফায় প্রায় ১৪ টাকা অবমূল্যায়ন করে। যা খালেদা জিয়ার শাসনামল থেকে প্রায় ৩ গুন বেশী । অথচ খালেদা জিয়ার শাসনামলে ২৩ দফায় মাত্র ৫ টাকা অবমূল্যায়ন করেছিল। কাজেই এক্ষেত্রেও দেখা যাচেছ খালেদা জিয়ার শাসনামলে টাকার অবস্থান বেশ শক্তিশালী ছিল।

চ) বাণিজ্য বাধা সমুহ দূর করার পদক্ষেপঃ

কর ব্যবস্থার সংস্কার এবং টাকাকে বিনিময়যোগ্য করে তোলার পাশাপাশি বাণিজ্য বাধা সমূহ দুর করার জন্য খালেদা জিয়ার সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে দেখা যায় আমদানী নিষিদ্ধ আদেশে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা থেকে অনেক পণ্য বাদ দেয়া হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬ এ দেখান হয় যে, "চার অংকের (four degit) আমদানী পণ্যের তালিকায় ১৯৯০/৯১ অর্থ বছরে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রিত পণ্যের সংখ্যা ছিল ২৩৯, যা ১৯৯৩/৯৪ অর্থ বছরে কমিয়ে ১০৯ টিতে হ্রাস করা হয়েছিল, যেখানে অ-বাণিজ্য সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রিত পণ্যের (যেমন নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও ধর্ম বিষয়ক) সংখ্যা ৬৯ এবং বাণিজ্য বা প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত পণ্য ছিল ৪০ টি।" উক্ত সমীক্ষায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, "১৯৯৫-৯৭ সালের দু'বছর মেয়াদী নতুন আমদানী নীতি আদেশে নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত পণ্যের জন্য দু'টি ভিন্ন তালিকা প্রণয়ণের মাধ্যমে আমদানী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরো অধিক স্বচ্ছতা এসেছে।"[২৭] অতএব দেখা যাচ্ছে আমদানী বাণিজ্য অবাধ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমদানীকৃত পণ্যের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়া হয়েছে। ফলে টাকাকে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করে তোলার জন্য আমদানি নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নটির দুর হয়।

ছ) পুঁজি বাজারের উন্নয়নঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্যও ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। '১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৯০ দশকে প্রথমার্ধের পূর্বে নানাবিধ কারণে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ, অনমনীয়তা, উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (DFIS) গুলো হতে স্বল্প সুদে সহজেই পুঁজি প্রাপ্তি এবং সম্ভবত বৃহৎ পাবলিক লিঃ কোম্পানী গুলোর জনগণের নিকট জবাবদিহিতার অনিচ্ছা কোম্পানী সমূহকে পুঁজি বাজার হতে দূরে রাখে। একইভাবে ব্যাংক ব্যবস্থার আওতায় এবং সরকারী সঞ্চয় মাধ্যম সমূহ হতে নিশ্চিত আয় এবং পুঁজি বাজারের ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতার কারণে সঞ্চয়কারীগণ স্টক মার্কেটে বিনিয়োগে আগ্রহী হননি।[২৮] কিন্তু বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যা স্টক মার্কেটের কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত সংস্কার মূলক পদক্ষেপ এবং অন্যান্য কার্যক্রম স্টক মার্কেটের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে তা নিম্নরূপ বর্ণনা করা হলঃ [২৯]

* বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য প্রায় সব খাতকেই উন্মুক্তকরণ ;
* বিপুল সংখ্যক সরকারী মালিকানাধীন সংস্থা হতে পুঁজি প্রত্যহার পূর্বক ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া এবং সরকারের শেয়ারের পরিমান কমিয়ে আনা;
* সুদের হার উন্মুক্তকরণ;
* সরকারী সঞ্চয় মাধ্যম ও ব্যাংক আমনতের সুদের হার হ্রাসকরণ;
* নমনীয় বিনিময় হারের প্রবর্তন, চলতি লেনদেন হিসেবে টাকাকে বিনিময়যোগ্য হিসেবে ঘোষণা করণ, বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ মুক্তকরণ, বিশেষ করে, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী মার্কেটিং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মূলধন এবং লাভ-ক্ষতি প্রত্যাবাসন আইন শিথিলকরণ;
* রাজস্ব উৎসাহ যেমন কর্পোরেট ট্যাক্সহ্রাস, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্জিত মূলধনী লাভের উপর কর অব্যাহতি এবং ১০,০০০ টাকার বেশী লভ্যাংশ আয় এর

Dhaka University Institutional Repository

উপর থেকে কর বিলোপ, এবং

* বর্তমানে বিলুপ্ত কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যু এর কার্যাবলী ন্যাস্ত করে ১৯৯৩ সালের গঠিত সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠনের মাধ্যমে সিকিউরিটি ইস্যু, মূলধন বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় নিশ্চিত করণ।

উল্লেখিত পদক্ষেপ সমূহ ছাড়াও স্বল্প মূল্যস্ফীতির হার, বাজেটে মিতব্যায়িতা এবং সুবিধাজনক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শেয়ার বাজারকে চাংগা করেছে। পুঁজি বাজারের উন্নয়ন কল্পে উল্লেখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করার ফলে (১৯৯১-৯৫) সময়ে পুঁজি বাজারের উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং উক্ত সময়ে শেয়ারের লেনদেন ও বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।

সারণী ঃ ৬.৭

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

পঞ্জিকা বছর/মাস শেষে	তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ)	ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন (কোটি টাকায়)	টার্ণ ওভার (কোটি টাকায়) (বছর/মাস ব্যাপী)	সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৮৬	৮২	২৬৫.৩১	৫৭৩.০৬	৫.০০	২৪৪
১৯৮৭	৯২	৩১৪.৯৭	১২৬৯.১৫	১৭.০০	৫১২
১৯৮৮	১১১	৩৬৬.৩৭	১৩৫৫.৬৯	১৩.০০	৫৩৪
১৯৮৯	১১৬	৪৫৩.৯২	১৫৩৫.০৫	১৭.০০	৪৯৮
১৯৯০	১৩৪	৫৩৬.১১	১১৪৮.৫৯	১৯.০০	৩৪৯
১৯৯১	১৩৮	৫৫৮.৬৬	১০৩৯.৭৩	১২.০০	২৯৬
১৯৯২	১৪৭	৬০২.০৩	১২২৯.১১	৪৪.০০	৩৭০
১৯৯৩	১৫৩	৮২০.১৭	১৮০৯.৮৭	৫৮.০০	৩৯২
১৯৯৪	১৭০	১১৬৭.৩৮	৪১৭৭.০৭	৪২৯.০০	৮৪৬
১৯৯৫	২০১	১৯৮৩.৯৮	৫৬৫১.৮১	৬৩৮.০০	৮৩৫
১৯৯৬	২০৫	২৩০৫.২৪	১৬৮১০.৬২	৩০১৩.৭০	২৩০০.১৫
১৯৯৭	২২২	২৮২০.৭৮	৭১৩০.১৬	১৭৪০.৩৪	৭৫৬.৭৮
১৯৯৮	২২৮	২৮৬২.৫৭	৫০২৫.৪০	৩৪৩৬.৮৪	৫৪০.২২
১৯৯৯	২৩২	২৮৭৭.৪৬	৪৪৭৮.১২	৩৮৯৬.৪৪	৪৮৭.৭৭
২০০০					
জানুয়ারী	২৩৩	২৮৯৫.২২	৪৪৯৭.৮৪	১৪৮.৬০	৪৮৪.৪৪
ফেব্রুয়ারী	২৩৩	১৮৯৮.৯৫	৪৬৪৬.৮২	৯৪.৯৭	৪৯৩.৫৫
মার্চ	২৩৪	২৯৩৮.৩০	৪৮৪৮.৬০	১৬৫.৪০	৫১৭.৮৩

সূত্র ঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০*, পৃঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৬.৭ঃ এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৮৬ সালে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা যেখানে ৮২ ছিল ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে সেই সংখ্যা ২০১ এ পৌঁছায়। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময়ও ঐ সংখ্যা ছিল ১৩৮, পাঁচ বছরে সিকিউরিটিজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৬৩টি। ১৯৯৯ সালে ঐ সংখ্যা পৌছায় ২৩২ এ। অর্থাৎ পরবর্তী চার বছরে বৃদ্ধি পায় ৩১টি। ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৮৬ সালে যেখানে ছিল ২৬৫.৩১ কোটি টাকা ১৯৯১ সালে তা ৫৫৮.৬৬ কোটি টাকায় পৌছাঁয় এবং ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬২ কোটি টাকায় পৌছায় অর্থাৎ পাঁচ বছরে প্রায় ৪ গুন বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালে দাড়ায় ২৮৭৭.৪৬ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের আমলে ৪ বছরে বৃদ্ধি পায় মাত্র ৭০০ কোটি টাকা। বাজার মূলধনীর ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৮৬ সালে ছিল ৫৭৩.০৬ কোটি টাকা এবং ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এক/দেড় হাজার কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯১ সালে যেখানে ১১৪৮.৫৯ কোটি টাকা ছিল ১৯৯৬ সালে এপ্রিলে তা পৌছায় ৫৯০৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে প্রায় ৬ গুন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তা হ্রাস পেয়ে ৪৪৭৮.১২ কোটি টাকায় নেমে আসে। সার্বিক শেয়ারের মূল্য সূচকের দর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা না দিলেও বিএনপি সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে শেয়ার বাজারে অস্বাভাবিকতা বিরাজ করে। সারণীতে দেখা যায় ১৯৮৬ যেখানে ২৪৪ টাকা সার্বিক মূল্য সূচক ছিল ১৯৯১ সালে তা ২৯৬ টাকায় বৃদ্ধি পায়। এর পর বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শেয়ার বাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে ধীরে ধীরে শেয়ার বাজারে যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তার ফলে ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে শেয়ারের সার্বিক মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৫ টাকায় পৌছায়। এই সময়ে শেয়ারের ক্ষেত্রে দর বৃদ্ধির পর কখনও পতন লক্ষ্য করা যায় নাই। কিন্তু ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে পুঁজিবাজারে যে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তার ফলে হঠাৎ করে মাত্র ৭ মাসের মধ্যে ১৯৯৬ সালের এপ্রিলের মূল্য সূচক ৮৩৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে একই বছরের নভেম্বর মাসে ম্যানিপুলেশনের ফলে সর্বোচ্চ মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬২৭.০২ টাকায়[৩০] পৌছায়। এর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এপ্রিল ১৯৯৭ সালে মূল্য সূচক ১০৯০.৩৭ টাকায়[৩১] নেমে আসে। পরবর্তীতে ঐ মূল্য সূচক ১৯৯৯ সালে ৪৮৭.৭৭ টাকায় হ্রাস পায়। যা কিনা ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে খালেদা জিয়ার সরকারের বিদায়ের সময়ের মূল্য সূচক থেকে অর্ধেক মাত্র। ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ শাসনামলে শেয়ারের ঐ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে শেয়ার বাজারে যে ধস নামে তা "শেয়ার কেলেঙ্কারী" হিসেবে পরিচিত। এর ফলে কোটি কোটি টাকার মূলধন বাজার থেকে পাচার হয়ে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে খালেদা জিয়ার শাসনামলে পুঁজি বাজারে কোন অস্বাভাবিকতা বা অনিয়ম লক্ষ্য করা যায় নাই। উপরন্তু ঢাকা শেয়ার মার্কেটের উন্নয়ন সাধন সহ চট্টগ্রামে আর একটি নতুন স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করে পুঁজি বাজারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করেছে।

জ) মূল্য স্ফীতিঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে মূল্য স্ফীতি অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৯.৩%। ১৯৮৪-৮৫ হতে ১৯৮৮-৮৯ সময়কালে মুদ্রাস্ফীতির গড় হার ছিল ১০.১% এর পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৯০/৯১ হতে ১৯৯৩/৯৪ সাল পর্যন্ত মূল্য স্ফীতি হার ক্রমাগত হ্রাস পায়। ১৯৯০/৯১ সালে ছিল ৮.৯, ১৯৯১/৯২ সালে ৫.১%, ১৯৯২/৯৩ সালে ১.৩%, এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে ১.৮% ১৯৯৪/৯৫ সালে ছিল ৫.২% এবং ১৯৯৫/৯৬ সালে মূল্য স্ফীতির হার ছিল ৬.৬%।[৩২] অর্থাৎ ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালে এই পাঁচ বছরে গড় মূল্য স্ফীতি ছিল ৪%। বাংলাদেশের এ মূল্যস্ফীতির হার অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মূল্যস্ফীতির থেকেও অনেক কম। ১৯৯৩ সালের বিশ্বের কয়েকটি দেশের মূল্য স্ফীতির হার নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.৮

৭টি শিল্পোন্নত দেশ ও ৭টি উন্নয়নশীল দেশের (সার্কভুক্ত) মূল্য স্ফীতির হার।

যুক্তরাষ্ট্র	২.৮%	ভারত	৫.৯%
জার্মানী	৪.৩%	পাকিস্তান	৭.৫%
জাপান	১.৭%	শ্রীলঙ্কা	৯.৯%
কানাডা	১.৯%	ভূটান	১৩.০%
ফ্রান্স	২.৩%	নেপাল	৫.৮%
ইতালি	৪.২%	মালদ্বীপ	১৭.২%
যুক্তরাজ্য	২.৮%	বাংলাদেশ	-২.৪%

সূত্রঃ মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশ*- ১৯৯৩, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃঃ ১৮৯ (মূল সূত্র এশিয়া উইক, ১৫.১২, ১৯৯৩ইং)

উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় উন্নত দেশ সমূহের মূল্যস্ফীতি হার সবচেয়ে কম জাপানে ১.৭%। উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মধ্যে বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে কম। উল্লেখিত সারণীতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি দেখান হয়েছে- ২.৪%, কিন্তু অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬ এ ১৯৯৩/৯৪ সালে বাংলাদেশের মূল্য স্ফীতি দেখান হয়েছে ১.৮%। সার্ক ভূক্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুদ্রাস্ফীতি মালদ্বীপ ১৭.২%। অতএব এ কথা বলা যায় মুদ্রাস্ফীতির দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক সুবিধাজন স্থানে অবস্থান করছে।

ঝ) শিল্পোন্নয়নঃ

একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজন। খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি এবং বেসরকারী খাতে অধিক হারে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খালেদা জিয়ার সরকারও সরকারী মালিকানাধীন শিল্প কারখানা বেসরকারীকরণ নীতি অব্যাহত রাখে। বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রেও বেসরকারী বিনয়োগের সুযোগ দেয়া হয়। বেসরকারীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৯৩ সালে বেসরকারীকরণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সংশোধিত শিল্প নীতিতে যে সব উল্লেখযোগ্য বিধান রাখা হয়েছে সেগুলো হলঃ [৩৩]

ক) বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্বলিত প্রকল্পে সম-মুলধনের অংশীদারিত্বের (Equity Participation) বেলায় কোনরূপ সীমাবদ্ধতা থাকিবে না, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত মালিকানাধীনে বৈদেশিক বিনিয়োগ করা যাইবে;

খ) যৌথ উদ্যোগ বা বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করার বাধ্যবাধকতা থাকবেনা;

গ) বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ তাহাদের প্রত্যাবাসনযোগ্য (repatriable) ডিভিডেন্ট শিল্পে বিনিয়োগ করিলে তাহা নতুন বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;

ঘ) বিদেশী বিনিয়োগকারী কিংবা বিদেশী বিনিয়োগ সম্বলিত কোম্পানী তাহাদের সমমূলধনের (ইকুইটির) পরিমাণ নির্বিশেষে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন ঋণ হিসাবে পাইতে পারেন । এই ক্ষেত্রে ব্যাংক- গ্রাহক সম্পর্ক এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ ও শর্তাদি নির্ধারিত হইবে, এবং

ঙ) বিদেশী বিনিয়োগকারী অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগকারী কোম্পানীকে এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ে অনুমতি প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করার কাজ অব্যাহত রহিয়াছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রতিযোগীতামূলক বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৯২ সালে শিল্পনীতি

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধিত করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত কতিপয় শিল্পখাতে সার্বিকভাবে জিডিপি'র শতকরা ১১ ভাগ অবদান রাখছে। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ১২ ভাগ এই খাতে নিয়োজিত। বিগত কয়েকবছর যাবৎ জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন- ১৯৮৪/৮৫ সালের ৯.৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এটা ১৯৯৫/৯৬ সালে ১১.৫% এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৪/৯৫ সালের মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের প্রায় তিন চতুর্থাংশ ছিল শিল্প খাতের অন্তর্ভূক্ত।"[৩৪]

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প সমূহের সংস্কার ঃ

রসায়ন শিল্প কর্পোরেশনের অধীনস্থ সারকারখানা ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের অধীনস্থ পাটকল সমূহে মূলধন পুর্নগঠন করা হয়েছে। রুগ্ন পাটজাত শিল্পজাত শিল্প পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় পাট খাত সমন্বয়, ঋণ কর্মসূচি (JSAC) গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতের পাট কলের বিপরীতে খেলাপী ঋণের এক তৃতীয়াংশ মূলধন পুনর্গঠনের মাধ্যমে অবলোপন (Write off) করা হয়েছে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ ঋণ পুনঃ তফশিলীকরণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যাংক সহমূহকে ৫৭৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এ ছাড়াও সরকার ১৯৯১/৯২ সাল থেকে ১৯৯৪/৯৫ সালের মধ্যে মিল সমূহের লোকসানের অংশ বিশেষ। (Loss Refinancing) পরিশোধের লক্ষ্যে ৪৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। খালেদা জিয়ার সরকার রাষ্ট্রয়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান সমুহ বেসরকারী করণের লক্ষ্যে প্রাইভেটাইজেন বোর্ডের মাধ্যমে ১৮টি (বিসিআইসি'র ৬টি, বিটিএমসি'র ৭টি, বিএসইসি'র ৩টি ও বিএসএফ আইসি'র ২টি) প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কার্যক্রম চুড়ান্ত করেছে। এর মধ্যে ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান (বিসিআইসি'র ৪টি, বিটিএসসি'র ৫টি, বিএইসি'র ১টি, বিএসএফআইসি'র ১টি) ইতি মধ্যে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।[৩৫]

শিল্প বিনিয়োগঃ ১৯৯৩ সালের আজকের কলেজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের বার্ষিক পরিমাণ ১০ লাখ ডলার মাত্র। অথচ ভারতে ২০ কোটি ডলার, শ্রীলঙ্কার ৯ কোটি ৮ লাখ ডলার, থাইল্যান্ডে ২শ ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার, কোরিয়ায় ১শ ১১কোটি ৬০ লাখ ডলার সিঙ্গাপুর ৩শ ৪৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার।"[৩৬] কাজেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প নীতিতে যে সংশোধন আনা হয়েছে তাতে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে।

সারণী ঃ ৬.৯

১৯৯১/৯২-১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমান

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	দেশী	বিদেশী	মোট
১৯৯১/৯২	৯১	২৫	১১৬
১৯৯২/৯৩	৯০	৬৩	১৪৩
১৯৯৩/৯৪	৪৫৭	৮০৪	১২৬১
১৯৯৪/৯৫	৮৪৫	৭২৯	১৫৭৪
১৯৯৫/৯৬ (ডিসেম্বর ৯৫ পর্যন্ত)	৭৭৫	৯১৬	১৬৯১
মোট	২,২৫৮	২,৫২৭	৪,৭৮৫

উৎসঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬,* পৃঃ ৫৯

উল্লেখিত সারণীঃ ৬.৯ এ ১৯৯১/৯২ সাল থেকে ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ডের অধীনে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপরীতে মোট বিনিয়োগ দেখান হয়েছে। উক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে দেশে নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯১/৯২ সালের ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫/৯৬ (ডিসেম্বর ৯৫ পর্যন্ত) ১৬৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ সময় বিদেশী বিনিয়োগ ও ১৯৯১/৯২ সালের ২৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছায়। একই সময় দেশী বিনিয়োগের

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণ ও ৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উক্ত সময়ে আনুপাত হারে বিদেশী বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতএব উল্লেখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, খালেদা জিয়ার শাসনামলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রেখেছে।

ঞ) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি মানব সম্পদ উন্নয়ন। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে যে বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বা যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটান যায়, সেগুলো হলো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও দক্ষ মানব গোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে খালেদা জিয়ার শাসনামলে এ সব খাত সমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উল্লেখিত খাত সমূহে খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালে পূর্ববর্তী বছরের তূলনায় এবং উল্লেখিত সময়ে সরকার রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে।

সারণী - ৬-১০

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সামাজিক খাতে বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

খাত	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬ সংশোধিত
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক	৩২০	৫৩৫	৬৫১	৯৮৫	১৫৫৩	১৩৮৯
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৭	২০	৩৭	৫৫	৭০	৩১
স্বাস্থ্য	১৭৯	২১৬	২৭৯	৩১২	৪১০	৩১৫
পরিবার কল্যান	২৭৯	৩৪২	৩৫১	৪৬০	৫৩৬	৪৫০
শ্রম ও জনশক্তি	৯	১১	৯	১৪	১৫	৭
সমাজ কল্যান মহিলা বিষয় এবংযুব উন্নয়ন	৪১	৩৯	৫৫	৭৫	১৩৪	১০৯
উপ মোট	৮৪৫	১১৬৩	১৩৮২	১৯০১	২৭১৮	২৩১০

সামাজিক খাতে রাজস্ব বরাদ্ধ

(কোটি টাকা)

খাত	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬ সংশোধিত
শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক	১১৯৭	১৩৯৩	১৬৮৮	১৭৭০	২০২৩	২১৬৯
স্বাস্থ্যও পরিবার কল্যান	৩৮৭	৪৩১	৫১৬	৬০৭	৬৮৫	৭৩০
যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক	১৮	২৩	৩৮	৪৩	৩৮	৪২
শ্রম ও জনশক্তি	১৪	১৫	১৯	১৯	২১	২২
সমাজ কল্যানও মহিলা বিষয়ক	৪৭	৫১	৫৪	৬১	৭৩	৭৯
উপ মোট	১৬৬৩	১৯১৩	২৩১৫	২৫০০	২৮৪০	৩০৪২
মোট (উন্নয়ন+রাজস্ব)	২৫০৮	৩০৭৬	৩৬৯৭	৪৪০১	৫৫৫৮	৫৩৪৩

উৎসঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, পৃঃ ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১০ থেকে দেখা যাচ্ছে উল্লেখিত খাত সমূহের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্ম সূচিতে ১৯৯০/৯১ সালে যেখানে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৪৫ কোটি টাকা, ১৯৯১/৯২ সালে খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার সেখানে বরাদ্দ দিয়েছে ১১৬৩কোটি টাকা এবং ১৯৯৫/৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩০১ কোটি টাকায় পৌছায়। একই সময়ে সামাজিক খাতে রাজস্ব বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৬৬৩ কোটি টাকা, ১৯৯১/৯২ সালে সেখানে বরাদ্দ রেখেছিল ১৯১৩ কোটি টাকা। এবং ১৯৯৫/৯৬ সালে ঐ বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুনে পৌছায় ৩০৪২ কোটি টাকায় । রাজস্ব এবং উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখিত বিষয়ে ১৯৯০/৯১ সালের বরাদ্দ ২৫০৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুনেরও বেশী ৫৩৪৩ কোটি টাকায় পৌছায়।

শিক্ষা উন্নয়নঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বাহন বা মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষা একটি জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা উন্নয়ন ব্যতীত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক কোন ক্ষেত্রেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। খালেদা জিয়া সরকার গঠনের পর শিক্ষা উন্নয়নে প্রধান এবং অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বেছে নেয়। তাই ১৯৯১/৯২ সাল থেকে ১৯৯৫/৯৬ সাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাজেটে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ সহ শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সব কর্মসূচির মধ্যে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা নামে নতুন একটি বিভাগ চালু করা হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষা অবৈতনিক সহ উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রশস্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যলয় সহ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, করেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দুরীকরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে খালেদা জিয়া সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ আলোচনা করা হলঃ

বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ অব্যাহত থাকে। পরিশিষ্ট্য ৪ থেকে দেখা যায় ১৯৮৮/৮৯ সালে যেখানে শিক্ষায় রাজস্ব বাজেটে বরাদ্ধ ছিল ৯৪৮ কোটি টাকা সেখানে প্রতিরক্ষায় বরাদ্দ ছিল ১০১৫ কোটি টাকা। ১৯৮৯/৯০ সালেও প্রতিরক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল। ১৯৯০/৯১ সালের এরশাদের শেষ বাজেটে শিক্ষায় নামে মাত্র সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়। তাও মাত্র ২ কোটি টাকা বেশী অর্থাৎ প্রতিরক্ষায় ১১৮০ কোটি টাকা এবং শিক্ষা ১১৮২ কোটি টাকা। খালেদা জিয়ার সরকারের প্রথম বাজেটেই এই পার্থক্য বৃদ্ধি করে শিক্ষায় বরাদ্ধ দেয়া হয় ১৩৮২ কোটি টাকা এবং প্রতিরক্ষায় ১৩০১ কোটি টাকা। এর পর থেকে খালেদা জিয়ার সরকারের প্রতিটি বাজেটে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ব্যাপকভাবে। ১৯৯২/৯৩ সালের রাজস্ব বাজেটে শিক্ষায় সর্বোচ্চ ১৬৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়, এরপর প্রতিরক্ষায় রাখা হয় ১৪৯৪ কোটি টাকা। ঐ বৎসর প্রায় ২০০ কোটি টাকার পার্থক্য করা হয়। এই ভাবে প্রতিটি রাজস্ব বাজেটে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ অব্যাহত রেখে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাঃ

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশ করা হলেও তৎকালীন সরকার এই আইন বাস্তবায়ন করে নাই। বিএনপি সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। এই লক্ষে ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী দেশের ৬৪টি জেলার ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারী থেকে দেশ ব্যাপী তা সম্প্রসারণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি সরকার ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ নামে মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা সম্পন্ন একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিভাগ প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রেখে একজন প্রতিমন্ত্রীকে উক্ত বিভাগের দায়িত্বভার অর্পন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার ৯৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।

সারণী ঃ ৬.১১

সাল	সরকারী	বেসরকারী		মোট
		রেজিষ্টার্ড	নন রেজিষ্টার্ড	
১৯৯০	৩৭৬৫৫	৬২৬৬	৩৩২০	৪৭২৪১
১৯৯৫	৩৭৭১০	১৭১৫১	৫০৩৩	৫৯৮৯৪

সূত্রঃ *বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা*, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৩।

উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯০-৯৫ সময়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব বেশী বৃদ্ধি না পেলেও উক্ত সময় রেজিষ্টার্ড বেসরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯০ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭৬৫৫ টি ১৯৯৫ সালে ঐ সংখ্যা দাড়ায় ৩৭৭১০টি অর্থাৎ ৫৫টি সরকারী বিদ্যালয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একই সময়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৯০ সালে যেখানে ৯৫৮৬ টি (রেজিষ্টার্ড ৬২৬৬টি ও বেসরকারী ৩৩২০টি) ১৯৯৫ সালে তা বৃদ্ধি করে দুই গুনেরও বেশী ২২১৮৪টিতে (রেজিষ্টার্ড ১৭১৫১ টি ও বেসরকারী ৫০৩৩টি) উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ ৫ বছরে ১২৫৯৮টি রেজিষ্টার্ড ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীঃ

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নানাবিধ সমস্যার কারণে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করেই শিশুরা বিদ্যালয় ত্যাগ করত। তাই প্রাথমিক স্তর পরিপূর্ণ না করে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধ কল্পে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্প চালু করা হয়।[৩৭] এই কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচিত ইউনিয়নের সকল সরকারী ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয় স্বল্প ব্যায়ী ও স্যাটেলাইট স্কুল এবং একটি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক সুবিধাভোগী পরিবার একটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠালে মাসে ১৫ কেজি গম বা ১২ কেজি চাউল এবং দুই বা ততোধিক শিশু পাঠালে ২০ কেজি গম বা সমমূল্যের পরিমাণ চাউল পায়। তবে ৮৫% দিবস ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার শর্তে।[৩৮]

এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায় ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ৭১৯৭.০০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। এ পর্যায়ে ৪৬০ টি ইউনিয়নকে কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। ঐ সময়কালে ৪৯১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭,০৬,৫১৯ জন দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীর ৫,৪৯,৮৮১টি পরিবারকে ৭৯৬৬১ মেট্রিক টন গম প্রদান করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ৫৪০ টি ইউনিয়নে কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে ১০০০ ইউনিয়নে কর্মসূচি চালু করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ২৪৬৫৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ১২১৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৬,২৮,৬৫৯ জন ছাত্রছাত্রীর ১৪,১৬,৯৩২ টি পরিবারকে ১,৭৭,৪৯৮ মেট্রিকটন গম বিতরন করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে এই কর্মসূচি আরও অধিক পরিমানে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে যেখানে ৫৪০ টি ইউনিয়ন এই কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সেখানে ১২৫০টি ইউনিয়নের ১৫১৮২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯,৮৮,৬৫৯ জন ছাত্র/ছাত্রী এবং ১৭,২৯,৫৫৬ টি পরিবারকে ৩,৪৫,৫৬৪ মেঃ টন গম বিতরণ করা হয় এবং ব্যয় করা হয় ৩৬০০০ লক্ষ টাকা।[৩৯]

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নের সারণীতে ১৯৯০-৯৯ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা দেখান হল।

সারণী ঃ ৬.১২

প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (১৯৯০-৯৯)

বছর	মোট	ছাত্র	ছাত্রের শতকরা হার	ছাত্রী	ছাত্রীর শতকরা হার
১৯৯০	১২০.৫	৬৬.৬	৫৫.৩%	৫৩.৯	৪৪.৭%
১৯৯১	১২৬.৪	৬৯.১	৫৪.৭%	৫৭.৩	৪৫.৩%
১৯৯২	১৩০.২	৭০.৫	৫৪.১%	৫৯.৭	৪৫.৯%
১৯৯৩	১৪০.৭	৭৫.৩	৫৩.৫%	৬৫.৪	৪৬.৫%
১৯৯৪	১৫১.৮	৮০.৫	৫৩.০%	৭১.৩	৪৭.০%
১৯৯৫	১৭২.৮	৯০.৯	৫২.৬%	৮১.৯	৪৭.৪%
১৯৯৬	১৭৫.৮	৯২.২	৫২.৪%	৮৩.৬	৪৭.৬%
১৯৯৭	১৮০.৩	৯৩.৬	৫১.৯%	৮৬.৭	৪৮.১%
১৯৯৮	১৮৬.৬	৯৫.৭	৫২.১%	৮৭.৮	৪৭.৮%
১৯৯৯*	১৭৭.১	৯১.০	৫২.৪%	৮৬.১	৪৮.৬%

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০ পৃঃ ৯৬,

* ১৯৯৯ সালের ভর্তি সংখ্যামান সাময়িক বলে বিবেচিত হবে।

উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে যেখানে মোট ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সংখ্যা ছিল ১২০.৫ লক্ষ এবং ১৯৯১ ছিল ১২৬.৪ লক্ষ ১৯৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২.৮ লক্ষ্যে পৌছায়। ১৯৯৯ সালের সাময়িক হিসেবে ঐ সংখ্যা ১৭৭.১ লক্ষ। আনুপাতিক হারে ৫ বছরে (১৯৯১-৯৫) ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার খুবই সন্তোষজনক। উক্ত পাঁচ বছরে ৪৬.১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচী একটি সফল প্রকল্প ছিল বলে বর্তমান সরকারও এ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি ছাড়াও বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। এ লক্ষে "১৯৯১ সালে বাংলাদেশে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার প্রকল্প (ইনকেপ) গ্রহণ করা হয়। (১৯৯১-১৯৯৭) সময়ে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের আওতায় ২৪.৭ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়"।[৪০] উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাফল্য এবং এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্য ১৯৯৫ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে নতুন একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ বছরও তদুর্ধ বয়সী শিক্ষার হার ১৯৯১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

৩২.৩২% থেকে ১৯৯৫ সালে ৪৭.৩% এ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯৯ সালে ৫৮% এ উন্নীত হয়।"[৪১]

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ উপবৃত্তি প্রকল্পঃ

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী হতে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের নিজস্ব অর্থে এবং বিশ্বব্যাংক, এ,ডি,বি ও নোরাড এর সাহায্যে পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় পর্যায় ক্রমে সকল ছাত্রীদের এ সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে এর জন্য প্রতি ছাত্রীকে নিয়মিত উপস্থিতি, পরীক্ষা ভাল ফলাফল সহ এস,এস,সি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা বাল্য বিবাহ বা শিক্ষাপূর্ব বিবাহ নিরুৎসাহিত করবে। ১৯৯৪ শিক্ষা বর্ষে প্রায় ৭ লক্ষ ছাত্রীকে এ আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে। ১৯৯৫ শিক্ষা বর্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ ছাত্রী এ আর্থিক সুবিধা ভোগ করছে।[৪২] এ কর্মসূচি মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝড়ে পড়া রোধ কল্পে এক যুগান্তরকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নঃ

মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৩৮০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং ২০০টি মাদ্রাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে ১৯৯২/৯৩ সালে গৃহীত দু'টি বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮৪০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও মাদ্রাসা) এবং ১৩১টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা হয়।"[৪৩]

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে দেশে ৫টি হায়ার সেকেন্ডারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (এইচ,এস,টি,টি,আই) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এই সকল ইন্সটিটিউট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৯৮ পর্যন্ত ১৯৭৮ জন [৪৪] শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিতঃ

খালেদা জিয়ার সরকার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সেশন জট, রাজনীতি ও সন্ত্রাসের কারণে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে অধ্যয়ন করতে যেত। তাই সরকার বিদেশগামী ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে পড়াশনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৯২ সালের জাতীয় সংসদের ৩৪ নং আইনের মাধ্যমে "বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২" ৫ আগষ্ট (১৯৯২) জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় এবং ৯ আগষ্ট রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এর ফলে দেশে ১৯৯২/৯৩ সাল থেকে ১৯৯৭/৯৮ সাল পর্যন্ত ১৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেশন জট ও রাজনীতিমুক্ত এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করে বহু সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজ সমূহকে একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা এবং দেশ ব্যাপী কলেজ সমূহে অভিন্ন শিক্ষা ক্রমের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সাধারণ ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জাতীয় সংসদের ৩৭ নং আইনের মাধ্যমে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২' ১৩ অক্টোবর (১৯৯২) জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ২০ অক্টোবর (১৯৯২) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী স্নাতক, স্নাতক (সম্মান)ও স্নাতকোত্তর পর্যায় শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। এ ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বও পালন করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সরকার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কর্মজীবী, বয়স্ক ও সর্ব স্তরের জনগণের মধ্যে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের জাতীয় সংসদের ৩৮ নং আইনের "বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২" এর মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার সহ পেশাজীবি শ্রেণীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক কর্মসূচি পালন করছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং স্বাক্ষরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিকদের মতে শিক্ষা রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি মানদন্ড। কাজেই উল্লেখিত শাসনামলে শিক্ষার অগ্রগতি রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে একথা বলা যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের আর একটি বাহন হল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানের উন্নয়ন। স্বাস্থ্য জনগনের একটি মৌলিক অধিকার। ১৯৮৫/৮৬ সাল থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় (পরিশিষ্ট - ৪) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ১৯৮৫/৮৬ সালে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছিল ১১৩ কোটি টাকা; ১৯৯০/৯১ সালে ৩৮৭ কোটি টাকা; ১৯৯১/৯২ সালে ৪৩১ কোটি টাকা এবং ১৯৯৫/৯৬ সালে এই খাতে ৭৩০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। এর ফলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃ শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং সংক্রামক ব্যাধি সমূহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে জন সংখ্যার হার, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার যেমন এক দিকে হ্রাস পেয়েছে তেমনি মানুষের গড় আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নের সারণীতে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত সময়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অগ্রগতি দেখান হল যার মাধ্যমে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী ঃ ৬.১৩

জন্মমৃত্যু হার ও স্বাস্থ্য সেবা ১৯৯০ ও ১৯৯৫

	১৯৯০	১৯৯৫
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	৩২.৮	২৬.৯
স্থূল মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	১১.৩	৮.৫
জনসংখ্যা বৃদ্ধি (প্রতি হাজারে)	২১.৫	১৮.৪
শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	৯৪.০	৭৮.০
মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	৪.৮	৪.৫
গর্ভ নিরোধ হার	৩৯.৯	৪৮.৭
	(১৯৯১)	
ফারটিলিটি হার (প্রতি মহিলা)	৪.৩	৩.৫
গড় আয়ুস্কাল	৫৫.৯	৫৮.০
নিরাপদ খাবার পানি লভ্যতা (গৃহ%)	৮৯.০	৯৬.৩
সেনিটারী ল্যাট্রীন (গৃহ%)	২১.০	৩৫.৩

সূত্রঃ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ঃ ১৯৯৬, পৃঃ ৮১

উক্ত সারণী থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালে স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে ৩২.৮ জন থেকে ২৬.৯ জনে কমে এসেছে, স্থূল মৃত্যু হার ১.১৩% থেকে ৮.৫ এ নেমে এসেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২.১৫% থেকে ১.৮৪% এসেছে; সারণীতে শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, গর্ভ নিরোধ হার এবং ফারটিলিটির হার প্রত্যেকটি

আনুপাতিক হারে কমে এসেছে। এ সময়ে গড় আয়ুষ্কাল, নিরাপদ খাবার পানি লভ্যতা এবং সেনিটারী ল্যাট্রীন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এছাড়াও "দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই কাংখিত লক্ষ্য ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা হইতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচী সঠিক বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মসূচী গুলি হইল ই,পি, আই, উদারাময় রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী। ই,পি,আই, কর্মসূচীর আওতায় ৬টি রোগ প্রতিরোধ কল্পে এই কর্মসূচী বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছে।"[৪৫] সূতরাং এ ক্ষেত্রে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যা দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

নারী ও শিশু উন্নয়নঃ

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার নারী ও শিশু উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। নারী ও শিশুদের উন্নয়ন কল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেছে এবং একজন মন্ত্রীর অধীনে এই মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করে ছিলেন। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ এবং বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা নারী ও শিশু উন্নয়নে কাজ করছে। মহিলারা যে ব্যাপকভাবে আয়, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজ কল্যান মূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করছে ; এসব কার্যক্রম বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্তবিধায় এসব মন্ত্রণালয়কে (৩১টি) ফোকাল পয়েন্ট করে মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে প্রধান ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করছে। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় মহিলা উন্নয়ন কাউন্সিল নারী উন্নয়ন বিষয়ক নির্দেশনা প্রদান করছে।[৪৬] আইনের দিক দিয়ে ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৪৪ নং আইনের মাধ্যমে গৃহীত সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন আইন (১৯৯২) এ নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাকুরী ক্ষেত্রেও মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। অন্যান্য চাকুরীতেও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ের ন্যায় স্থানীয় পর্যায় ও নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২১ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রকাশিত বার্ষিক বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি প্রতিবেদনে বলা হয়, "দেশের চতুর্থ পাঁচসালা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) বিশ্ব শিশু সম্মেলনে গৃহীত অধিকাংশ লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রথম কয়েকটি দেশের অন্যতম হওয়ার গৌরব অর্জন করে"[৪৭]। সূতরাং দেখা যাচ্ছে নারী ও শিশু উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করেছে খালেদা জিয়ার সরকার।

যুব উন্নয়ন ঃ

দেশের বিপুল সংখ্যক যুব শক্তি কাজে লাগানোর জন্য খালেদা জিয়ার সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করছে। যুব শক্তিকে বিশেষ করে উৎপাদনশীল ও আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সরকারও এনজিও কর্তৃক কর্মসংস্থান মূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (১৯৯৫-২০১০) সারা দেশে প্রতিবছর প্রায় দেড় লক্ষ যুবকের বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেড প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক এদের ৬০% কে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "থানা সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী" যার অধীনে ৩২টি থানার দরিদ্র পরিবারের যুবকদের সংগঠিত করে উপার্জন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার ফলে যুবকদের আত্ম নির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নঃ

সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও খালেদা জিয়ার সরকারের অবদান কম নয়। সমাজ কল্যান কার্যক্রমের আওতায় অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ নারী, পুরুষ, শিশু শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্যদের পুর্নবাসন ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৯০-৯৫ মেয়াদে কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির অধীনে প্রায় ৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে ৪১.৬ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। ১৯৯৫/৯৬ সালে ৩৫ কোটি টাকার ঋণ দান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৯]

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট স্থাপন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ, পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকার ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষ করে শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও উল্লেখিত অন্যান্য খাতে সমূহের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সংস্কার, প্রশিক্ষণ ও ঋণ দান কর্মসূচি জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা নারী ও শিশু উন্নয়নে যুব উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ট) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

দেশের উন্নয়ন নীতি ও লক্ষ্য সমূহের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান একটি প্রধান লক্ষ্য। একটি দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নের জন্য দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি আবশ্যক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দৈনিক মাথা পিছু ক্যালরী গ্রহণের ভিত্তিতে দরিদ্র বিস্তৃতি প্রাক্কলন করে থাকে। যারা দিনে ২১২২ কিলো ক্যালরী কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তাদের দারিদ্র সীমার নীচে চিহ্নিত করা হয়। যারা দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালরীর কম খাদ্য গ্রহণ করে তাদের চরম দারিদ্র হিসেবে গণ্য করা হয়। দারিদ্র সমস্যাকে প্রকট করে তুলছে বেকারত্ব । ১৯৯০/৯১ সালে শ্রম শক্তির ১৮.৫% বেকার ১৯৯০/৯১ সালে শ্রম শক্তি জরিপ অনুসারে শ্রম শক্তি ছিল ৫.১ কোটি এবং ১৯৯৫ সালে প্রাক্কলিত শ্রম শক্তি ৬.২ কোটি।[৫০] "সার্ক কর্তৃক গঠিত দারিদ্র দূরীকরণে স্বতন্ত্র দক্ষিন এশিয়ার কমিশনের রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় (১৯৯২) এর ভিত্তিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সালে সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০২ সাল নাগাদ দরিদ্র দূরীকরণ নীতি ও কৌশলে ঢাকা ঘোষণায় (Dhaka Declaration) দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে এক উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার বিশেষ দিক গুলো হলোঃ

* দারিদ্রগণ কোন দায় নয় বরং তারা সম্পদ;
* দারিদ্রগণ কর্মক্ষম, তাদের প্রয়োজন পুঁজি ও ঋণ;
* তারা এর সাহায্যে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র ভেঙ্গে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় গড়ে তুলতে এবং
* বিনিয়োগে সক্ষম এবং প্রক্রিয়ায় জাতীয় অর্থনীতিতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ

দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।"[৫১]

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের মূখ্য অর্থনীবিদ শেখর সাহার, "বাংলাদেশ ঃ কাউটিং দ্যা পুওর টু মেকিং দ্যা পুওর কাউন্ট" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করেন যে, ১৯৯০-৯১ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে চরম দারিদ্র ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায়। রিপোর্টে বলা হয়, "পুরো ৮০'র দেশ জুড়ে দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি হলেও ৯০ দশকের প্রথমাংশে গতিশীল প্রবৃদ্ধির হার, শিক্ষাকে উৎসাহিত করা, সরকারী ব্যয়কে দারিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তন মুখী করা এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কার্যকর ভূমিকার ফলেই বিশাল দারিদ্রকে ব্যাপকভাবে দমানো সম্ভব হয়েছে।" রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়, "১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে চরম দারিদ্র সীমায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ছিল শতকরা ৪০.৯১ ভাগ, ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে ছিল ৪২.৬৯ ভাগ, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে তা কমে ৩৫.৫৫ ভাগ। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে গ্রামাঞ্চলে এই হার ছিল শতকরা-৪৫.৯৫, ১৯৯৫-৯৬ সময়ে তা কমে ৩৯.৭৬ ভাগ। একই সময় চরম দারিদ্র ২৩.২৯ ভাগ থেকে কমে ১৪.৩২

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ।"[৫২]

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা যেমন, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ রুরালএডভান্সমেন্ট (ব্রাক), গ্রামীন ব্যাংক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ দান কর্মসূচী, প্রভৃতির মাধ্যমে ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ঋণ দানের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এই সমস্ত সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারী পর্যায় আরও যে সমস্ত সংস্থা ও মন্ত্রণালয় কাজ করছে তা হল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও পূণর্বাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প। এ ছাড়াও কাজের বিনিময় খাদ্য, গ্রামীন সড়ক অবকাঠামো নির্মান/রক্ষণাবেক্ষন এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। অপর দিকে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে (ইতিপূর্বে আলোচিত) দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

ঠ) কৃষি উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি বড় খাত। তবে একটি দেশের উন্নয়নে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যত কম হবে ততই মঙ্গল। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ৩২% এবং কর্মসংস্থানের ৬৬% কৃষিতে নিয়োজিত। ১৯৯০/৯১ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অবদান ছিল ৩৮%।[৫৩] কৃষি খাতে জিডিপির অবদান হ্রাস পাওয়ার কারণ হল কৃষি খাতে পরস্পরের ভূর্তকি বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কৃষির উন্নয়নে খালেদা জিয়ার সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি'র) নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষকের উন্নয়ন কল্পে ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ ও ৫০০০ টাকা পর্যন্ত অনাদায়ী কৃষি ঋণ ও তার সুদ মওকুফের ওয়াদা করেছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মন্ত্রী সভার বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "সরকার আগামী পয়লা বৈশাখ (১৫ এপ্রিল, ১৯৯১) থেকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অনাদায়ী কৃষি ঋণ ও তার সুদ আদায় মওকুফ করবে। এছাড়াও মন্ত্রী পরিষদের ঐ বৈঠকে কৃষকদের উন্নয়ন কল্পে কৃষি ঋণের বিষয়ে সকল সার্টিফিকেট মামলা এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত সার্টিফিকেট মামলা স্থগিতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।"[৫৪] কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় কৃষি খাতে সরকারের ভূর্তকি বৃদ্ধি পায়। এদিকে খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে ২৯ এপ্রিল (১৯৯১) উপকূলীয় অঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। "৪৪ লক্ষ লোক, ৩৩ লক্ষ ঘড় সম্পূর্ণ এবং ২০ লক্ষ আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ৯০ ভাগ জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।"[৫৫] শুধুমাত্র উপকূলীয় জলোচ্ছাস নয়, "একের পর এক টর্নেডোয় বিপর্যস্ত হতে থাকে দেশের আরও অনেক এলাকা। হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা, নীলফামারী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুরে টর্নেডো জীবন হানি ঘটিয়েছে, বিপুল সম্পত্তি বিনাস করেছে।"[৫৬] এর ফলে কৃষির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু আবাদযোগ্য কৃষি জমি বাড়ছেনা বরং দিন দিন কমে যাচেছ। কারণ বাড়তি জনসংখ্যার আবাসস্থল গড়ে তোলার জন্য কৃষি যোগ্য জমি বেছে নেয়া হয়। কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও খালেদা জিয়ার শাসনামলে কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৯০/৯১ এ ৫৯৫.৬ কোটি টাকা হতে ১৯৯৪/৯৫ সালে বৃদ্ধি পায় ১৪৯০.৪ কোটি টাকায়। এপ্রিল ১৯৯৬ এ এর পরিমাণ ছিল ১০১৮.১ কোটি টাকায়।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.১৪
কৃষিঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকায়)

বছর	বিতরণ	আদায়	৩০শে জুন তারিখে স্থিতি
১৯৯০/৯১	৫৯৫.৬০	৬২৫.৩২	৫৭০৩.৪৫
১৯৯১/৯২	৭৯৪.৫৯	৬৬২.১১	৫৩৬৯.৫৬
১৯৯২/৯৩	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩/৯৪	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪/৯৫	১৪৯০.৩৮	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫/৯৬	১৬৩৫.৮১	১৩৪০.০২	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৬/৯৭	১৬৭২.৪৩	১৬৪৬.৩৮	৮২৫৬.০০
১৯৯৭/৯৮	১৮১৪.৫৩	১৭৭৯.২৯	৮৫১৫.০৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬ এবং ২০০০, পৃঃ ৫৩ এবং ৫৩।

উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় ১৯৯০/৯১ সালে যেখানে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় ৫৯৫.৬০ কোটি টাকা ১৯৯৫/৯৬ সালে সেখানে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় ১৬৩৫.৮১ কোটি টাকা যা প্রায় তিন গুনের ও বেশী । ১৯৯৭/৯৮ সালে দুই বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৪১.৫৩ কোটি টাকায় পৌঁছে। কাজেই খালেদা জিয়ার শাসনামলে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। আধুনিক কালে রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য মানদন্ডও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠ যোগাযোগ নীতির উপর নির্ভর করে। যোগাযোগ নীতি সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইউরোপ যোগাযোগ নীতি গবেষণা সমন্বয়কারীদের সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে, "যোগাযোগ নীতিমালা হচ্ছে একটি সমাজের সুবিবেচিত এবং সচেতন কিছু রীতিনীতি ও কার্যক্রমের সমষ্টি যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের বিরাজমান ভৌত এবং মানবীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্টি কিছু যোগাযোগ চাহিদা পূরণ করা"।[৫৮] খালেদা জিয়ার শাসনামলে সুনির্দিষ্ট যোগাযোগনীতি না থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সড়ক নৌ বিমান ও রেলপথ সহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে খালেদা জিয়ার শাসনামলে সড়ক ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্যনীয় মাত্রায়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্তির প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া রেডিও টেলিভিশনের ভাষণে বলেন, "উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। ১৯৮৯-৯০ সালে যোগাযোগ খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫৪০ কোটি টাকা। আর এই বছর (অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬) এই খাতে আমরা বরাদ্দ করেছি ২ হাজার ১শ ৩৫ কোটি টাকা। গত কয়েক বছরে দেশে ৪ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা হাজার হাজার ব্রীজ, কালভার্ট নির্মিত হয়েছে।"[৫৯]

বস্তুতঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে মেঘনা গোমতি সেতু বাস্তবায়ন, বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম ও বৃহৎ প্রকল্প যমুনা বহুমুখী সেতুর কাজ শুরু থেকে অসংখ্য সেতু নির্মিত হয়েছে। যোগাযোগের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়েছে, তবে রেলওয়ের লোকসানের পরিমান কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম আলোচনা করা হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

সড়ক যোগাযোগঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬ থেকে দেখা যায়, "এপ্রিল ৯৬ পর্যন্ত দেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন প্রায় ১৬ হাজার কিলোমিটার সড়ক পথ রয়েছে। ১৯৯১ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৪১০৪ কিলোমিটার এবং ১৯৯০ সালে ছিল ১৩৬২৯ কিলোমিটার।[৬০] অর্থাৎ ১৯৯০ সাল থেকে এপ্রিল ৯৬ পর্যন্ত কেবল মাত্র সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন আড়াই হাজার কিলোমিটার সড়ক বর্ধিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ২৪ নভেম্বরের (১৯৯৫) বক্তৃতায় যে চার হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মানের কথা বলেছেন তার বাকী সড়ক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরাধীনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া এলজিইডির মাধ্যমে ব্যাপক আধাপাকা ও কাঁচা রাস্তার সংস্কার ও নতুন সড়ক নির্মান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৫ মার্চ (১৯৯৪) জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া অপর এক বক্তৃতায় বলে ছিলেন "গত তিন বছরে পল্লী অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৫ হাজার ১শ ৩ কিলোমিটার ফিডার রোড এবং ২৬ হাজার ৮ শত ৬৩ টি ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মিত হয়েছে।"[৬১] কেবল মাত্র রাস্তা নির্মাণ নয় সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রেও খালেদা জিয়ার সরকার অভূত পূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন ও উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত সরকার (এরশাদ আমলে) যমুনা বহুমূখী সেতু কর্তৃপক্ষ নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। তবে খালেদা জিয়ার সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর এই সেতু বাস্তবায়নের বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যমুনা সেতু নির্মানের ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে বিশ্বব্যাংক এডিবিও জাপানের আর্থিক সহায়তা ও দেশীয় আভ্যন্তরীণ সম্পদসহ প্রায় চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৮.৫ মিটার প্রশস্ত এই সেতু প্রকল্পে সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১০ এপ্রিল (১৯৯৪) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর ফলে এদেশের মানুষের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হল। যদিও সেতুর প্রকৃত নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে। পরবর্তীতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালের ২৩ জুন যমুনা বহুমূখী সেতুর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু সেতু নামে উদ্বোধন করে। এই সেতুর উপর রেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হয়। যমুনা সেতু নির্মানে খালেদা জিয়ার সরকারের অবিস্মরনীয় অবদান একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ঢাকা চট্টগ্রামের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯১/৯২ সালে মেঘনা গোমতি সেতু নির্মান কাজ শুরু হয়। ৩১৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ের নির্মিত ১.১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি ১ নভেম্বর ১৯৯৪ বেগম খালেদা জিয়া উদ্বোধন করেন। এর ফলে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানীর অবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভুমিকা পালনের সহায়ক হয়েছে। উল্লেখিত সেতু ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অন্যান্য সেতুর মধ্যে 'মহানন্দা' ১৯৯১/৯২-১৯৯২/৯৩ ধলেশ্বরী প্রথম ও দ্বিতীয় সেতু ইত্যাদি। বিএনপি'র ৭ম জাতীয় সংসদের নিবাচনী ইশতেহারে খালেদা জিয়ার শাসনামলের উন্নয়ন কার্যক্রম বর্ণনা কালে উল্লেখ করা হয়, " তিনশতাধিক ছোট বড় সেতু, অসংখ্য কালভার্ট এবং কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মান ও পাকা করা হয়েছে। রূপসা সেতু নির্মানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।"[৬১]

রেলওয়ে পরিবহনঃ

বাংলাদেশের ইতিহাসে রেলপথের ক্ষেত্রে নতুন কোন রেল লাইন স্থাপন না করা হলেও রেল খাতের উন্নয়নের জন্য খালেদা জিয়ার সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। বিএনপি সরকার রেলওয়ে সেবার মান উন্নীত করে রেলওয়েকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে রেলওয়েতে কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে। রেলপথ বিভাগ অবলুপ্ত করে "বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ" গঠন করে তা সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে।[৬২] পরিশিষ্ট ৪ এ দেখা যায় রাজস্ব বাজেটে ১৯৯০/৯১ সালে রেলওয়ে যেখানে নীট ১৪৯ কোটি টাকা

লোকসান দিয়েছে ১৯৯৪/৯৫ সালে সেই লোকসানের পরিমান মাত্র ৯০ কোটি টাকায় নেমে আস। কিন্তু ১৯৯৫/৯৬ সালে ব্যাপক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে লোকসানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৯ কোটি টাকায় দাড়ায়। ১৯৯০/৯১ সাল থেকে ১৯৯৪/৯৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর লোকসানের পরিমাণ কমে এসেছিল। ফলে দেখা যায় রেলওয়ে ধীরে ধীরে লাভ জনক প্রতিষ্ঠানের পরিণত হতে যাচ্ছিল।

নৌ ও বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাবের ফলে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালের টেলিফোনের সংখ্যা ২.৯ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯৫ সালে ৩.৪ লক্ষ্য করা হয়েছে। পুরাতন টেলিফোন লাইন ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে। এনডব্লিউডি এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। জনসাধারণের টেলিফোন সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে দেশে কার্ড কোন ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। থানা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন, সেল্যুলার টেলিফোন, নৌ-টেলিযোগাযোগ এবং পেজিং সার্ভিস ইতোমধ্যে বেসরকারী খাতে দেয়া হয়েছে। [৬৩]

এছাড়াও তথ্য প্রবাহ ব্যাপক গতিশীল করার লক্ষ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেল সার্ভিস প্রবর্তন ; এ লক্ষ্যে উচ্চ গতি সম্পন্ন ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। বর্হিবিশ্বের সাথে তথ্য আদান প্রদানের জন্য ভি-স্যাট স্থাপনের সুযোগ করা হয়েছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখিত অগ্রগতি ছাড়াও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে, আকাশ সাংকৃতি উন্মুক্ত করা হয়েছে যার ফলে উপগ্রহ চ্যানেলের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে সরাসরি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু রেডিও এবং টেলিভিশনের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় নাই।

অতএব দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের একটি অন্যতম মানদন্ড যোগাযোগের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক অগ্রগতি উক্ত সময়ে রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে।

পরিশেষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (১৯৯১-৯৫) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে দেশের প্রবৃদ্ধি ও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কর ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে কর ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে যা রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় অর্থায়নের যোগান রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রা পরিস্থিতির উন্নতি সহ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা পরবর্তীতে বর্তমান সরকারের আমালে কমে এসেছে। বৈদেশিক সাহায্য ও অবমুক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য বছরের তুলনায় উল্লেখিত সময়ের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি সন্তোষজনক ছিল। টাকার বিনিময় যোগ্যতা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে বানিজ্যের বাধা সমূহ দুর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। টাকার অবমূল্যায়ন যৌক্তিক আকার করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সরকার ব্যাপকভাবে টাকার অবমূল্যায়ন করেছে। পুঁজি বাজারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যার ফলে পুঁজিবাজার একটি শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে পুঁজি বাজারকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে আসা হয়েছে। উক্ত সময়ে মূল্য স্ফীতি ছিল সার্ক দেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং উন্নত দেশ সমূহের প্রায় সমান। শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়। শিক্ষার ব্যাপক অগ্রগতির মাধ্যমে দক্ষ মানব গোষ্ঠী গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল খালেদা জিয়ার সরকারের উল্লেখ যোগ্য সাফল্য। এছাড়াও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, সমাজ কল্যান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সর্বোপরি কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমুল পরিবর্তন আনায়ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং অর্থনৈতিকবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলেছেন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে এ সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অগ্রগতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই রাজনৈতিক উন্নয়ন।

খ) সংসদীয় কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬)

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংসদই হলো সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু। জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা অভাব অভিযোগ ও সমস্যার সমাধানে বাস্তব প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা। একটি সরকার গঠন করা এবং সেই সরকারের কর্মকান্ড অনুমোদন সমর্থন এবং প্রয়োজনে সমালোচনা করা। রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা হিসেবে সংবিধানের নীতিও আদর্শ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইনের সংস্কার সাধন, নীতি নির্ধারণ, বাজেট ও সরকারী আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বোপরি সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ ছাড়াও সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরাকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও আমলা শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উত্থাপিত অভিযোগ, অনিয়ম, দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি ও কর্তব্যে অবহেলা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যাসত্য সরকারের নিকট সুপারিশ সহ পেশ করে। সংসদ যে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করে। সরকার যদি তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগনের আস্থা হারান কিংবা বিতর্কিত হন তখন সংসদ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। অনাস্থা প্রস্তাবে সরকার হেরে গেলে সরকারের পতন ঘটে। সাংসদ গণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এছাড়াও সংসদীয় রীতি অনুযায়ী আরও অনেক প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ৬৫(১) জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকর্তা সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তি পত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পন হইতে এই দফায় কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত করিবেনা।[৩৮] আবার সংবিধানের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ৭(১) জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। সুতরাং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যগণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান অনুযায়ী উল্লেখিত দায়িত্ব প্রাপ্ত।

সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ বিরোধী দল। সংসদীয় গণতন্ত্র সাফল্যের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) জয়লাভ করে সংবিধান অনুযায়ী শপথ বাক্য পাঠ করে সংবিধান ও জনগের রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। খালেদা জিয়ার সরকার প্রথমে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থাধীনে সরকার গঠন করলেও ৬ মাসের মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তন করায় জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করলেও বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়াও জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী ও বিরোধী দলের কার্যকরী ভুমিকা পালন করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে দুইটি সংসদ কাযকরী ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদ এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ। পঞ্চম জাতীয় সংসদকে কেন্দ্র করেই খালেদা জিয়ার শাসনকাল আবর্তিত ছিল। তাই পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দীর্ঘ দিন দেশ এক দলীয় ও সামরিক শাসনাধীনে শাসিত হওয়ার পর পঞ্চম সংসদকে ঘিরে বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বপ্ন দেখে। বাংলাদেশের ইতিহাসে পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল দীর্ঘতম। ২২টি অধিবেশনে এই সংসদ ৪০০ কার্যদিবসে সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিল এই

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এই সংসদ কর্তৃক সংবিধানের একাদশ ও ঐতিহাসিক দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ করা হয়েছে। (যা ইতিপুর্বে অন্য অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে) পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অধিকাংশ সময় অনুপস্থিতির কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায় ছিল। এছাড়াও ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। স্পীকার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ না করলে ও একাদিকক্রমে ৯০ দিন অনুপস্থিতির কারণে বিরোধী দলের ১৪৭ জন সাংসদের আসন শূন্য হলে ৫ম জাতীয় সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয়। যা ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। সংসদে উপস্থিত থেকে সরকারের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং সমালোচনা করা বিরোধী দলের মূখ্য দায়িত্ব। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল অনুপস্থিত থেকে তাদের সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার সরকারের পরিচালিত বিতর্কিত ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময় কার্যকরী ছিল। ১টি অধিবেশনে ৪টি কর্ম দিবসের মধ্যে এই সংসদের মেয়াদ সমাপ্ত হলে ও এই সংসদ কর্তৃক বহু প্রতীক্ষিত ও কাঙ্খিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়। কাজেই ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ স্বল্প স্থায়ী হলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে কম গুরুত্ব বহন করেনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করায় এই অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন পর্যালোচনা করতে হলে (১৯৯১-৯৬) সময়ের সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গ ক্রমে ইতোপূর্বে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী আইন, সরকারের বিরুদ্ধে উথাপিত অনাস্থা প্রস্তাব, গোলাম আজম প্রসঙ্গ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে বিরোধী দলের দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতি, গণ পদত্যাগ এবং সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য ঘোষণা, উপনির্বাচন প্রসঙ্গ, এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাসকৃত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল সহ ইত্যাদি বিষয় । উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও ঘটনা বহুল পঞ্চম জাতীয় সংসদের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হল যার মাধ্যমে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনঃ

৫ এপ্রিল (১৯৯১) পঞ্চম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশন ৪র্থ জাতীয় সংসদের স্পীকার জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হয়। প্রাক্তন স্পীকারের একমাত্র দায়িত্ব পরবর্তী স্পীকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল স্পীকার পদে অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং ডেপুটি স্পীকার পদে এ্যাডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলীর নাম প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। কিন্তু পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিরোধী দল তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে আওয়ামী লীগ স্পীকার পদে জনাব সালাহউদ্দীন ইউসুফ এবং ডেপুটি স্পীকার পদে অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানের নাম প্রস্তাব কারণে। ফলে নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংসদের বিভক্তি ভোটে বিএনপি প্রার্থী পক্ষে ১৮৭ ভোট এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পক্ষে ৯৭ ভোট পড়ে। এর ফলে স্পীকার পদে আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং ডেপুটি স্পীকার পদে অ্যাডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলী নির্বাচিত হন। বিএনপি প্রার্থী পক্ষে বিএনপি ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর ২০জন সদস্য, তিনজন স্বতন্ত্র সদস্য, ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন, এনডিপির সালাইউদ্দীন কাদের চৌধুরী ও জাসদের শাহজাহান সিরাজ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী পক্ষে আওয়ামী লীগ এবং ৮ দল ভূক্ত অন্যান্য শরীক দল সমর্থন প্রদান করেন। তবে ৮দল ভূক্ত সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও জাতীয় পার্টি ভোট দানে বিরত থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনের পর স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে ডেপুটি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী স্পীকার

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন এবং ডেপুটি স্পীকার পদে সাংসদ হুমায়ূন খান পন্নী নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন সংসদের সর্ব সম্মতি ক্রমে সম্পন্ন হয় যা ছিল গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

জাতীয় সংসদের অধিবেশনও অন্যান্য পরিসংখ্যানঃ

ইতো পুর্বে বলা হয়েছে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘতম সংসদ। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় এবং ৪ বছর ৭মাস ২০ দিন পর ১৯৯৫ সালের ২৪ নভেম্বর বিলুপ্তি ঘোষণা পর্যন্ত উক্ত সময়ে ২২টি অধিবেশনে ৪০০টি কর্ম দিবস কার্যকরী ছিল। এরপর দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৩ বছরে ৮টি অধিবেশনে ২০৬টি কার্য দিবস এবং প্রথম জাতীয় সংসদ তার মেয়াদে ২ বছর ৭ মাসে ৮টি অধিবেশনের ১৩৪ টি কর্ম দিবসে মিলিত হয়েছে। এছাড়াও ৪র্থ জাতীয় সংসদে ৭টি অধিবেশনে ১৬৮টি কার্যদিবস ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ১টি অধিবেশনে ৪টি কর্ম দিবসে মিলিত হয়েছে। বর্তমান সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৯ পর্যন্ত সারে তিন বছরে ১৫টি অধিবেশনে ২৬৭ টি কর্ম দিবসে মিলিত হয়েছে। (সারণী ৬.১৬ দ্রষ্টব্য)

সারণী ৬.১৫ থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২২টি অধিবেশনে ৪০০টি কর্মদিবসে মোট ১৮৩৬ ঘন্টা অধিবেশনরত ছিল। উক্ত সংসদে সাংসদদের গড় উপস্থিতি ছিল ১৮০.১৫ জন। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিগত ৬টি সংসদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিল পাস করেছে। ১টি বেসরকারী বিল সহ মোট ১৭৩টি বিল পাস করা হয়েছে। এরপর প্রথম জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৫৪টি বিল চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৪২টি বিল, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৬৫টি বিল, তৃতীয় জাতীয় সংসদ কর্তৃক।

সারণী ঃ ৬.১৫

পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি, উত্থাপিত ও পাস কৃত বিলের সংখ্যা দেখান হলঃ

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশন দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	অধিবেশন গড় উপস্থিতি	সংসদে উত্থাপিত সরকারী বিল	সংসদে উত্থাপিত বেসরকারী বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল
প্রথম	৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে ১৯৯১	২২	১৪০.৪৮	২৫৭.৩	৩০টি	১২টি	১৮
দ্বিতীয়	১১ জুন থেকে ১৪ আগষ্ট	৪৩	২৪৬.৫৮	২৫৯.২০	১১	০৭	১০
তৃতীয়	১২ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর, ১৯৯১	১৪	৭০.৩১	২৩৪.০২	১২	০৪	০৪
চতুর্থ	৪ জানুয়ারী থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২	২৭	১৪৭.৩৬	২২২.২১	১৬	০৬	১৮
পঞ্চম	১২ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৯২	৬	৩৩.০৭	২৩৫.৬৭	০১	০৩	-
ষষ্ঠ	১৮ জুন থেকে ১৩ আগষ্ট,১৯৯২	৪১	২৬৩.১৪	২২৯.৭৬	২৯	০৮	১৮
সপ্তম	১১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর ১৯৯২	২০	৮৯.৩২	১৯১.২	১৫	০৮	১৮

Dhaka University Institutional Repository

* অষ্টম	৩ জানুয়ারী থেকে ১১ মার্চ,১৯৯৩	৩২	১৩৩.৩১	২০১.২৯	১০	০৯	১২ *
নবম	৯মে থেকে ১৩মে ১৯৯৩	৫	২৫.৪৯	২৩২.০১	০৬	০৮	-
দশম	৬জুন থেকে ১৫ জুলাই ১৯৯৩	৩১	১৯৮.২৯	২২১.১৭	০৭	০১	০৯
একাদশ	১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেঃ ১৯৯৩	১২	৬৭.৫৭	২২০.৫	০৫	০৮	০৬
দ্বাদশ	২২ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩	১৪	৬৭.৪৭	২০১.৫	০৫	০৪	০৭
ত্রয়োদশ	৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ৭মার্চ ১৯৯৪	১৯	৬৩.০৮	১৭৩.৬৮	০৭	০২	০২
চতুর্থদশ	৪মে থেকে ১২ মে ১৯৯৪	৬	২০.৪৯	১৪২.৬৭	০৩	০১	০৬
পঞ্চদশ	৬জুন থেকে ১১ জুলাই ১৯৯৪	২৫	৭১.১৩	১১৯.১২	০৯	-	০৭
ষষ্ঠদশ	৩০ আগষ্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	১০	১৮.০৩	১১১.১	০১	-	০৪
সপ্তদশ	১২ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪	২১	৩৯.২৭	১০৮	০৬	-	০৭
অষ্টাদশ	২৩ জানুয়ারী থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫	১৮	৩২.৩৭	১০৮	১২	-	০৯
উনিশ তম	২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৯৫	৪	১২.০০	১২৯.৭৫	০২	-	০১
বিশ তম	১৫ জুন থেকে ১১ জুলাই ১৯৯৫	১৭	৬২.৪৬	১২৪.০৫	০৯	-	০৮
একুশ তম	৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	১০	২৯.৫১	১০৯.৪	০৫	-	০৮
বাইশ তম	১৫নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫	৩	৫.২৭	১৩১.৬৬	০২	-	০১
২২ টি	মোট	৪০০	১৮৩৬.০০	১৮০.১৫	২০৩	৮১	১৭৩

সূত্রঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (১৯৯১-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

* অষ্টম অধিবেশনে পাসকৃত ১২টি বিলের মধ্যে সংসদ কর্তৃক গৃহীত এক মাত্র বেসরকারী বিলটি ছিল।

৩৯টি বিল গৃহীত হয়েছে। বর্তমান ৭ম জাতীয় সংসদ ১৫টি অধিবেশনে ৯৩টি বিল পাস করেছে। সূতরাং দেখা যাচ্ছে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ইতিপূর্বেকার সংসদ থেকে কার্যক্রমের দিক থেকে শীর্ষে ছিল। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন সংসদই তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে নাই। পঞ্চম জাতীয় সংসদ মেয়াদ পূর্ণ না করতে পারলেও মেয়াদের কাছাকাছি গিয়ে ছিল। মেয়াদ পূর্তির মাত্র ৪ মাস ১০ দিন পূর্বেই এই সংসদের অবসান ঘটে। তা সত্ত্বে ও ৫ম জাতীয় সংসদই মেয়াদ পূর্তির কাছা কাছি গিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়নঃ

আইন প্রণয়নের দিক থেকে পঞ্চম জাতীয় সংসদ খুবই গুরুত্ব বহন করে। সংবিধানের ২টি সংশোধনী বিল সহ মোট ১৭৩ টি বিল পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৭২টি সরকারী বিল এবং ১টি মাত্র বেসরকারী বিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২০৩টি সরকারী বিল এবং ৮১ টি বেসরকারী বিল উথাপিত হয় (সারণী ৬.১৫ দ্রষ্টব্য) । এক মাত্র বেসরকারী বিল "The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 1993 টি সংসদের অষ্টম অধিবেশন কর্তৃক ৪ মার্চ (১৯৯৩) সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১০ মার্চ (১৯৯৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভের পর ১৯৯৩ সালের ১১নং আইনে পরিণত হয়। সংবিধান সংশোধন বিল ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয় এর মধ্যে "সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন আইন" উল্লেখযোগ্য। ১৯৯২ সালের ৪৫ নং আইন হিসেবে উক্ত বিলটি ১ নভেম্বর (১৯৯২) জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে গৃহীত হয় এবং ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয়। এই আইনটি মাত্র ২ বছরের জন্য কার্যকরী করা হয়ে ছিল। এতে বলা হয়ে ছিল, সংসদ বিলটির মেয়াদ না বাড়ালে আগামী দুবছর পর এই আইনের কার্যকারিতা থাকবেনা এবং ক্ষতি গ্রস্থ ব্যক্তিকে ট্রাইবুনাল বা হাইকোর্ট ক্ষতি পুরণের নির্দেশ দিতে পারে।[৬৭] বিরোধী দল সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন

সারণী ৬.১৬

প্রথম থেকে সপ্তম (১৯৯৯ পর্যন্ত) জাতীয় সংসদের কার্যাবলীর সারাংশ

জাতীয় সংসদ	সংসদ উদ্বোধন	সংসদ বাতিল	মোট অধিবেশন	মোট কার্যদিবস	মোট বিল পাশ
প্রথম	৭ এপ্রিল ১৯৭৩	৬ নভেম্বর ১৯৭৫	৮টি	১৩৪	১৫৪
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল ১৯৭৯	২৪ মার্চ ১৯৮২	৮টি	২০৬	৬৫
তৃতীয়	১০ জুলাই ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	৪টি	১৬৮	১৪২
চতুর্থ	২৫ এপ্রিল ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	৭টি	১৬৮	১৪২
পঞ্চম	৫ এপ্রিল ১৯৯১	২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	২২টি	৪০০	১৭৩
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ ১৯৯৬	৩০ মার্চ ১৯৯৬	১টি	৪	১
সপ্তম*	১৪ জুলাই ১৯৯৬	-	১৫*	২৬৭*	৯৩*

সূত্রঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ও খালেদা হাবিব, বাংলাদেশ, নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রীসভা, ১৯৭০-৯১, ঢাকা, প্রকাশক এ আর মুরশেদ, ১৯৯১।

* সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রথম ১৫টি অধিবেশনের পরিসংখ্যান দেয়া হল।

আইনের কঠোর সমালোচনা করেন। এবং অভিমত ব্যক্ত করেন দেশের প্রচলিত আইনেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, " আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো এবং আমার হুকুম যদি পালিত হতো তা হলে ১ ঘন্টার মধ্যে সন্ত্রাস দমন করতে পারতাম" ।[৬৮] অথচ তৎকালীন বিরোধী দল বর্তমানে ক্ষমতা গ্রহনের পর সন্ত্রাস দমন আইনকে শুধু গ্রহণই করে নাই এই আইনকে আর ও

Dhaka University Institutional Repository

কঠোর করে স্থায়ী ভাবে প্রায়োগের ব্যবস্থা করেছে। বিএনপি সরকার সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন আইনের মেয়াদ দুই বছর পর আর মেয়াদ বৃদ্ধি করে নাই। যদি ও বাংলাদেশের অপরাধ দমনের জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। আজকের কাগজ ১৯ নভেম্বর (১৯৯২) সংখ্যা সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন আইনের দুই বছরের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, সন্ত্রাস মূলক অপরাধ দমন আইনে দুবছরে দেশে দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা ১৪১৫টি, এর মধ্যে চার্জশীট হয়েছে ১১২৪টি, বিচার সম্পন্ন হয়েছে ৭০১টি এরমধ্যে সাজা পেয়েছে ৩০৯টি মামলায়, খালাস পায় ৩৯২টি মামলায়। এছাড়া ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয় ২০০ টি মামলার এবং তদন্তাধীন থাকে ৯১ টি মামলা। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এ আইনের মামলায় তদন্ত শেষে চার্জশীটের হার ৮০% এর বেশী এবং সাজার হার ৪৪% এর বেশী যা প্রচলিত আইনের চেয়ে অনেক বেশী।[৬৯] কাজেই উক্ত আইনটি কার্যকর থাকলে প্রচলিত আইনের চেয়ে অধিক হারে মামলা নিস্পত্তি করা যেত। উপকূলীয় এলাকার জল দস্যুদের তৎপড়তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৯৪ সালে "কোষ্ট গার্ড বিল, ১৯৯৪" পাস করা হয়। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষা সহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়েছে। যদিও এই আইনটি বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নির্বাচন একটি অপরিহার্য মাধ্যম। নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে নির্বাচন কমিশন। তাই নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করণ সক্রান্ত "The Representation of the people (Amendment) Bill 1994" (নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত গণ প্রতিনিধি সংশোধন বিল) পাস করা হয়। ৩০ নভেম্বর (১৯৯৪) বিলটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১২ ডিসেম্বর (১৯৯৪) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর ১৯৯৪ সালের ২৩নং আইন হিসেবে আইনে পরিনত হয়। এই বিলের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। উক্ত বিলে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন করে রিটার্নিং অফিসার যা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক মনোনীত থাকবেন। বিলে বলা হয়েছে, সকল নির্বাচনে দায়িত্ব পালন কর্মকর্তাও কর্মচারী সরাসরি নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত থাকবেন । নির্বাচন কমিশন যে কোনো নির্বাচন কর্মকর্তাকে বদলী সাসপেন্ড করতে পারবেন। বিলে ভোট দেয়ার জন্য ভোটারদের পরিচয় পত্রের কথা বলা হয়েছে, যা ভোটার তালিকা বিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বিলে যে কোন পর্যায়ে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেয়া হয়েছে।[৭০] তৎকালীন আইন মন্ত্রী এই বিল সম্পর্কে বলেন, "এই বিল গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে। জনগণের ভোটে অধিকার নিশ্চিত হবে। ভোট কার চুপি, জাল ভোটের আর কোনো সুযোগ এর ফলে আর হবে না।"[৭১] বস্তুতঃ এই বিল পাসের ফলে কারচুপি মুক্ত নির্বাচনের পথ প্রশস্ত হয়। ৪ ডিসেম্বর (১৯৯৪) জাতীয় সংসদ আর একটি বিল "The Election Polls (Amendment) Bill, 1994" এর মাধ্যমে প্রত্যেক ভোটারের জন্য পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে অর্পন করা হয়েছে। এই দুইটি বিল পাস করার ফলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র উত্তরনের ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু পরবর্তী ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের পরিচয় পত্রের ব্যবস্থার রহিত করা হয়। পরিচয় পত্র বিহীন ভোট ব্যবস্থায় নির্বাচন কারচুপি মুক্ত করা কঠিন ব্যাপার। তবুও নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করণ বিলটি বর্তমানে বলবৎ থাকায় নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলও বিভিন্ন মহলের দাবি পূরণ হয়েছে। উল্লেখিত আইন সমূহ ছাড়াও জাতীয় সংসদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তি শালী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইনের অংশোধনী আনয়ন করেন। যেমন- রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, "The Local Government (union Parishads) (Second Amendment Bill, The Pourashava (Second Amendment) Bill, The Local Government (Upazila Parished and Upazila Administration Reorganisation) (Repeal) Bill, এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল সমূহ পাসের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থা সমূহকে অধিকতর গতিশীল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি ও উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্গঠন বিলের মাধ্যমে উপ-জেলা ব্যবস্থা রহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাসের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়েছে। (যা ইতোপূর্বে শিক্ষা উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।)

আরও অনেক বিল যেমন, অর্থ বিল সমুহ, ব্যাংক বীমা, শিল্প, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, নির্দিষ্টকরণ ও ব্যবসা সংক্রান্ত প্রভৃতি বিল প্রচলিত আইন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সংশোধন করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে ৫ম জাতীয় সংসদে পাস কৃত ১৭৩ টি বিলের তালিকা পরিশিষ্ট ৫ এ উল্লেখ করা হলো।

খালেদা জিয়ার শাসনামলের দ্বিতীয় মেয়াদে অর্থাৎ স্বল্প স্থায়ী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখ যোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। এই সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী ইতোমধ্যে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৭৩ টি আইনের মাধ্যমে বিশেষ করে গণতন্ত্র উন্নয়ন সম্পর্কিত আইন সমূহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরঃ

সংসদীয় কার্যক্রমের একটি আকর্ষনীয় বিষয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারকে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সদস্যদের তিন ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে। এ গুলো হলো, তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন, তারকা বিহীন প্রশ্ন এবং স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্ন। এ ছাড়াও তারকা চিহ্নিত ও তারকা বিহীন প্রশ্নের বিষয় সম্পর্কে সংসদ সদস্যগণ সম্পুরক প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় (সারনী ৬.১৭) ২২টি অধিবেশনে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক ৩৭,৯০৭ টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া যায়। উক্ত প্রশ্ন গুলির মধ্য থেকে ৯৩৯১টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্ন গুলির মধ্যে থেকে ৮৬৯২ টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ জবাব প্রদান করেন। ৭৭০টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন বাতিল এবং ২০৫৬৭টি প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায়। তারকা বিহীন প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২২টি অধিবেশনের ৯৪৬৩টি প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া যায়। উক্ত প্রশ্নগুলির মধ্য থেকে স্পীকার ৩৩৬৩টি তারকাবিহীন প্রশ্ন গ্রহণ করেন। গৃহীত ৩৩৬৩ টি প্রশ্নের মধ্যে ৩১৫৭ টি তারকা বিহীন প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গণ জবাব প্রদান করেন। ২৭৯৯ টি তারকা বিহীন প্রশ্ন বাতিল ও ৩৪৪৩ টি প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায়। স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখা যায় ২২টি অধিবেশনে ১৭৬টি প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্য থেকে স্পীকার ১০টি প্রশ্ন গ্রহণ করেন। গৃহীত ১০টি স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্নের মধ্য থেকে ৫টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী গণ জবাব প্রদান করেন। ১৪১ টি স্বল্প কালীননোটিশের প্রশ্ন বাতিল ও ১৯টি তামাদি হয়ে যায়। সারণী ৬.১৭ তে প্রতিটি অধিবেশনের প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা, গৃহীত নোটিশের সংখ্যা, বাতিল প্রশ্নের সংখ্যা, তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা ও সংসদে উত্থাপিত ও উত্তর প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যা দেখান হলো । ৫ম জাতীয় সংসদে অধিক সংখ্যক প্রশ্নের নোটিশ জমাদানের মাধ্যমে সংসদের গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও গৃহীত প্রশ্নের অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ উত্তর প্রদান করায় জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা অনেকাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। যা রাজনৈতিক উন্নযনেব ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.১৭

পঞ্চম জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নও প্রশ্নোত্তর

অধিবে-শন	প্রশ্ন	প্রাপ্ত নোটিশ (সংখ্যা)	গৃহীত নোটিশ (সংখ্যা)	বাতিল প্রশ্ন (সংখ্যা)	তামাদি প্রশ্নের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রশ্ন (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রথম	তারকা চিহ্নিত	২০৯৬	৭৫৬	৫৭৫	৭৬৫	৫৭৮
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫০২	১২৮	৮০	২৯৪	৮৫
	স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্ন	৩৪	১	১৯	৭	১
দ্বিতীয়	তারকা চিহ্নিত	৫৫৮৪	১৩১৫	৯৫৫	৩৩০৪	১২৮০
	তারকা চিহ্নিত বিহীন	১৩৫৪	২৮৫	২৩৯	৮৩০	২৭৯
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৫৬	৬	৫০	-	২
তৃতীয়	তারকা চিহ্নিত	২৭৪৩	৪১৫	২৬২	২০৬৬	৪১৫
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৪৭২	৫৫	২৯	৩৮৮	১৫৫
	স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্ন	৩০	২	২৩	৫	২
চতুর্থ	তারকা বিহীন চিহ্নিত	৬৪২১	১৫৫৩	১৪১০	৩৪৫৮	১৫৫৩
	তারকা চিহ্ন	১১৯৩	৩৫৫	২৩৮	৬০০	৩৫৫
	স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
পঞ্চম	তারকা চিহ্নিত	১২৭৩	১৬৩	১২৪	৯৮৬	৭৫
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৩১৭	৯৮	৮৩	১৬৬	২৭
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৬	১	৫	০	-
ষষ্ঠ	তারকা চিহ্নিত	২৮৪০	৭৮০	৭৫২	১৩২৯	৭৫৯
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৯৭৭	৫৭৫	৩৬৮	৪৬	৫৬৩
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১৭	-	১৭	-	-
সপ্তম	তারকা চিহ্নিত	১৭৬৭	৩৫৯	৩৯৭	১০১১	৩৫৯
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৬৮৮	২০৫	২৮১	২০২	২০৫
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৫	-	৩	২	-

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম	তারকা চিহ্নিত	১৭৮১	৩৭১	৪৬১	৯৪৯	৩৪১
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫২৯	২০৬	২৫৫	৬৮	১৮৪
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৫	-	৫	-	-
নবম	তারকা চিহ্নিত	৩২৯০	৩৭৩	৩৪০	২৫৭৭	১৬৯
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫৫৪	১৫৩	২০৭	১৯৪	৬৮
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১	-	-	১	-
দশম	তারকা চিহ্নিত	৩১৬৫	৯০৫	১১৫৩	১১০৭	৯০৫
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৬৩৩	২৮৬	৩১৩	৩৪	২৮৬
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১৩	-	১৩	-	-
একাদশ	তারকা চিহ্নিত	১৮৭৬	৩৪৮	৩১৮	১২১০	৩৪৮
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫৩৩	১১৯	২৭০	২৪৪	১১৯
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	২	-	২	-	-
দ্বাদশ	তারকা চিহ্নিত	৮০৪	৩৩২	২০৩	২৬৯	৩৩২
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৪০৯	১২৩	১১৬	১৭০	১২৩
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
ত্রয়োদশ	তারকা চিহ্নিত	১৯৯৬	৫৮৭	৫১১	৫১১	৫৫১
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫০০	৩০১	১৭৭	২২	২৮২
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৩	-	৩	-	-
চতুর্দশ	তারকা চিহ্নিত	৩৩১	১১১	২০	২০	৯৬
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৮৫	৩০	১২	৪৩	২৮
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
পঞ্চদশ	তারকা চিহ্নিত	৮১৮	৩৪৭	১০৮	৩৬৩০	৩৪৭
	তারকা চিহ্ন বিহীন	২০১	১২৭	৫৫	১৯	১২৭
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১	-	-	১	-
ষষ্ঠদশ	তারকা চিহ্নিত	৩৩২	১২৩	২৮	১৮১	১২৩
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫৬	১১	১০	৩৫	১১
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ	তারকা চিহ্নিত	২৮০	১৩১	১৩	১৩৬	১৩১
	তারকা চিহ্ন বিহীন	১০৫	৭৩	২২	১০	৭৩
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১	-	১	-	-
অষ্টাদশ	তারকা চিহ্নিত	১০০	৪৪	৫	৫১	৪৪
	তারকা চিহ্ন বিহীন	২৩	১১	৫	৭	১১
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	৩	-	-	৩	-
উনিশতম	তারকা চিহ্নিত	১৪৮	৩৭	৪	১০৭	২১
	তারকা চিহ্ন বিহীন	২৭	৭	২	১৮	৪
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
বিশতম	তারকা চিহ্নিত	৩৭৭	২৪৩	৫৫	৭৯	১৮৭
	তারকা চিহ্ন বিহীন	১৫২	১২৭	২০	৫	১০১
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
একুশতম	তারকা চিহ্নিত	১১৫	৭১	৯	৩৫	৭১
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৯৭	৬৩	১৬	১৮	৬৩
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
বাইশতম	তারকা চিহ্নিত	৭০	১৭	-	৫৩	৭
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৫৬	২৫	১	৩০	৮
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	-	-	-	-	-
মোট	তারকা চিহ্নিত	৩৭৯০৭	৯৩৯১	৭৭০৩	২০৫৬৭	৮৬৯২
	তারকা চিহ্ন বিহীন	৯৪৬৩	৩৩৬৩	২৭৯৯	৩৪৪৩	৩১৫৭
	স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১৭৬	১০	১৪১	১৯	৫

সূত্রঃ *পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (১৯৯১- ১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ,* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বেসরকারী দিবস সমূহে বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশের ভিত্তিতে গৃহীত ও ব্যালটে স্থান লাভকৃত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমূহ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। আলোচনা শেষে প্রস্তাব সমূহ নিস্পত্তি করা হয়ে থাকে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ২২টি অধিবেশনে মোট ৫৫,৩২০টি বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ব্যালটে প্রদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক ১৮৫০০টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে থেকে ৩২৪টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ব্যালটটি স্থান লাভ করে। এর মধ্য থেকে ১৯৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সংসদে উত্থাপিত ১৯৩ টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ১২৪টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিস্পত্তি করা হয়। উক্ত ১২৪ টি প্রস্তাবের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ৮০টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নোটিশ দাতাগণ প্রত্যাহার করে নেয়। ৫টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। ২৯টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক ভোটে নাকচ হয়ে যায়, সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকে ৫টি এবং ১৯৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাব গুলো হলোঃ

১। দেশের প্রত্যেকটি হাসপাতালে মহিলাদের মৃত দেহ স্বস্ব ধর্মীয় মর্যাদায় পৃথকভাবে রাখার জন্য মর্গের ব্যবস্থা করা।

২। উপ-কূলীয় এলাকায় জলদস্যু দমনে নৌ-পুলিশ বাহিনী গঠন করা।

৩। লক্ষীপুর জেলা সদর থেকে সড়কটি রামগতি হাট পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।

৪। মৌলভী বাজারের জুড়ী বড় লেখা শাহবাজ পুর সড়কের বড় লেখা শাহবাজপুর অংশ পাকা করা।

৫। ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জ সেতু হইতে শহরের মধ্য দিয়া অতিবাহিত ময়মনসিংহ-ঢাকা হাইওয়ের বর্তমানে যানজট ও দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে একটি বাইপাস রাস্তা নির্মান করা হউক।

উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় ১৯৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ৮০টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নোটিশ দাতাগণ প্রত্যাহার করে নেয় অর্থাৎ প্রত্যাহার কৃত প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়ন হয়েছে কিংবা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরোধী ও বেসরকারী সদস্যদের অধিকাংশের মতামতকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিরোধী দল সংসদের শেষ অধিবেশন সমূহে অংশ গ্রহণ করলে বিরোধী দলের নোটিশ সমূহও আলোচিত হতো। ফলে বিরোধী দল সংসদে না থাকায় এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তবুও ক্ষমতাসীন দল ৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক পাস করে ও ৮০টির আশ্বাস দিয়ে সংসদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।

বিশেষ অধিকার প্রস্তাব ঃ

জাতীয় সংসদে বেসরকারী সদস্যগণ যে সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেন কিংবা সমস্যা সম্পর্কে সংসদকে অবহিত করেন ও প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান তার মধ্যে বিশেষ অধিকার প্রস্তাব একটি অন্যতম। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সদস্যগণ ২২টি অধিবেশনে ৫৯৭ টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করেন। প্রাপ্ত নোটিশগুলোর মধ্যে স্পীকার ২০২টি নোটিশ গ্রহণ করেন। উক্ত ২০২টি নোটিশের মধ্যে আলাপ আলোচনায় মাধ্যমে নিস্পত্তি হয় ৩০টি। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় ১৩৬টি এবং ৩৬টি সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

মূলতবী প্রস্তাবঃ

জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের আনীত মূলতবী প্রস্তাবের উপর ও আ্যলাচনা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাংসদ গণ কর্তৃক ১৮০৩টি মূলতবী প্রস্তাবের নোটিশ জমা দেয়া হয়। তন্মধ্যে ৬৮টি নোটিশ স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। বাকী নোটিশ সমূহ বিধি সম্মত না হওয়ায় নাকচ হয়ে যায়। গৃহীত ৬৮টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৮টি নোটিশের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাকী নোটিশ সমূহ তামাদি হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীঃ ৬.১৮

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বেসরকারী সদস্যদের কয়েকটি প্রস্তাবের নোটিশ ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ

প্রস্তাব/নোটিশ	মোট প্রাপ্ত নোটিশ	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত	ব্যালটে স্থানলাভ	সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত	সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তি	নোটিশ প্রত্যাহার	কমিটিতে প্রেরণ	বাতিল	সিদ্ধান্ত স্থগিত	সিদ্ধান্ত গৃহীত	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণের বিবৃতি
বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	৫৫৩২০টি	১৮৫০০টি	৩২৪টি	১৯৩টি	১২৪টি	৮০	৫টি	২৯টি	৫টি	৫টি	-
বিশেষ অধিকার প্রস্তাব	৫৯৭টি	২০২	-	-	আলাপ আলোচনায় নিষ্পত্তি ৩০টি	-	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ ১৩৬টি	-	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ ২৬টি	-	-
মুলতবী প্রস্তাব	১৮০৩টি	৬৮টি	-	১৮টি	-	-	-	-	-	-	-
জরুরী জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন (বিধি-৭১)	৫৮৭৭	৫৮১	-	-	-	১টি	স্বাস্থ-১ অর্থ-১	তামাদি ২৩৯	-	-	৩৩৯

সূত্রঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (১৯৯১- ১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

Dhaka University Institutional Repository

জরুরী জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন (বিধি-৭১)ঃ

বাংলাদেশের সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি -৭১ এ সংসদ সদস্যগণ জরুরী জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন নোটিশ প্রদান করে থাকেন। উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন কিংবা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংসদকে অবহিত করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকালে সাংসদগণ ৫৮৭৭টি জরুরী জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন নোটিশ প্রদান করেন। প্রাপ্ত নোটিশ সমূহ থেকে স্পীকার ৫৮১ টি নোটিশ গ্রহণ করেন। গৃহীত নোটিশের অধিকাংশ ৩৩৯টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান করেন এ ছাড়াও ১টি নোটিশ, নোটিশ দাতা প্রত্যাহার করেন, ১টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় সম্পার্কিত স্থায়ী কমিটিতে, ১টি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করেন। সময়ের অভাবে ২৩৯টি নোটিশ সংসদে উত্থাপিত না হওয়ায় তামাদি হয়ে যায় (সারণী ৬.১৮ দ্রষ্টব্য)।

জাতীয় সংসদে উল্লেখিত বিধি সমূহে আলোচনা ছাড়াও জরুরী জন গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সদস্যগণ কর্তৃক বিবৃতি (বিধি-৭১) প্রদান, বিধি-৬৮ তে জরুরী জন-গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা; বিধি ৬০ এ অর্ধ ঘন্টা আলোচনা, প্রস্তাব (সাধারণ) (বিধি- ১৪৭) এ জন স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনাসহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন বিধিতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত শতাধিক ইস্যুতে দু'শ ঘন্টার এ বেশী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[৭২] কোন কোন বিষয়ে সংসদে আলোচনার পর প্রস্তাব পাস আবার কখনও কমিটি গঠন করা হয়। গোলাম আজম প্রসঙ্গে আলোচনার পর সংসদে প্রস্তাব পাস করা হয়েছে (যা ইতোপূর্বে আলোচিত)। শিক্ষাঙ্গানে সন্ত্রাস পরিস্থিতি আলোচনার পর ১২ আগষ্ট (১৯৯১) ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নিরোধ সম্পর্কিত সংসদীয় বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ভারতের পুশ ব্যাক সম্পর্কে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারী দল প্রস্তাব পাস করে। হেবরন শহরে ইব্রাহীম (আঃ) মসজিদে হত্যাকান্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করে সরকারী দল এককভাবে প্রস্তাব পাশ করে।[৭৪] সংসদে আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হল।[৭৫]

- সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ বন্ধ;
- উত্তরাঞ্চলে খরাও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি;
- দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি;
- কৃষি উপকরণ, কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য ও কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে;
- দারিদ্র বিমোচন প্রসঙ্গে;
- জুট সেক্টর রিস্ট্রাকচারিং প্রোগ্রাম থেকে সৃষ্ঠ্য পরিস্থিতি;
- সড়ক দূর্ঘটনা;
- শ্রমিক অসন্তোষ এবং ;
- নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ।

উক্ত বিষয় সমূহ সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। যা প্রকারান্তরে রাজনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করেছে।

কমিটি ব্যবস্থাঃ

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য্য উপাদান। এর মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা অনেকাংশে নিশ্চিত করা যায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় রীতি অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়ে ছিল। এছাড়াও অন্যান্য কমিটি বিশেষ কমিটি ও সাব কমিটি সহ একশতের ও বেশী কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[৭৬] মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রসংগে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭(২) বিধিতে বলা হয়েছে কোনো স্থায়ী কমিটির আওতাধীন কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অথবা মন্ত্রী না থাকলে প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি হবেন"। বর্তমানে ৭ম জাতীয় সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে মন্ত্রীদের অন্তর্ভূক্ত না করে সংসদ সদস্যদের সভাপতির দায়িত্ব দেখা হয়েছে। এর ফলে জবাবদিহিতা আরও বেশী নিশ্চিত হবে। কমিটির কাজ সম্পর্কে ২৪৮ বিধিতে বলা হয়েছে। অনুরূপ প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্তত পক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হইবে এবং স্থায়ী কমিটির কাজ হইবে সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।"[৭৭] পঞ্চম জাতীয় সংসদের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রায় ১৫ শতাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংসদীয় সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে। ২৬ জুন (১৯৯৩) জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সাংসদ জনাব তোফায়েল আহম্মদ কৃষি মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) এম মাজেদ-উল- হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সংসদ ১৩ জুলাই (১৯৯৩) স্পীকারের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দূর্নীতি বিষয়ক বিশেষ কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কমিটির টার্মস অফ রেফারেন্স নির্ধারিত না হওয়ায় এবং পরবর্তীতে বিরোধী দলের সংসদ বয়কট ও পদত্যাগের কারণে উক্ত কমিটি কোন রিপোর্ট দিতে পারে নাই। কমিটিতে স্পীকার ব্যতীত সরকারী ও বিরোধী দলের সম সংখ্যক সদস্য ছিলেন। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সাব কমিটি সমূহ যে সমস্ত রিপোর্ট সংসদে পেশ করেন তার ভিত্তিতে সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বিরোধী দলের সহযোগিতা পেলে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারতো। তবুও উল্লেখিত কমিটি সমূহ তাদের কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ পেতে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করেছে।

অতএব পরিশেষে বলা যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক দু'টি সংবিধান সংশোধন বিল এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের পথ সুগম করেছে। এ ছাড়াও পঞ্চম জাতীয় সংসদে ১৭৩ টি বিল পাস ও বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পথকে মসৃন করেছে। সর্বোপরি সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে খালেদা জিয়ার সরকার গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যার পথ ধরে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আর একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার যাত্রা শুরু করতে পেরেছে।

গ) নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। বিনএনপির এই জয়লাভের পশ্চাতে যে সমস্ত কারণ নিহিত রয়েছে তা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল বা দল সমূহকে নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কাছে কিছু কর্মসূচি পেশ করতে হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করলে ঐ সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশিষ্ট দল বা দল সমূহের উপর বর্তায়। নির্বাচনের পূর্বে জনগণের উদ্দেশ্যে পেশকৃত এই সকল কর্মসূচিকে নির্বাচনী ইশতেহার বা নির্বাচনী ঘোষণা বা মেনিফেষ্টো বলে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তা বাদী দল (বিএনপি) ২৮ জানুয়ারী (১৯৯১) তাদের নির্বাচনী

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা বা ইশতেহার পেশ করেন। যার ভিত্তিতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জয়লাভ করে। কাজেই খালেদা জিয়ার সরকারকে মূল্যায়ন করতে হলে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার এবং এই নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা দরকার। আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারের মূল অংশ পরিশিষ্ট ৬ এদেখান হল। খালেদা জিয়ার সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড অধিকাংশ, ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি সরকারের সার্বিক উন্নয়নের দিক নির্দেশ করে। খালেদা জিয়ার শাসনামলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনী ঘোষণা কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন হয় নাই তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিএনপির উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং মানবাধিকার বিষয়ে কর্মসূচি প্রদান করা হয়ে ছিল। নির্বাচনী ঘোষণা যে সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হয় নাই তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নঃ

(ক) সাংবিধানিক ও প্রশাসনিকঃ

সাংবিধানিক ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস। যদিও এই দুইটি নির্বাচনী ঘোষণায় ছিল না কিন্তু নির্বাচনী ঘোষনা অনুযায়ী বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করণ ঘোষণাটি বাস্তবায়িত হয়েছে। দুর্নীতি মুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসন গতিশীল প্রসঙ্গে বলা যায় সরকার প্রশাসনকে যতটা সম্ভব সৎ ও দুর্নীতি মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর ৬ এপ্রিল (১৯৯১) উত্তরা গণভবনে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে তিন দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, "তাহার সরকার চোরা চালান বন্ধ, প্রশাসন হইতে দুর্নীতি নির্মূল, আইন শৃংখলা রক্ষা এবং অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে।"[৭৯] প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বরিশাল ও সিলেটে দুইটি নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণা করেছে। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা সহজীকরণের লক্ষ্যে নতুন পেনশন বিধি মালা সহজ করা হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সুসজ্জিত ও শক্তি শালী করার লক্ষ্যে প্রতি বছর প্রতি রক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদিও শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল কিন্তু শিক্ষার পরেই বাজেটে প্রতি রক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ভারতের কাছ থেকে তিন বিঘা করিডোর লাভ। ১৯৯২ সালের ২৬ জুন ভারত বাংলাদেশেকে তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর করেছে। উল্লেখ্য ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ চুক্তি সম্পাদনের পরপরই ভারতকে দঃ বেরুবাড়ী হস্তান্তর করেন ১৮ বছর পূর্বে, কিন্তু ভারত এত দিন পর্যন্ত তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর করে নাই। খালেদা জিয়ার শাসনামলে দীর্ঘদিন পর এ অমিমাংসিত সমস্যার সমাধান হয়।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা হয় ও সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বজায় রাখা হয়। মুসলিম দেশ সমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী জাতি সংঘের শান্তি রক্ষী বাহিনী সহ বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী সংবাদ পত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। সংবাদপত্রের এই পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকায় দেখা যায় অধিকাংশ পত্রিকা সরকার বিরোধী প্রচারনায় অবতীর্ণ হয়। যা পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের পতনকে নিশ্চিত করে। অনগ্রসর জাতি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতীয় সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের মে মাসে যোগাযোগ মন্ত্রী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ওয়ালী আহম্মেদের নেতৃত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয়। সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য একটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়। এই সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক সংগঠন জন সংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের ১২ আগষ্ট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার ও শান্তি বাহিনীর মধ্যে অস্ত্র বিরতি চলে আসছে।[৮০] সংসদীয় যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে সরকার পার্বত্য সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ছিলেন। ১৪ জুলাই ১৯৯৩ সরকারও জন সংহতি সমিতির তৃতীয় বৈঠকে শান্তি বাহিনী সদস্যদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তার মধ্য রয়েছে সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা বাতিল, দেশের প্রত্যাবাসনকারী প্রতি পরিবারকে পূর্ব ঘোষিত ৫হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা নগদ, ৬ মাসের রেশন ও দু'বান্ডিল ঢেউটিন প্রদান, সরকারী ৫ হাজার টাকা কৃষি ঋণ মওকুফ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে সরকার অঙ্গীকার করেন।[৮১] এ ছাড়াও সরকার আত্মসমর্পনকৃত জন সংহতি সমিতির সদস্যদের পূর্ণবাসনে পার্বত্য এলাকার জন্য পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সরকার জনসংহতি সমিতির দাবি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।[৮২] সরকার সাংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই পার্বত্য সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিলেন। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে আইনগত বিধি নিষেধ আরোপ এবং তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে একটি একক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিট গঠনের জন্য জন সংহতি সমিতির দাবিকে সংবিধানের পরিপন্থী ও বাস্তব সম্মত নয় বলে নাকচ করেছে।[৮৩] এছাড়াও সরকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী পার্বত্য অঞ্চলের সেনা নিবাস সমূহ এবং পুর্নবাসিত অপাহাড়ীদের প্রত্যাহার প্রসঙ্গ ও মেনে নিতে অস্বীকার করে। জন সংহতি সমিতির এই সমস্ত অসাংবিধানিক দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলেও সমস্যা সমাধানের জন্য জন সংহতি সমিতির সাথে সরকারের আলোচনা বৈঠক অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার জনসংহতি সমিতির দাবি সমূহ মেনে নিয়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে ছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলে পার্বত্য সমস্যার সমাধান না হলেও সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ছিল। তা ছাড়া খালেদা জিয়ার সরকার জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে ছিল।

বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তি যুদ্ধ কালীন জেড ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার। সেই দলের নির্বাচনী ঘোষণায় মুক্তি যোদ্ধা ও মুক্তি যুদ্ধে শহীদ পরিবারের বিশেষ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির কথা। বীর মুক্তি যোদ্ধাদের গ্যালান্ট্রি এ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৪] এছাড়াও খালেদা জিয়ার সরকার সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ৩০% যে কোটা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল তা অব্যাহত রাখে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাষ্টের মাধ্যমে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের বিশেষ সাহায্য অব্যাহত রাখেন।

'৯১ এর নির্বাচনী ঘোষণায় শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। প্রকৃত পক্ষে খালেদা জিয়ার সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকারের পদক্ষেপ সমূহ ইতোপূর্বে অর্থনৈতিক উপাধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এর পর ও বলা যায় নির্বাচনী ঘোষণায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছাড়াও প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা নামে মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করেন। বয়স্ক শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে একটি নতুন অধিদপ্তর সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেয়া যায়, ১৯৯১ সালে যেখানে বয়স্ক শিক্ষার হার ছিল ৩৫.৩%, ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭.৩% এ উন্নীত হয়। জাতীয় শিক্ষার হার ১৯৯১ সালে ছিল

৪৪.৩% ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫.৬% এ উন্নীত হয়।[৮৫] শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয় মাধ্যমিক শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে।

নির্বাচনী ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সেশন জট নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়। এ লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ থেকে কলেজ সমূহ প্রত্যাহার করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে নতুন একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করে দেশের সরকারী ও বেসরকারী কলেজ সমূহের স্নাতক ও তদুর্ধ শ্রেণীর পরীক্ষার দায়িত্ব অর্পন করে। শুরুতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েব মাধ্যমে কলেজ সমূহের সেশন জট নিরসন করতে সম্ভব হলেও অব্যবস্থাপনার কারণে বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও সেশন জটের কবলে পড়েছে। এ ছাড়াও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট মুক্ত রাখতে পেরেছিল। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সেশন জট অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

নির্বাচনী ঘোষণা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের চার মূলনীতি অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে এবং এই মূলনীতি সমূহ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়।

নির্বাচনী ঘোষণার (ক) ১৩ নং দফায় দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬ থেকে দেখা যায় বস্ত্র শিল্পখাতে ১৯৯০/৯১ সালে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল মাত্র ৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ১৯৯৩/৯৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ১৯৯৪/৯৫ সালে ১৬৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৯৯৫ /৯৬ সালের প্রথম ৬ মাসে বিনিয়োগের পরিমান ছিল ৮৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৮৬] বস্ত্রখাতে এই বিপুল পরিমান বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশের বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

খালেদা জিয়ার সরকারের নির্বাচনী ঘোষণা অনুযায়ী মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মজুরী কমিশন গঠন করে শ্রমিকদের জন্য মজুরী ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৮৭]

সর্বোপরি খালেদা জিয়া সরকারের সংবিধানিক ও প্রশাসনিক ঘোষণার সর্বশেষ দফা ছিল ধর্ম বর্ন গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করণ। বস্তুতঃ উল্লেখিত সময়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ মান ছিল। সকল ধর্মের ও গোত্রের নাগরিকগণের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত ছিল। জাতীয় ঐক্য কখনও বিনষ্ট হয় নাই। রাজনৈতিক মত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে সবাই এক বাংলাদেশী।

খ) অর্থনৈতিকঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ২০টি দফা পেশ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকারের সাফল্য ও গৃহীত ব্যবস্থাদি ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে দেখা গেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকারের সাফল্য ঈর্ষান্বিত পর্যায়ে ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নির্বাচনী ওয়াদা অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে কিংবা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচনী ঘোষণায় অর্থনৈতিক অংশে ১নং দফায় অন্ন বস্ত্র শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পুরনের কথা বলা হয়েছে। দারিদ্রবিমোচনের মাধ্যমে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বস্ত্র খাতে গৃহীত পদক্ষেপ এই উপাধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার অবদান ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। চিকিৎসা সম্পর্কে কিছু আলোচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিএনপি'র ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত নির্বাচনী ঘোষনায় (১৯৯১-৯৫) সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রকাশ করেছে, উক্ত ঘোষণা থেকে দেখা যায় খালেদা জিয়ার সরকার চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশের বৃহৎ জেলায় ১০০ শয্যার হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায়, ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোর শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত এবং অসংখ্য

হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হয়, এক বছরের কম বয়সী ৮৫ ভাগ শিশুকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। ৯০ ভাগ জনগণকে বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।[৮৮] বাসস্থানের ক্ষেত্রে দারিদ্রবিমোচনের মাধ্যমে সরকার গৃহীত ব্যবস্থাদিও বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে এবং গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ দান কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও সরকার সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৩ হাজার বাসস্থান নির্মান করেন।[৮৯]

উক্ত নির্বাচনী ঘোষণায় মুক্ত ও প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনীতি ও শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিল্পায়ন ও শিল্প ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য খালেদা জিয়ার সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে।

নারী ও শিশুদের কল্যানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

খালেদা জিয়ার সরকার সর্বাগ্রে অর্থাৎ সরকার গঠনের সাথে সাথে মন্ত্রী সভার বিশেষ বৈঠকে কৃষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ ও সুদ মওকুফ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়ন করেন। এ ক্ষেত্রে তার সরকার কাল বিলম্ব করেন নাই। এসম্পর্কেও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়েছে যা ইতোপূর্বে আলোচিত।

নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত এবং নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল নতুন শিল্পকে প্রথম ৫ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে মুঞ্জুর করা হয়েছে।[৯০]

অর্থনীতির ১০নং দফায় চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার দ্রুত সম্পন্ন যোগ্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়। তাই দেখা যায় খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯৩ সালের ৬ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬২ হাজার কোটি টাকার সংশোধিত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) অনুমোদন করেন। এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের ক্ষেত্রেও সরকার সাফল্য অর্জন করে। The fifth five year plan 1997-2002 থেকে দেখা যায় ১৯৯১ সালে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৯৮%, ১৯৯৬ সালে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছাড়ায় ১.৮০%।[৯১]

খালেদা জিয়ার সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ লাভ জনক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৯১ সালের ২৩৫২ মেঘাওয়াট থেকে ১৯৯৫ সালে ২৯০৮ মেঘাওয়াটে উন্নীত। সিষ্টেম লসও এ সময়ে অনেক কমানো সম্ভব হয়েছিল। ১৯৯০/৯১ সালের গড় সিষ্টেম লস ছিল ৪১% যা ১৯৯৪/৯৫ এ ৩৪% এ হ্রাস পায়।[৯২]

টেলিযোগাযোগ সেক্টরকে আংশিক বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের ফলে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে এই সেক্টরকে লাভ জনক সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। রেলওয়ে থেকেও লোকসান কমিয়ে লাভ জনক সংস্থায় পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে ছিল। এ সম্পর্কে ও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

নির্বাচনী ঘোষণা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি রোধে দ্রব্য মূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বাস্তব মুখী পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি খুবই কম ছিল। এমনকি সার্কদেশ সমূহের মধ্যে সর্ব নিম্নে ছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে শৃংখলা

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঋণ খেলাপীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য আর্থিক প্রতিশ্রুতি সমূহও বাস্তবায়িত হয় যেমন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। যার ফলে দেশে সফটওয়ার এবং ইন্টারনেট সহ আধুনিক বিশ্বের উন্নত তথ্য প্রবাহের সাথে সঙ্গতি সাধন কল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর জোর দেয়া হয়। শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ১৯৯১/৯২ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৮/৯৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৬১৬,৭২১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্য মাত্রা ছিল। এর মধ্যে ৫৮৫৩৫৯ জনকে (৯৫%) প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছে।[৯৩] নারী সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ভাবে অর্থনৈতিক উপাধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন। জাতীয় স্বার্থের পরীপন্থী ঋণ গ্রহণে অস্বীকৃতির মাধ্যমে নির্বাচনী ঘোষণা অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখযেগ্য বৈদেশিক সাফল্য আসেনি বলে দেশীয় সম্পদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এবং জাতীয় উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে তাদের সম্পৃক্ত করা হয়।অর্থনৈতিক ঘোষণার সর্বশেষ দফায় উল্লেখিত দফা সমূহের সফল বাস্তবায়নের কথা ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস এবং বিদেশ হতে প্রাপ্ত সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়। খালেদা জিয়া সরকার বৈদেশিক সাহায্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পেরেছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত অর্থনৈতিক উপাধ্যায়ে বৈদেশিক সাহায্য ও অবমুক্তি থেকে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে খালেদা জিয়ার সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারের অধিকাংশই বাস্তবায়ন করেছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির বেশীও করেছে।

(গ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিকঃ

সামাজিক ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা সহ দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা অব্যাহত রাখা হয়। দেশীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী কর্মকান্ড প্রতিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের কারণে সর্ব ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে ও সকল ধর্ম ও মতাবলম্বীদের তাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। সংখ্যা লঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

(ঘ) মানবাধিকারঃ

বি এন পি তার নির্বাচনী ঘোষণায় জাতি সংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে। এর ফলে মানবাধিকার রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠনের মাধ্যমে মানবাধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এ ছাড়া বিএনপি তার নির্বাচনী ঘোষণা অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায় ক্রমিক বাস্তবায়নের যে অঙ্গীকার করে তার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবেই মহিলা ও শিশু কল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারী ও শিশুদের কল্যানে ব্যাপক কর্মসূচী পালন করে। এ সম্পর্কে ও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে ব্যর্থতাঃ

খালেদা জিয়ার সরকার ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে যে নির্বাচনী ঘোষণা পেশ করে ছিল তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হলে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ঘটে নাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচনী ওয়াদা পুরণে ব্যর্থ হয়েছেন তা নিম্মে আলোচনা করা হলঃ

(ক) সাংবিধানিক ও প্রশাসনিকঃ

সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিএনপি ঘোষিত কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারে নাই। সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ১নং দফায় দুর্নীতিমুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও সরকার প্রশাসনকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে নাই। কৃষি মন্ত্রী জনাব মজিদ উল- হকের বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে বিরোধী সাংসদ কর্তৃক দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে ছিল। কিন্তু অভিযোগ নিস্পত্তির অভাবে প্রমাণিত হয় নাই। প্রশাসনের উচ্চ পদে পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রী জবাব নূরুল হুদা ১২ জুন (১৯৯৩) পদত্যাগ করেন।

১৯৯৪ সালে সার বিতরণ ও বিপননের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম, দেখা দেয়। যা খালেদা জিয়ার শাসনকালে সার কেলেঙ্কারী নামে খ্যাত। সার কেলেঙ্কারীর সঙ্গে দুইজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর নাম উচ্চারিত হলেও ৪ এপ্রিল (১৯৯৫) শিল্প মন্ত্রী এম জহির উদ্দিন সার সংকটের দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৫ সালের ৮এপ্রিল আজকের কাগজের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় "প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে একটি সংস্থা সার সংকট নিয়ে তদন্ত করে। তদন্তে বিএনপি'র কিছু মন্ত্রী ও নেতার অযাচিত কার্যকলাপ এবং কিছু পদ্ধতিগত ক্রটিকে সার সংকটের জন্যে দায়ী করেছে"।[১৪] শৃংখলা ভঙ্গকারী ও দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। রাজনীতিবিদদের কতিপয় দুর্নীতি প্রকাশিত হলেও সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশ দুর্নীতিই প্রকাশিত হয় না এবং এর জন্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় না। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর বার্ষিক সম্মেলন'৯৪ উপলক্ষে আয়োজিত সৎ প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন শীর্ষক সেমিনার উপস্থাপিত প্রবন্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক মন্তব্য করেন যে, "দুর্নীতি পরায়ন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কালো টাকা আগাভাগি করে খেয়েছেন মূলত দুর্নীতি বাজ কিছু সরকারী কর্মচারি ও স্বার্থান্বেসী কিছু ব্যবসায়ী। আমলাদের সাহায্য ছাড়া স্বার্থান্বেষী মহল দেশের সম্পদ লুট করতে পারেনা"[১৫]

সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ঘোষণার ২নং দফায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার কথা ও সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়ে ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়ার সরকার নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সাংসদ সালাহ উদ্দীন ইউসূফ ২৫ জুলাই (১৯৯৫) শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকী করণ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলা উত্থাপন করে ছিলেন।[১৬] সরকারী দলের পক্ষথেকে বিলটি পাস করার উদ্যোগ নেয়া কিংবা অনুরূপ বিল উত্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনে নাই। পরবর্তীতে বিরোধী দলের আসন শুন্য ঘোষিত হলে বিলটি তামাদি হয়ে যায়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কথা বলেছে কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পর বিগত চার বছরেও জনগণের কাছ দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। উপরন্ত বিচার বিভাগ সম্পর্কে আপত্তি কর বক্তব্য প্রদানের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের করা করা হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে সকল প্রকার কালাকানুন বাতিল করার প্রতিশ্রুতি ও বিএনপি সরকার পালন করেন নাই। বাংলাদেশের ইতিহাসে '৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনকে একটি কালো আইন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। "১৯৭৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী আইনটি প্রণয়নের পর থেকে ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৪ বছরে ৬৯ হাজার ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯১ থেকে ৯৫ পর্যন্ত ৫ বছরে ১৭ হাজার ৭২৬ জনকে এ আইনে আটক করা হয়। বর্তমান আওয়ামীলীগ ক্ষমতা গ্রহনের পর ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত আড়াই বছরে ১১ হাজার ৭২৬ জনকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করা হয়।"[৯৭] খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে এই আইন বহাল থাকার নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়িত হয় নাই। যার ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়েছে।

সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ঘোষণার ৬নং দফায় গ্রাম সরকার গঠন করার কথা বলা হয়ে ছিল কিন্তু খালেদা জিয়ার শাসনামলে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত গ্রাম সরকার কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করেন নাই। যদিও এটি একটি নির্বাচনী ওয়াদা ছিল।

সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ঘোষণার ৭নং দফায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ এবং গণ প্রচার মাধ্যম সমূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও গণপ্রচার মাধ্যমের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অতীতের এবং বর্তমান কোন সরকারই রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো না। বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদানের ব্যাপারে জনগণের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল কিন্তু ক্ষমতায় আসার ৪ বছরের মধ্যেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে নাই।

তাই দেখা যায় আওয়ামী লীগ সরকারের ন্যায় খালেদা জিয়ার সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গণ প্রচার মাধ্যমের বিশেষ করে রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা নাই।

(খ) অর্থনৈতিক ঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ২০টি দফা ঘোষণা করেছে তা ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যায় তার অধিকাংশই কোননা কোন ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। যে গুলি বাস্তবায়িত হয় নাই সে সমস্ত ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাই দেখা যায় খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক সাফল্য সর্বাধিক।

গ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিকঃ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়ে ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন সরকারের আমলেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সর্বদাই বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। খালেদা জিয়ার শাসনামলেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ঘোষণার উপরোল্লেখিত কয়েকটি দফার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি বাস্তবারিত না হলেও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থনৈতিক ঘোষণার অধিকাংশই, বলতে গেলে প্রত্যেকটি ঘোষনাই কোন না কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। কাজেই একথা বলা যায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য সর্বাধিক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ও পুরোপুরি নির্বাচনী ঘোষণা বাস্তবায়িত না হলেও বাস্তাবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) বিএনপি'র পতনের কারণ ঃ

বেগম খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সংসদ কর্তৃক সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের পর বিরোধী দল কর্তৃক ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে ৩০ মার্চ (১৯৯৬) বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। এরপর সংবিধান অনুযায়ী গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১২ জুন (১৯৯৬) অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৪৬ টি আসন লাভ করে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১১৬টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জাসদ (রব) এর সহায়তায় শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীতে সরকার গঠন করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবুও ৫ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজয় বরণ করে। বিএনপি'র এই পরাজয়ের পশ্চাতে কি কি কারণ রয়েছে তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আমরা ইতোপূর্বে খালেদা জিয়ার সরকারেরর গৃহীত ব্যবস্থাদি ও নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে দেখেছি বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে অধিকাংশ নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছে। এর পরও বিএনপির পরাজয়ের পশ্চাতে যে সমস্ত কারণ নিহিত রয়েছে তা আলোচনা করা হল।

৩১ অক্টোবর (১৯৯৫) আজকের কাগজে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্য ৩০০টি নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে একটি সংস্থার রিপোর্ট তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বিএনপি'র শেষ এক বছরে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাসের ৫টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ গুলো হলোঃ [৯৮]

১. সারা দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ;
২. ছাত্র দল, যুবদল, এবং বিএনপি কর্মীদের দৌরাত্ব, ক্ষমতার দাপট ;
৩. দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি ;
৪. মাঠ পর্যায়ে ক্ষমতাসীন লোকদের দুর্নীতি ;
৫. প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা।

এছাড়াও উক্ত প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক সময়ের তিনটি ঘটনাকে চিহ্নিত করেছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে,

১. সার কেলেংকারী
২. দিনজাপুর ইয়াসমীন হত্যাকান্ড
৩. বিরোধী দলের পদত্যাগ পত্র গ্রহণে স্পীকারের অস্বীকৃতি।

উল্লেখিত একটি মাত্র রিপোর্ট বিএনপি'র পরাজয়ের কারণ নির্দেশ করেনা। এর পশ্চাতে নানাবিধ কারণ নিহিত ছিলো। নিম্নে অন্যান্য কারণগুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যথাসময়ে না মানা ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামালে এক উল্লেখযোগ্য সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধীদল ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে। বিরোধী দলের দাবী সংবিধান সম্মত না হওয়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উক্ত দাবিটি মেনে নেয়নি। কিন্তু বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলে এবং আন্দোলনের চুড়ান্ত পরিনতিতে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে। বিরোধী দলের দাবী অনুযায়ী বিরোধী দলের পদত্যাগের পূর্বে কিংবা পরে অন্তত পক্ষে রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে নির্বাচন পরিচালনায় রাজি হতো, তা হলে বিএনপি তাঁর বাকী সময়ে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে উন্নয়নমূলক

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারতো। ফলে জনমত বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না। এই গবেষণার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা(৪২%) বিএনপি'র পরাজয়ের কারণ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যথা সময়ে মেনে নিলে ক্ষমতা হারানোর কোন সম্ভাবনা থাকতো না।

২. উপনির্বাচনে কারচুপি'র অপবাদে ঃ বিএনপি সরকারের অধীনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণে মাগুরা-২ নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পর্যন্ত ১৬টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি নির্বাচন সম্পর্কে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। যদিও ঢাকা-১১, মিরপুর আসনের উপনির্বাচনে বিরোধী দল কর্তৃক কারচুপি'র অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে ছিল কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যথাযথ পদক্ষেপে ফলাফল বাতিল ঘোষণা করে ভোট পুনঃগণনার মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা ও বিরোধী দলের অভিযোগ সমূহ নিস্পত্তি করে নির্বাচনে স্বচ্ছতা প্রমান করতে পেরেছিল। কিন্তু মাগুরা উপনির্বাচন সম্পর্কে বিরোধী দল কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন উক্ত নির্বাচনের ফলাফল বাতিল কিংবা পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। অথচ মাগুরা নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তুলে। যার ফলে সরকারকে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। তাই বলা যায় মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপি'র অপবাদ বিএনপি সরকারের পতনের আর একটি কারণ ছিল।

৩. দুর্নীতি ঃ বিএনপি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী ইশতেহার এবং সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার অঙ্গিকার করলেও খালেদা জিয়ার প্রশাসন ও মন্ত্রী পরিষদের কতিপয় সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয় আওয়ামী লীগ সাংসদ তোফায়েল আহম্মদ ২৬ জুন (১৯৯৩) কৃষি মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদ-উ-হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং এ সম্পর্কে একটি সংসদীয় বিশেষ কমিটি ও গঠন করা হয়েছিল (যা ইতোপূর্বে আলোচিত)। এছাড়াও জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী খোন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিমান প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী সহ কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়। যার ফলে বলা যায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির কারণে বিএনপি'র পতন হয়েছিলো।

৪. সার কেলেঙ্কারী ঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯৫ সালে দেশব্যাপী সার বিতরণ ও বিপননকে কেন্দ্র করে সার সংকট দেখা দেয়। যা বিএনপি'র শাসনামলে 'সার কেলেঙ্কারী' নামে খ্যাত। ঐ সার সংকট সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতে, "মূলত সুষ্ঠু বিতরণ ও বিপনন ব্যবস্থার অভাবেই এ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। চোরাচালানকেও তারা সার সংকটের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৯] মার্চ এপ্রিল (১৯৯৫) কৃষি মৌসুমে কৃষকরা প্রয়োজন অনুযায়ী সার না পাওয়ায় ও সারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ঐ সময়ে পুলিশের সাথে কৃষকদের প্রতিদিন বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। কৃষক কর্তৃক সার লুটের ঘটনা ও ঘটে। পুলিশের গুলিতে অনেক কৃষক নিহত হয়। সরকারকে উত্তর বঙ্গের জেলা সমূহের সার পরিবহন ও বন্টনে সেনা বাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। ১৯ মার্চ (১৯৯৫) প্রধানমন্ত্রীর সভানেত্রীত্বে সংশ্লিষ্ট চারটি মন্ত্রণালয়ের যৌথ বৈঠকে সার সংকটের কারণ অনুসন্ধান করে বলা হয়েছে "নীতি পরিবর্তন করে সার সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুখ রাখার বদলে ডিলারদের মাধ্যমে সার বিতরণের সিদ্ধান্ত ছিলো ভ্রান্ত নীতি এর ফলে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ইতোপূর্বে সার কারখানা গুলোতে সার সকলের জন্য উন্মুখ ছিলো, আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে এই সার সরবরাহ করা হতো। কিন্তু আকস্মিকভাবে চলতি মৌসুমে এলাকা ভিত্তিক সার ডিলার পদ্ধতি প্রচলনের ফলে খোলা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়।"[১০০] এই সার কেলেঙ্কারী নিয়ে দু'টি মন্ত্রণালয়কে সরাসরি দায়ি করা হলেও, ৪ এপ্রিল (১৯৯৫) শিল্প মন্ত্রী জহির উদ্দিন খান সার সংকটের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। শিল্পমন্ত্রীর পদত্যাগের পর আজকের কাগজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, " দেশে সার নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে, এটাই বাস্তবতা। কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হয়। আমি দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করছি।"[১০১] সার সংকটের দায়িত্ব নিয়ে একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করায় সরকারের ওপরও এর দায়িত্ব বর্তায়। যার ফলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি'র পরাজয়ে সার সংকট একটি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

৫. স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করণে ব্যর্থতা ঃ

বিএনপি' সরকারের একটি সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি স্তর থানা/উপজেলা এবং জেলা পরিষদ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারা। এই দু'টি স্তরে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়াই সরকার তাঁর মেয়াদ সমাপ্ত করে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী স্থানীয় সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে স্পর্শকাতর, গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট থানা কিংবা উপজেলা (যে নামেই বলিনা কেন)। ১৯৯১ সালের ২৩ নভেম্বর বিএনপি সরকার এরশাদ আমলে নির্বাচিত ও গঠিত উপজেলা পরিষদ (নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের সহ) এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। উপজেলা নাম বিলুপ্ত করে থানা পুনঃ নাম করণ করা হয়। পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার ৫ বছরে স্থানীয় সংস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট থানা কিংবা উপজলো কোন নামেই কোন 'পরিষদ' গঠন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে নাই। অথচ, স্থানীয় সংস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগন থাকলে একদিকে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারতো, অন্য দিকে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণকে ধারণা দিতে পারতো। এর ফলে রাজনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেত, উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতো, সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জল হতো। একইভাবে সরকার জেলা পরিষদ নিয়েও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে নাই।

"স্থানীয় সরকার পুনঃগঠনের জন্য সাবেক তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমূল হুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ঐ কমিশন প্রত্যক্ষ ভোটে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রস্তাব করলেও তা গৃহীত হয়নি।"[১০২] ফলে জেলা পরিষদেও নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা অর্পন করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরকে শক্তিশালী করতে না পারা সরকারের পতনের একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৬. সংবাদ পত্রের বিরোধিতা ঃ খালেদা জিয়ার শাসনামলে দেশের অধিকাংশ পত্র পত্রিকা সরকার বিরোধী প্রচারে অবতীর্ণ হয়। দেশের প্রথম সারির পত্রিকাসমূহ সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড জনগণের সম্মুখে তুরে ধরার পরিবর্তে সরকারের ভূল ক্রটি সমূহ তুলে ধরে, সরকারের সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। ফলে পাঠকদের কাছে সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়। বিএনপি সম্পর্কে সংবাদ পত্রের এই নেতিবাচক ভূমিকা ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে সরকারের পতন অবধারিত হয়।

৭. বিএনপি'র সাংগঠনিক দুর্বলতা ঃ বিএনপি'র সাংগঠনিক দুর্বলতা ও খালেদা জিয়া সরকারের পতনের জন্য দায়ি করা যায়। সরকার গঠনের পর বিএনপি'র মন্ত্রীগন দলের নেতা কর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা সাংগঠনিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের চেয়ে মন্ত্রীত্ব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বেশী। ফলে দলীয় কর্মকান্ড স্থিমিত হয়ে পড়ে। এর প্রমান পাওয়া যায়, যে সমস্ত মন্ত্রী দলীয় নেতা কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন। খালেদা জিয়ার ৫ বছরের শাসনে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ সহ মোট ৫৩ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করেছে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উক্ত ৫৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১০ জন প্রভাবশালী মন্ত্রী সহ প্রায় ২০ জন মন্ত্রী পরাজয় বরণ করেন। যদি উক্ত ২০ জন মন্ত্রীর মধ্য থেকে অন্তত ১০ জন মন্ত্রী জয়লাভে সমর্থ হতো তাহলে বিএনপি পুনরায় সরকার গঠন করতে পারতো। বিএনপি'র পক্ষ থেকে, "নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য তারা দলীয়, মহাসচিব সহ কতিপয়

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক মন্ত্রীর কর্মকান্ড সর্বোপরি সাংগঠনিক দুর্বলতাকে দায়ী করেন।"[১০৩] কাজেই একথা বলা যায় এই সাংগঠনিক দুর্বলতাও বিএনপি'র পরাজয়ে অনেকাংশে দায়ী ছিল।

৮. নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ঃ

বিএনপি'র শাসনামলে অধিকাংশ নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়িত হলেও কিছু কিছু নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়িত হয় নাই। যেমন সর্ব প্রকার কালা কানুন বাতিলের কথা নির্বাচনী ওয়াদায় ছিল, কিন্তু ৫ বছরের শাসনামলে '৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইন যা একটি কালো আইন হিসাবে চিহ্নিত উক্ত আইনটি বাতিল করে নাই। গণপ্রচার মাধ্যমের স্বায়ত্ত্বশাসনের কথা নির্বাচনী ওয়াদায় ছিল কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে গণপ্রচার মাধ্যম রেডিও এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্ত্ব শাসন প্রদানের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। তা ছাড়া প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দুর্ণীতি মুক্ত করা, সন্ত্রাস মুক্ত রাখার কথা নির্বাচনী ঘোষণায় ছিল।কিন্তু প্রশাসনকে দুর্ণীত মুক্ত রাখা ও সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই। যদিও দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বাংলাদেশের ক্যান্সারে পরিনত হয়েছে এবং কোন সরকারই এই দুইটি রোধ করতে পারে নাই। তাই একথা বলা যায় নির্বাচনী ওয়াদা পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বিএনপি'র পরাজয়ের একটি কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

৯. পার্বত্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওয়ালী আহম্মদের নেতৃত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় যোগাযোগ কমিটি ও সাংসদ রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে একটি যোগাযোগ উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বেশ অগ্রগতি অর্জন করা সত্ত্বেও স্থায়ী সমাধান করতে পারে নাই। এই সমস্যাটি যদিও খালেদা জিয়া সরকারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি সমস্যা। তবুও নির্বাচনী ঘোষণায় পার্বত্য সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পার্বত্য সমস্যা সমাধানের জন সংহতি সমতির দাবি সমূহ সংবিধান সম্মত না হওয়ায়-প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় স্বার্থে ঐ সমস্ত দাবি সমূহ মেনে নেয়নি। তবুও পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে না পারাও বিএনপি'র পতনের জন্য দায়ী করা যায়।

১০. গেলাম আজম ও গণ আদালত প্রসঙ্গে ঃ খালেদা জিয়া সরকারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আর একটি সমস্যা ছিল গোলাম আজম প্রসঙ্গ। খালেদা জিয়ার শাসনামলে সরকার বিরোধী একটি অংশ সরকারকে বিব্রত করার জন্য এই প্রসঙ্গটিকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং গণ আদালত গঠন করে। গণ আদালত যে আইন ও সংবিধানের পরিপন্থী ছিল তা। আমি এই গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও গণ আদালত এবং এর রায়কে কেন্দ্র করে ঐ বিশেষ শ্রেণী মুক্তিযোদ্ধাদের বোঝাতে সক্ষম হয় যে সরকার গোলাম আজমের বিচারে আগ্রহী নয়। এবং গণ আদালতের রায় কার্যকরী করতে চায় না। যার ফলে মুক্তি যোদ্ধাদের বিএনপি বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং মুক্তি যোদ্ধারা বিএনপি'র বিরুদ্ধে চলে যাওয়ায়- তাঁরা জয়লাভ করতে পারে নাই।

১১। আমলা কর্মচারীদের বিরোধিতা ঃ বিএনপি'র পরাজয়ে আমলা কর্মচারীদের একটি মূখ্য ভূমিকা কাজ করেছে। খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের শেষ দিকে সরকার যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসের উদ্যোগ নিয়েছে তখন সরকারী কর্মকর্তাদের নেতা প্রাক্তন সচিব জনাব মহিউদ্দীন খান আলমগীরের নেতৃত্বে সরকারী কর্মকর্তা বৃন্দ এবং কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে কর্মচারী বৃন্দ সরকারের সাথে সম্পর্ক, ছেদ করে, একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠিত জনতার মঞ্চের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। (এ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আলোচিত) সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের এই বিএনপি বিরোধী মনোভাব নির্বাচন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তার প্রমান পাওয়া যায় প্রাক্তন সচিব জনাব মহিউদ্দীন খান আলমগীর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করায় জনতার মঞ্চে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক স্থাপনকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের এই আশঙ্কা ছিল যদি বিএনপি পুনরায় ক্ষমতায় আসে তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে। তাই একথা বলা যায় সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটি মূখ্য ভূমিকা ছিল বিএনপি সরকারের পতনে। অত্র গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রশ্নমালা বিশ্লেষণে দেখা যায় বিএনপির পরাজয়ে আমলা কর্মচারীদের বিরোধিতার কথা বলেছেন শতকরা ৯ জন।

১২. বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী তিন দলের সমঝোতা ঃ

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে বিএনপি'র বিরুদ্ধে দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশী সময় জুড়ে আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে উঠে। যদি ও ঐ তিন দল ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোন নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তুলে নাই কিন্তু তাদের একটি ঐক্য ছিল তা হল যে ভাবেই হোক বিএনপি'কে পরাজিত করতে হবে। ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে সাপ্তাহিক বিচিত্রার ৪৯ সংখ্যায় তিন দলের নির্বাচনী লক্ষ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন, " তিন দলের নির্বাচনে বিএনপি'র বিরোধীতা করবে তবে তিন দল কোনো নির্বাচনী ঐক্য করবে না। তিন দল একে অপরের নিন্দা, সমালোচনা বা বিরুদ্ধে বলবেনা।" [১০৪] কাজেই একথা বলা যায় ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র পরাজয়ে আন্দোলনকারী তিন দলের সমঝোতা অনেকাংশে কাজ করেছে।

১৩. উপদলীয় কোন্দল ঃ বিএনপি'র পরাজয়ে আর একটি কারণ ছিল উপদলীয় কোন্দল। বিরোধী দলের বয়কটের মূখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে সমস্ত প্রার্থী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে ছিল পরবর্তীতে ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র ঐ সমস্ত প্রার্থীদের অনেককেই মনোনয়ন দেয়া হয় নাই। আবার নির্বাচনের পূর্বে দলে যোগদানকারী নবাগতদের মধ্য থেকে অনেক প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়ায় পুরাতন ও ত্যাগী অনেক নেতা মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন। বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীগণ দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র কিংবা অন্য দলের প্রার্থী হয়েছেন। এদের অনেকেই নির্বাচিত হয়েছেন আবার অনেকে দলীয় প্রার্থীকে পরাজিত হতে সাহায্য করেছে। ১৯ অক্টোবর ২০০০ ইং 'প্রথম আলো'র এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, " গত জাতীয় নির্বাচনে উপদলীয় কোন্দলের কারণে মাত্র ১ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিএনপি'র প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেনি এমন আসনের সংখ্যা ৪০ এর উর্ধ্বে। [১০৫] এ ছাড়াও আরও কয়েকটি উদাহরণ থেকে দেখা যায়, বরগুনা-২ আসনে গোলাম সরোয়ার বিএনপি'র মনোনয়ন না পেয়ে ইসলামী ঐক্য জোটের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেন, বিএনপি'র ৩জন প্রভাবশালী নেতা, ঢাকা-৮ আসনে হাজী সেলিম, খুলনা -৩ আসনে কাজী সেকেন্দার আলী ডালিম এবং যশোর ৩ আসনে আলী রেজা রাজু দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয়লাব করতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উপ-দলীয় কোন্দল বিএনপি'র পরাজয়ের একটি মূখ্য কারণ ছিল।

১৪. কারচুপির অভিযোগ ঃ বিএনপি'র পরাজয় সম্পর্কে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া কারচুপি'র অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন যে, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারচুপি'র আশ্রয় নিয়ে বিএনপিকে পরাজিত হতে বাধ্য করেছে। ৭ম জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী ভাষণে ও তিনি কারচুপির অভিযোগ পুনরুল্লেখ করে বলেন, "১২ জুনের নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির আশ্রয় নিয়ে আমাদের কে বিরোধী দলের আসনে বসানো হয়েছে।" [১০৬] সপ্তম অধ্যায়ে যে প্রশ্ন মালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেখানে দেখা যায় ১০০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭ জন উত্তরদাতা বিএনপি'র পরাজয়ে আওয়ামী লীগের ব্যাপক কারচুপি'র কথা বলেছিল।

ঙ) প্রশ্নমালা বিশ্লেষণ ঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ঃ একটি পর্যালোচনা, শিরোনামে গবেষণাটি বাস্তব সম্মত ও অর্থবহ করতে হলে উক্ত বিষয়ের ওপর একটি প্রশ্নমালা ভিত্তিক অনুসন্ধান

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে খালেদা জিয়ার শাসনামলের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশেষ করে নির্বাচন '৯১, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সংসদীয় কার্যক্রম, বিভিন্ন সমস্যাদি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সার্বিক ভাবে উক্ত সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ওপর একটি নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর দাতার ধৈর্য্য ও সময়ের দিক বিবেচনা করে একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর রাখা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' এর মাধ্যমে উত্তর চাওয়া হয়েছে। পক্ষপাতিত্ব এড়াবার জন্য 'অন্য কারণ' এবং কোন কোন প্রশ্নে একটি ঘর ফাঁকা রাখা হয়েছে ; সুতরাং প্রদত্ত উত্তর পছন্দ না হলে অন্য কারণে কিংবা ফাকা ঘরে নিজস্ব মতামত দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। কিছু উত্তর দাতা নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। নির্ধারিত প্রশ্নমালা (পরিশিষ্ট ৭) টিতে ৬টি প্রধান প্রশ্নের অধীন ৩২টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর দাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী জানতে চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে উত্তরদাতার রাজনৈতিক তথ্যাবলী ; তৃতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে 'পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী' ; চতুর্থ প্রশ্নের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার প্রশাসন সম্পর্কে ; পঞ্চম প্রশ্নের মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী ; এবং সবশেষে গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন তথা সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ১০০ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সমূহকে নিম্নোক্ত সারণীগুলোর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হল।

১ নং প্রশ্নের সাহায্যে ব্যক্তিগত তথ্যাবলী অর্থাৎ উত্তর দাতার নাম, বয়স, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চাওয়া হয়েছে।

সারণী ঃ ৬.১৯

উত্তরদাতাদের পেশা ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস (পুরষ/মহিলা)

	ডাক্তার	ইঞ্জিনিয়ার	শিক্ষক/ অধ্যাপক	সরঃ চাকুরী	বেসরকারী চাকুরী	ব্যবসায়ী	এ্যাডভোকেট	রাজনীতিবিদ	গৃহকর্ম/ বেকার	ছাত্র/ ছাত্রী	অন্যান্য	মোট
পুরুষ	২	২	৮	৮	১০	১০	৩	১০	৫	৬	৩	৬৭
মহিলা	২	১	৪	৩	২	-	-	-	৭	১২	২	৩৩
মোট	৪	৩	১২	১১	১২	১০	৩	১০	১২	১৮	৫	১০০

সারণী ঃ ৬.২০

বয়সভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস

বয়স	২০ বছর পর্যন্ত	২১-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪০ বছরের উর্ধ্বে	মোট
সংখ্যা	৭	৩০	১৫	১২	৮	২৮	১০০ জন

সারণী ঃ ৬.২১

শিক্ষাগত শ্রেণী বিন্যাস

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা	এস,এস,সি'র নিম্নে	এস,এস,সি	এইচ,এস,সি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	বিশেষজ্ঞ	মোট
সংখ্যা	৯	৮	১২	৩৯	২০	১২	১০০ জন

উল্লেখিত সারণী ঃ ৬.১৯ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উত্তর দাতাদের পেশা ভিত্তিক যে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে তাতে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ভিত্তিক পেশার ১০০ জন উত্তরদাতা এ জরিপে অংশ গ্রহণ করেছে। শ্রেণী বিন্যস্ত পেশা সমূহ হল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক/অধ্যাপক, সরকারী-চাকুরী,

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী চাকুরী, ব্যবসায়ী , এ্যাডভোকেট, রাজনীতিবিদ গৃহকর্ম/বেকার ; ছাত্র/ছাত্রী এই ১০টি পেশার ভিত্তিতে মূল শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পেশার বিশেষ করে মজুর, শ্রমিক রিক্সাশ্রমিক ইত্যাদি অন্যান্য কলামে দেখান হয়েছে। পেশা ভিত্তিক অংশ গ্রহণের দিক থেকে দেখা যায় যে, ডাক্তার পুরুষ ২জন এবং মহিলা ২ জন সহ মোট ৪ জন ; ইঞ্জিনিয়ার পুরুষ ২ জন এবং মহিলা ১ জন সহ মোট ৩ জন ; শিক্ষক/অধ্যাপক ৮ জন পুরুষ এবং ৪ জন মহিলা সহ মোট ১২ জন /; সরকারী চাকুরী জীবীদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ এবং ৩জন মহিলা সহ মোট ১১ জন ; বেসরকারী চাকুরী জীবীদের মধ্যেও ১০ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা সহ ১২ জন ; ব্যবসায়ীদের মধ্যে ১০ জনই পুরুষ কোন মহিলা নাই ; এ্যাডভোকেটদের মধ্যেও ৩ জনের সবই পুরুষ কোন মহিলা নাই ; রাজনীতিবিদদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে কেবল মাত্র ১০ জন পুরুষ অংশ গ্রহণ করেছে কোন মহিলা নাই ও গৃহকর্ম / বেকারদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ৫ জন পুরুষ এবং ৭ জন মহিলা সহ মোট ১২ জন ; জরিপে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অংশ গ্রহণ করেছে ছাত্র/ছাত্রী, এই শ্রেণীতে ৬ জন ছাত্র এবং ১২ জন ছাত্রী সহ মোট ১৮ জন ; এছাড়া সবশেষে অন্যান্য শ্রেণীতে ৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সহ মোট ৫ জন। এই ১০০ জনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে ৬৭ জন পুরুষ এবং ৩৩ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেছে।

সারণী - ৬.২০ এ উত্তরদাতাদের বয়স ভিত্তিক ৬টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ২০ বছর পর্যন্ত উত্তরদাতার সংখ্যা ৭ জন ; ২১ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০ জন ; ২৬ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত ১৫ জন ; ৩১ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত ১২ জন ; ৩৬ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত ৮ জন এবং সর্বশেষ শ্রেণী ৪০ বছরের উর্ধ্বে ২৮ জন সহ সর্বমোট ১০০ জন। সারণী - ৬.২১ এ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এখানেও ১০০ জন উত্তরদাতাকে ৬টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে এস,এস,সি'র নিম্নে অর্থাৎ যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন উত্তরদাতা ৯ জন ; এস,এস,সি পাস ৮ জন ; এইচ, এস, সি পাস ১২ জন ; স্নাতক অর্থাৎ এই শ্রেণীতে বি, এ, বি,এসসি এবং অনার্স পাস উত্তরদাতাদের অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং এই শ্রেণীতে উত্তর দাতার সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩৯ জন ; স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ২০ জন এবং সর্বশেষে বিশেষজ্ঞ উত্তরদাতার সংখ্যা ১২ জন।

সারণী ঃ ৬.২২

রাজনৈতিক তথ্যাবলী ঃ

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ	হ্যাঁ	না	মোট
রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য	১০	৯০	১০০
রাজনৈতিক দলের সমর্থক	৭২	২৮	১০০

২ নং প্রশ্নে উত্তর দাতাদের রাজনৈতিক তথ্যাবলী জানতে চাওয়া হয়েছে দু'টি প্রশ্নের মাধ্যমে। এর একটি হল উত্তরদতা রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য কিনা ? এবং অপরটি রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা ? সারণী ৬.২২ থেকে দেখা যায় যে, ১০০ জন উত্তর দাতার মধ্যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ১০ জন এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন না অর্থাৎ 'না' উত্তর করেছেন ৯০ জন। রাজনৈতিক দলের সমর্থনের দিক থেকে দেখা যায় - রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ১০ জন সহ ৭২ জন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং ২৮ জন কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়। উল্লেখিত সারণী থেকে দু'টি প্রশ্নের মাধ্যমে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশহ্গ্রহণ না করলেও অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সমর্থক।

৩ নং প্রশ্নের অধীনে ৩টি প্রশ্নের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বিএনপি'র জয়লাভের কারণ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.২৩

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ঃ

	হ্যাঁ	না	মোট
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে কিনা ?	৯৩	৭	১০০
নির্বাচন 'সুক্ষ কারচুপি' হয়েছে, এ বক্তব্যে আপনি একমত-কিনা	১২	৮৮	১০০

সারণী ঃ ৬.২৪

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভের কারণ ঃ

জয়লাভের কারণ	সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব	১৬	১৬%
বিএনপি'র দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা স্থাপন	১৭	১৭%
আওয়ামীলীগের অতীত শাসনের ভীতি	৩১	৩১%
একাধিক কারণ	১২	১২%
অন্য কারণে	২৪	২৪%

সারণী ঃ ৬.২৩ থেকে দেখা যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ নিরপেক্ষ হয়েছে বলেছেন ৯৩ জন ; এবং নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় নাই বলেছেন ৭ জন। " নির্বাচনে সুক্ষ কারচুপি হয়েছে" তৎকালীন বিরোধী দলের নেত্রীর এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেছেন ১২ জন উত্তরদাতা এবং একমত পোষণ করেন নাই ৮৮ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতা তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রীর উক্ত উক্তির সাথে একমত পোষণ করেন নাই।

সারণী ঃ ৬.২৪ থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভের কারণ প্রসঙ্গে তিনটি কারণ প্রশ্নমালায় দেয়া ছিল। একটি ফাকা ঘর ছিল এবং একটিতে 'অন্য কারণ' লেখা ছিল। নির্বাচনে জয়লাভে খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্বের কথা বলেছেন ১৬ জন(১৬%), বিএনপির দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা স্থাপনের কথা বলেছেন ১৭ জন (১৭%), আওয়ামী লীগের অতীত শাসনের অভিজ্ঞতায় ভীতির কথা বলেছেন ৩১ জন (৩১%) ; উপরের তিনটি কারণের কথা অর্থাৎ একাধিক কারণের কথা বলেছেন ১২ জন (১২%) ; উল্লেখিত কারণ ব্যতীত অন্য কারণের কথা বলেছেন ২৪ জন (২৪%)। এই অন্য কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে কেহ কেহ বিএনপি'র জয়লাভ সম্পর্কে বিএনপি এবং জামায়াতের গোপন আঁতাতের কথা বলেছেন কেহ আওয়ামী লীগ ঠেকাও এর কারণে বিএনপির অধিক মাত্রায় ভোট প্রাপ্তির কথা বলেছেন। কেহ কেহ নির্বাচনে কালো টাকার ছড়াছড়ির কথা বলেছেন। তবে এগুলো অন্য কারণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৪ নং প্রশ্নের অধীনে ৭টি প্রশ্নের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার প্রশাসন ও পতন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি প্রশ্ন ছিল খালেদা জিয়ার প্রশাসন সফলতা ব্যর্থতা সম্পর্ক। ১টি প্রশ্ন ছিল খালেদা জিয়ার প্রশাসন দলীয় করণ সম্পর্কিত। ১টি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত। একটি গোলাম

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.২৫

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার সফলতা/ব্যর্থতা

হ্যাঁ (৬১%)	সংখ্যা	না (৩৯%)	সংখ্যা
প্রশাসনিক দক্ষতার গুনে	১১ জন	প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে	১৭ জন
রাজনৈতিক বিচক্ষনতার গুনে	১৪ জন	রাজনৈতিক বিচক্ষনতার অভাবে	৪ জন
উপযুক্ত পরামর্শদাতার সাহায্যে	২৬ জন	উপযুক্ত পরামর্শদাতার অভাবে	৪ জন
আমলাদের সাহায্যে	৩ জন	আমালাদের অভাবে	২ জন
অন্য কারণে	৭ জন	অন্য কারণে	১২ জন

আযমের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত এবং সবশেষে বিএনপি'র পতন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। উল্লেখিত সারণী ৬.২৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়া সফল হয়েছেন অর্থাৎ 'হ্যাঁ' উত্তর করেছেন ৬১ জন (৬১%)। সফলতার কারণ হিসেবে প্রশাসনিক দক্ষতার কথা বলেছেন ১১ জন ; রাজনৈতিক বিচক্ষনতার কথা বলেছেন ১৪ জন ; উপযুক্ত পরামর্শদাতার কথা বলেছেন ২৬ জন ; আমলাদের সাহায্যের কথা বলেছেন ৩ জন এবং অন্য কারণের কথা বলেছেন ৭ জন। পক্ষান্তরে খালেদা জিয়ার প্রশাসন সফলতা লাভ করেন নাই অর্থাৎ ' না' উত্তর করেছেন ৩৯ জন উত্তরদাতা(৩৯%)। ব্যর্থতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে ১৭ জন ; উপযুক্ত পরামর্শদাতার অভাবের কথাও বলেছেন, ৪ জন ; আমলাদের সহযোগিতার অভাবের কথা বলেছেণ ২ জন এবং অন্যান্য কারণের কথা বলেছেন ১২ জন। অন্যকারণের মধ্যে কতিপয় মন্ত্রীর দুর্নীতির কথা বলেছেন, এগুলো অন্য কারণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

সারণী ঃ ৬.২৬

খালেদা জিয়ার প্রশাসন দলীয়করণ সম্পর্কিত ঃ

দলীয়করণের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
সর্বক্ষেত্রে	২২	২২%
আংশিক	৩৬	৩৬%
প্রয়োজন অনুযায়ী	২৩	২৩%
মোটেই না	১৯	১৯%
মোট	১০০	১০০%

সারণী ঃ ৬.২৭

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন	সংখ্যা	শতকরা হার
আশাতীত	৪৬	৪৬%
গড়পড়তা	১৬	১৬%
আশানুরূপ নয়	১৪	১৪%
মোটেই নয়	২৪	২৪%
মোট	১০০	১০০%

সারণী ৬.২৬ এ (প্রশ্ন ৪.৪) খালেদা জিয়ার প্রশাসনের দলীয়করণ সম্পর্কিত উত্তর সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চারটি বিকল্প উত্তরের মধ্যে দলীয় করণ সর্বক্ষেত্রে ছিল বলেছে ২২ জন (২২%) ; আংশিক বলছে ৩৬ জন (৩৬%) ; দলীয়করণ 'প্রয়োজন অনুযায়ী বলেছেন ২৩ জন (২৩%) এবং প্রশাসন দলীয় করণ ছিলনা অর্থাৎ 'মোটেই না' উত্তর করেছেন ১৯ জন (১৯%)। উল্লেখিত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় অধিকাংশ উত্তর দাতা (৩৬%) আংশিক দলীয় করণের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

সারণী ৬.২৭ এ খালেদা জিয়ার শাসনামলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রশ্ন (৪.৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানেও ৪টি বিকল্প উত্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশাতীত হয়েছে উত্তর করেছেন ৪৬ জন (৪৬%) ; গড় পড়তার কথা বলেছেন ১৬ জন (১৬%) ; আশানুরূপ নয় বলেছেন ১৪ জন (১৪%) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি বা মোটেই নয় উত্তর দিয়েছেন ২৪ জন (২৪%)। এখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতা অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশাতীত বলেছেন এবং সবচেয়ে কম উত্তরদাতা আশানুরূপ নয় বলেছেন।

সারণী ঃ ৬.২৮

গোলাম আযমের নাগরিকত্বের বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ

	হ্যাঁ	না
গোলম আযমের নাগরিকত্বের মিমাংসা যথাযথ হয়েছে কিনা ?	৬৮	৩২

সারণী ঃ ৬.২৮ এ দেখা যাচ্ছে যে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কি না এ সম্পর্কে ৬৮ জন উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন এবং ৩২ জন উত্তরদাতা না বলেছেন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতার অভিমত সরকার গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রশ্নে যথাযথ মিমাংশা করতে পেরেছিলেন।

৪ নং প্রশ্নের (৪.৭) উপ প্রশ্নের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের পতন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছিল। এই প্রশ্নের ৬টি বিকল্প উত্তর দেয়া হয়েছিল এবং পক্ষপাতিত্ব এড়াবার জন্য একটি খালি ঘর রাখা হয়েছিল। উত্তরদাতাগণ অনেকেই প্রদত্ত উত্তর থেকে পছন্দ করেছেন ; অনেকে নিজেদের মত করে উত্তর দিয়েছেন। অনেকে আবার প্রদত্ত উত্তরের মধ্য থেকে একাধিক উত্তর বেছে নিয়েছেন। কেহকেহ ফাঁকা জায়গায় কিছু মন্তব্যও লিখে দিয়েছেন। জনৈক ব্যাংকার মন্তব্য করেন যে, "এক বছর পূর্বে ক্ষমতা ত্যাগ করে নির্বাচন দিলে বিএনপি ২৪০ টা আসন পেত"[১০৭]।

সারণী ঃ ৬.২৯

বিএনপি সরকারের পতনের কারণ ঃ

পতনের কারণ	সংখ্যা
সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায়	১৪
উপনির্বাচনে কারচুপির অপবাদে	১০
তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দাবি যথা সময়ে না মানার কারণে	৪২
কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্ণীতির অভিযোগে	০৮
আওয়ামী লীগের ব্যাপক কারচুপির কারণে	০৭
আমলা কর্মচারীদের বিরোধীতার কারণে	০৯
উল্লেখিত একাধিক কারণে	০৬
নিজস্ব মতামত	০৪
মোট	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৯ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিএনপি সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার কথা বলেছেন ১৪ জন ; উপনির্বাচনে কারচুপির অপবাদের কথা বলেছেন ১০ জন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যথা সময়ে না মানার কারণে বলেছেন ৪২ জন, কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্ণীতির অভিযোগের কথা বলেছেন ০৮ জন ; আওয়ামী লীগের ব্যাপক কারচুপির কথা বলেছেন ০৭ জন ; আমলা কর্মচারীদের বিরোধীতার কথা বলেছেন ০৮ জন ; উল্লেখিত একাধিক কারণের কথা বলেছেন ০৬ জন এবং নিজস্ব মতামত দিয়েছেন ০৪ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যথাসময়ে না মানার কারণে বিএনপি সরকারের পতনের কথা বলেছেন।

৫ নং প্রশ্নের মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নের অধীনে ১১টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। ৫.১ থেকে ৫.৪ পর্যন্ত সরকারী দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা সংক্রান্ত। ৫.৫ এ বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট সংক্রান্ত প্রশ্ন ; ৫.৮ এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে, ৫.৯ এ ৫ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ সম্পর্কিত ; ৫.১০ এ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত এবং ৫.১১ এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাসে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সহায়ক হয়েছে কিনা প্রশ্ন রাখা হয়েছিল।

সারণী ঃ ৬.৩০

সংসদীয় কার্যক্রম ঃ

দল	গঠন মূলক	নেতিবাচক	মোট
সরকারী দলের ভূমিকা	৫৭	৪৩	১০০
বিরোধী দলের ভূমিকা	৩৮	৬২	১০০

সারণী ঃ ৬.৩০ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারী দলের (বিএনপি) ভূমিকা গঠনমূলক ছিল বলেছেন ৫৭ জন এবং নেতিবাচক বলেছেন ৪৩ জন ; বিরোধী দলের ভূমিকা গঠন মূলক ছিল বলেছেন ৩৮ জন এবং নেতিবাচক ছিল বলেছেন ৬২ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংসদীয় কার্যক্রমে অধিকাংশ উত্তরদাতা সরকারী দলের ভূমিকা গঠন মূলক ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারণী ৬.৩১

৫ম জাতীয় সংসদ অকার্যকর ও মেয়াদ পূর্ণ না করার ক্ষেত্রে দায়ী-

প্রশ্ন	সরকারী দল	বিরোধী দল	উভয়ই	মোট
অকার্যকর করার ক্ষেত্রে দায়ী (৫.৪)	২৬	৩০	৪৪	১০০
মেয়াদ পূর্ণ না করতে পারার জন্য দায়ী (৫.৯)	২৪	২৮	৪৮	১০০

সারণী - ৬.৩১ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ৫ম জাতীয় সংসদ অকার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারী দল দায়ী বলেছেন ২৬ জন ; বিরোধী দলকে দায়ী করেছেন ৩০ জন এবং উভয় দলকে দায়ী করেছেন ৪৪ জন উত্তরদাতা। ৫ম জাতীয় সংসদ মেয়াদ পূর্ণ না করতে পারার জন্য সরকারী দলকে দায়ী করেছেন ২৪ জন; বিরোধী দল দায়ী বলেছেন ২৮ জন এবং উভয় দল দায়ী বলেছেন ৪৮ জন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সংসদ অকার্যকর এবং মেয়াদ পূর্ণ না করতে পারার জন্য অধিকাংশ উত্তরাদাতা সরকারী এবং বিরোধী দল উভয়কেই দায়ী করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩২

৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আচরণ, লাগাতার সংসদ বয়কট, পদত্যাগ, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুর নিস্পত্তি এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত এবং গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

বিষয়	'হ্যাঁ '	'না'
৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করতেন কিনা ?	৬২	৩৮
বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বয়কট সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি সৃষ্টি হয়েছিল কিনা ?	৫৮	৪২
বিরোধী দলের পদত্যাগ যথাযথ ও সময়যোপযোগী ছিল কিনা ?	৪৪	৫৬
বিরোধী দলের ১৭৩ দিন হরতাল[১০৮] পালন যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা?	২৮	৭২
তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা যেত কিনা ?	৭৬	২৪
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিবার্য ছিল কিনা ?	৬২	৩৮
তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানীকীকরণে সহায়ক হয়েছে কিনা	৮৬	১৪

সারণী ৬.৩২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল বিরোধীতার জন্য বিরোধিতা করতেন কিনা এ প্রসঙ্গে 'হ্যাঁ' বলেছেন ৬২ জন এবং 'না' বলেছেন ৩৮ জন। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জন সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি সৃষ্টি হয়েছিল কিনা এ প্রসঙ্গে 'হ্যাঁ' বলেছেন ৫৮ জন এবং 'না' বলেছেন ৪২ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতা লাগাতার সংসদ বয়কট সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি সৃষ্টি হয়ে ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। বিরোধী দলের গণপদত্যাগ যথাযথ ও সময়োপযোগী ছিল কিনা এ প্রশ্নে 'হ্যা' বলেছেন ৪৪ জন এবং 'না' বলেছেন ৫৬ জন। অধিকাংশ না বলেছেন। বিরোধী দলের ১৭৩ দিন হরতাল পালন যথাযথ ও যুক্তি যুক্ত ছিল কিনা এ প্রসঙ্গে হ্যাঁ বলেছেণ ২৮ জন এবং না বলেছেন ৭২ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতা এত ব্যাপক হরতাল পালন সমর্থন করেন নাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব ছিল কিনা এ প্রসঙ্গে 'হ্যা' বলেছেন ৭৬ জন এবং 'না' বলেছেন ২৪ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতার অভিমত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব ছিল। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিবার্য ছিল কিনা এ প্রসঙ্গে 'হ্যাঁ' বলেছেন ৬২ জন এবং না বলেছেন ৩৮ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তরদাতা ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিবার্য ছিল বলে মন্তব্য করেন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাশকৃত তত্ত্ববধায়ক সরকার বিল গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হয়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে 'হ্যাঁ' বলেছেন ৮৬ জন এবং 'না' বলেছেন ১৪ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ হ্যাঁ বলেছেন।

৬ নং প্রশ্নে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই প্রশ্নের অধীনে ৫টি প্রশ্নের মাধ্যমে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। ৬.১ এ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ পেয়েছে কিনা : ৬.২ এ সংসদীয় গণতন্ত্র পুণঃ প্রবর্তনে কোন দলের অবদান সবচেয়ে বেশী ; ৬.৩ এ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে বিএনপি'র ভূমিকা কেমন ছিল ; ৬.৪ এ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে কিনা এবং সর্বশেষে সার্বিক ভাবে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হয়েছে।

সারণী ৬.৩৩ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ পেয়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে ২১১ জন 'হ্যাঁ' বলেছেন এবং ৭৯ জন 'না' বলেছেন। অর্থাৎ অধিকাংশ না বলেছেন। একজন উত্তর দাতা 'না' উত্তর করার পর বাড়তি মন্তব্য করে বলেছেন, " এই অস্থিতিশীলতা

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৬.৩৩

সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত ঃ

	হ্যাঁ	না
সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ পেয়েছে কিনা ?	২১	৭৯
সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে কিনা ?	৬২	৩৮

চলতে থাকবে কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের বর্তমান আদর্শ ও চরিত্র দুর্বল।"[১০৯] সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে 'হ্যাঁ' উত্তর করেছেন ৬২ জন এবং 'না' উত্তর করেছেন ৩৮ জন। অর্থাৎ অধিকাংশ উত্তর দাতা সংসদীয় গনতন্ত্রে পুনঃপ্রবর্তনে রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে মন্তব্য করলেও বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ পায় নাই এ মন্তব্য অধিকাংশ উত্তরদাতা করেছেন।

সারণী ঃ ৬.৩৪

সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে অবদান প্রসঙ্গে

দলের নাম	সংখ্যা
বিএনপি	১৪
আওয়ামী লীগ	১৮
জাতীয় পার্টি	০২
সকল দলের	৬৬

সারণী ঃ ৬.৩৪ থেকে দেখা যায়, সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে বিএনপির অবদানের কথা বলেছেন ১৪ জন, আওয়ামী লীগের অবদানের কথা বলেছন ১৮ জন ; জাতীয় পার্টির কথা বলেছেন ২ জন, তবে সকল দলের সম্মিলিত অবদানের কথা বলেছেন ৬৬ জন। কাজেই দেখা যায় উত্তরদাতাদের অভিমত অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনে সকল দলের অবদানের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সারণী ঃ ৬.৩৫

সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃপ্রর্বনে বিএনপির ভূমিকা ছিল ঃ

উদ্দেশ্য	সংখ্যা
জাতীয় স্বার্থে	৪৬
দলীয় স্বার্থে	১২
ব্যক্তি স্বার্থে	০৮
অন্যান্য	৩৪

সারণী ৬.৩৫ থেকে দেখা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃ প্রবর্তনে বিএনপি'র ভূমিকা জাতীয় স্বার্থে ছিল বলেছেন ৪৬ জন উত্তরদাতা ; দলীয় স্বার্থের কথা বলেছেন ১২ জন ; ব্যক্তি স্বার্থের কথা বলেছেন ৮ জন '; এবং অন্যান্য বা খালি ঘরে টিক দিয়েছেন ৩৪ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জাতীয় স্বার্থের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.৩৬

সর্বিক ভাবে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রাজনৈতিক উন্নয়ন ঃ

উন্নয়নের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
আশাতীত	৪৪	৪৪%
গড়পড়তা	৩২	৩২%
গড় পড়তার নীচে	১৪	১৪%
রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি	১০	১০%

সারণী - ৬.৩৬ থেকে দেখা যায়, সার্বিকভাবে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আশাতীত বলেছেন ৪৪ জন, (৪৪%) গড়পড়তা বলেছেন ৩২ জন (৩২%) গড়পড়তার নীচে বলেছেন ১৪ জন (১৪%) এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি বলেছেন ১০ জন (১০%)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতার অভিমত খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে আশাতীত।

পাদ টীকাঃ

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১. Lucian W.Pye, *Aspects of Political Development,* Boston: Little, Brown and company, 1966, P-33.

২. *Ibid.*

৩. Samul P.Huntington, *Political Order in Changing societies*, New Haven and London: Yale University Press, 1968, P-6.

৪. ডঃ এম, এ, ওদুদ ভূইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকাঃ রয়েল লাইব্রেরী, (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯৯৬ইং তৃতীয় খন্ড। পৃঃ ৫৮।

৫. ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া, *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১৯৯৮ইং, পৃঃ ২০।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১।

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২।

৯. *প্রাগুক্ত* পৃঃ ২৮।

১০. *আজকের কাগজ*, ঢাকাঃ ৭মার্চ ১৯৯৩ইং।

১১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ১৯৯৬ইং পৃঃ ৯।

১২. *প্রাগুক্ত* ।

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৩।

১৪. এমাজ উদ্দিন আহম্মদ, *শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকাঃ ইনফো পাবলিকেশনস, ১৯৯৮ইং পৃঃ ৯০।

১৫. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ,ঢাকাঃ ২০ বর্ষ-১০ সংখ্যা, ১৯ জুলাই ১৯৯১ইং। পৃঃ ১৭।

১৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯১/৯২*, অর্থনৈতিক উপদেষ্ট অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮।

১৮. *প্রাগুক্ত* , পৃঃ ৩৮।

১৯. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৩/৯৪*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃঃ ২।

২০. *মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশ* ১৯৯৩, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪ইং পৃঃ ১৮৫।

২১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

২২. *আজকের কাগজ*, ঢাকাঃ ৯জুন ১৯৯৫ইং।

২৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০-৩৩।

২৪. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*।

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৯১-১৯২।

২৬. *রোববার*, ঢাকাঃ ২০ বর্ষ ১৪ তম সংখ্যা, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ ইং, পৃঃ ১৫।

২৭. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*- ১৯৯৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৪।

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৫।

৩০. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকাঃ ২৬ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ১ আগষ্ট ১৯৯৭ইং পৃঃ ২১।

৩১. *প্রাগুক্ত*।

৩২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০ এবং *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০০০, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০০ইং পৃঃ ৫৬।

৩৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৩/৯৪* পৃঃ ৪।

৩৪. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৬।

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫৯।

৩৬. *আজকের কাগজ*, ঢাকা ঃ ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ইং।

৩৭. *শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী মূল্যায়ন, চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনঃ* প্রণয়নে ডিপিসি গ্রুপ অব কনসাল্ট্যান্টস (ডিপিসি গ্রুপ) এন্ড সেন্টার ফর ডিভেলপমেন্ট রিসার্স, ঢাকাঃ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, প্রাথমিকও গণশিক্ষা বিভাগ,এপ্রিল ২০০০ই পৃঃ২-৩।

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩।

৩৯. *শিক্ষার জন্য খাদা কর্মসূচী*, শিক্ষার জন্য খাদা কর্মসূচীর প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,১৯৯৬ ইং, পৃঃ ২।

৪০. উপানুষ্ঠানিক *শিক্ষার নতুন দিগন্তঃ স্বক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা, দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকাঃ ৮, সেপ্টেম্বর ২০০০ইং। পৃঃ ৬।

৪১. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৭।

৪২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮০।

৪৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০ প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৯৮।

৪৪. *প্রাগুক্ত*।

৪৫. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৩/৯৪, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২৪৩।

৪৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮২।

৪৭. মোহাম্মদ হান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২২০।

৪৮. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬*, পৃঃ ৮৩।

৪৯. *প্রাগুক্ত*।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৮৫

৫১. *প্রাগুক্ত*।

৫২. *দৈনিক দিনকাল* ঢাকাঃ ১৫ মে ১৯৯৮ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,* ১৯৯৬, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫০।
৫৪. *দৈনিক ইনকিলাব,* ঢাকাঃ ৫ এপ্রিল ১৯৯১ ইং।
৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক* ঢাকাঃ ৫ মে ১৯৯১।
৫৬. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ঢাকাঃ ২০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা ৫ জুলাই ১৯৯১ইং পৃঃ ২৯
৫৭. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, *প্রাগুক্ত পৃঃ* ৫৩
৫৮. মফিজুর রহমান/নাদির জুনাইদ, *যোগাযোগনীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ঃ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ ইং পৃঃ ৫
৫৯. *আজকের কাগজ,* ২৫ নভেম্বর ১৯৯৫ ইং পৃঃ ৫।
৬০. *প্রাগুক্ত,* ২৬ মার্চ ১৯৯৪ইং।
৬১. *নির্বাচনী ঘোষণা, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* ৯৬,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল,পৃঃ নম্বর নাই (৭)
৬২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২।
৬৩. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৭।
৬৪. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৯৪ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪ইং পৃঃ ৪৭।
৬৫. *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭।
৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ঢাকাঃ ৬ এপ্রিল ১৯৯১ইং।
৬৭. *আজকের কাগজ* , ঢাকা ২ নভেম্বর ১৯৯২ ইং।
৬৮. এম, এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র,* ঢাকাঃ ইউপি এল, ১৯৯৫ ইং পৃঃ ৯৭।
৬৯. *আজকের কাগজ,* ঢাকাঃ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৪ইং।
৭০. *প্রাগুক্ত* ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং।
৭১. *প্রাগুক্ত।*
৭২. *আজকের কাগজ,* ঢাকাঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং।
৭৩. *প্রাগুক্ত।*
৭৪. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০২।
৭৫. *আজকের কাগজ,* ঢাকাঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং।
৭৬. মোহাম্মদ হাননান তার বই *বাংলাদেশ* '৯৩ এ ১০৩ পৃষ্ঠায় ১০৯টি বিভিন্ন কমিটির কথা উল্লেখ করেছেন।
৭৭. *আজকের কাগজ,* ঢাকাঃ ২৮ আগষ্ট ১৯৯৪ ইং।
৭৮. *প্রাগুক্ত,* ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ইং।
৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক,* ঢাকা ঃ ৭ই এপ্রিল '৯১।
৮০. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা,* ঢাকাঃ ২৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২৬ জুলাই, ১৯৯৬ইং, পৃঃ ১৩।
৮১. *আজকের কাগজ,* ঢাকাঃ ১৫ জুলাই ১৯৯৩ইং।
৮২. *প্রাগুক্ত,* ২ অক্টোবর ১৯৯৩ইং।
৮৩. *প্রাগুক্ত।*
৮৪. *নির্বাচনী ঘোষণা, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* '৯৬, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি), ১৯৯৬ইং পৃঃ নম্বর নাই।
৮৫. *The fifth five year plan 1997-2002*, Dhaka: Planning commission, Ministry of Planning, Government of The Peoples Republic of Bangladesh, 1998, (Table 1.13) P-15.
৮৬. *বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৬, *প্রাগুক্ত,* (সারনী- ৮.৪) পৃঃ ৬১।
৮৭. *নির্বাচনী ঘোষণা, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬, প্রাগুক্ত।*
৮৮. *প্রাগুক্ত।*
৮৯. *প্রাগুক্ত।*
৯০. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

91. *The fifth five year plan 1997-2002, Ibid*, P-14.
৯২. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৬, প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৬৭।
৯৩. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০ প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০১
৯৪. আজকের কাগজ , ঢাকা ঃ ৮ এ প্রিল ১৯৯৫ ইং।
৯৫. *দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহা-পরিচালকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের দুর্নীতি, আজকের কাগজ*, ঢাকা ঃ ২৪ এপ্রিল ১৯৯৫ইং।
৯৬. আজকের কাগজ, ঢাকাঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ইং।
৯৭. *প্রথম আলো* ঢাকাঃ ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ইং।
৯৮. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ৩১ অক্টোবর ১৯৯৫ ইং।
৯৯. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ১৬ মার্চ ১৯৯৫ ইং।
১০০. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ২১ মার্চ ১৯৯৫ ইং।
১০১. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ৫ এপ্রিল ১৯৯৫ ইং।
১০২. *'আজকের কাগজ'*, ঢাকাঃ ১ জানুয়ারী ১৯৯৫ ইং।
১০৩. *'রোববার'* ঢাকাঃ ১৮ বর্ষ ৩৬তম সংখ্যা, ৭ জুলাই, ১৯৯৬ ইং।
১০৪. *'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'*, ঢাকঃ ২৪ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ২৪।
১০৫. *'প্রথম আলো'* ঢাকা ঃ ১৯ অক্টোবর, ২০০০ ইং।
১০৬. *'রোববার'* ঢাকাঃ ১৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২১ জুলাই, ১৯৯৬ ইং, পৃঃ ২১।
১০৭.. *একটি বেসরকারী ব্যাংকে চাকুরীরত জনৈক ব্যাংকারের নাম জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।*
১০৮. *আমার এ গবেষণায় পঞ্চম অধ্যায়ের শেষাংশে 'খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল ঃ একটি বিশ্লেষণ শিরোনামে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে খালেদা জিয়ার শাসনামলে হরতাল ধর্মঘট অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে মোট ২৫৭ দিন।*
১০৯. *উক্ত উক্তিটিও করেছেন জনাব মোঃ আব্দুর রউফ।*

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ফলাফল

উল্লেখিত আলোচনা থেকে উক্ত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। খালেদা জিয়ার সরকার একটি অবাধ ও নিরেপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে ক্ষমতায় আরোহন করেন। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল এবং ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ত্রয়োদশ সাংশোধনী সহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করা হয়। উল্লেখিত তিনটি বিল ছাড়াও পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক একশত তেহাত্তরটি বিল (একটি বেসরকারী বিল সহ) পাশ করা হয়। সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে পূনপ্রবর্তন ছাড়াও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ বিল, সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে আইন, স্থানীয় সরকার সংশোধন বিল সহ গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইনের সংস্কার ও সংশোধন করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকার এবং বিরোধ দলের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারন করায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘটে। সরকার এবং বিরোধী দলের মতবিরোধ দুর করার লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন সমঝোতা না হওয়ায় এবং বিরোধী দলের গণপদত্যাগের ফলে পঞ্চম জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন দুরুহ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বিরোধী দলের দাবী অনুযায়ী ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের সকল জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করা হয়। চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের সূচিত হয়।

উল্লেখিত শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সহ জাতীয় প্রবৃদ্ধি উর্দ্ধমূখী লক্ষ্য করা যায়। কর ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা (ভ্যাট) প্রবর্তন করে করের আওতা বৃদ্ধি করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন বাজেটে সর্বোচ্চ ৪৩% (১৯৯৪/৯৫) অর্থায়ন দেশীয় সম্পদ দ্বারা যোগান দেওয়া হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করা হয়। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সহ শিল্পান্নোয়নের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। রাজস্ব বাজেটে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ অব্যাহত রাখা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। যমুনা সেতুসহ অসংখ্যা সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি যুব ও নারী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

নির্বাচনী ওয়াদার অধিকাংশ বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরী যে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন।

উল্লেখিত অগ্রগতি ছাড়াও খালেদা জিয়ার শাসনামলে কিছু নেতিবাচক কর্মকান্ড লক্ষ্য করা যায়। ২৫৭ দিন হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন, ধর্মঘটের ফলে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। কিছু কিছু মন্ত্রীদের দুর্নীতিও সার কেলেংকারীর ফলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচনী ওয়াদা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন : একটি পর্যালোচনা শিরোনামে গবেষণার উপসংহারে বলা যায় উল্লেখিত অধ্যায় সমুহের বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যায়, যদিও খালেদা জিয়ার শাসনামলে রাজনৈতিক অস্থিতি শীলতা বিরজমান ছিল তবুও উল্লেখিত সময়ে কাংখিত মাত্রায় রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিক গণ রাজনৈতিক উন্নয়ন এর জন্য যে সমস্ত শর্তের কথা বলেছেন যেমন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, শিক্ষার প্রসার, নগরায়ন, শিল্পায়ন, গণতন্ত্রায়ন, স্থিতিশীলতা ও সুশৃংখল পরিবর্তন এবং সামাজিক পরিবর্তন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে উল্লেখিত প্রত্যেকটিই ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা গেছে। আবার অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকদের উন্নয়ন মডেল পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় উল্লেখিত সময়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে।

রাজনৈতিক উন্নয়নের তাত্ত্বিকদের বক্তব্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা যায় খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল উর্ধ্বমুখী এবং উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যান্য দেশেরও সমপর্যায়ে। আবার তাত্ত্বিকগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কথা বলেছেন সেক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার শাসনামলে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল কাংখিত মাত্রায়। উন্নয়ন তাত্ত্বিক গণ শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে দেখা গেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সাফল্য ছিল সর্বাধিক। জাতীয় শিক্ষার হার ১৯৯১ সালে ছিল ৪৪.৩%, ১৯৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫.৬% এ পৌছায় এবং বয়স্ক শিক্ষার হার ১৯৯১ সালের ৩৫.৩% থেকে ১৯৯৬ সালে ৪৭.৩% উন্নীত হয়। এছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার সরকারের পদক্ষেপ সমূহ ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, খালেদা জিয়ার শাসনামলে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটে যা তাত্ত্বিকদের বক্তব্য অনুযায়ী রাজনৈতিক উন্নয়নের মান নির্দেশ করে। রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের কথা তাত্ত্বিকদের বক্তব্য থেকে এসেছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে শিল্প ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয় যার ফলে শিল্প ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়। যা রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অপরিহার্য মানদন্ড। উন্নয়ন তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রায়নের কথা বলেছেন। খালেদা জিয়ার শাসনামলে জনগণের দাবী অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের পথ প্রসস্থ করেছে। যা গণতন্ত্রায়নে পথে অন্তরায় সমূহ দূর করেছে। তা ছাড়া উল্লেখিত শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশৃংখল পরিবর্তন আনায়নের পথ সুগম হয়েছে। এর ফলে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের পথ প্রশস্থ হয়েছে। কেননা গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তন অপরিহার্য।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত মডেলের কথা বলেছেন সেক্ষেত্রেও দেখা যায়, এডাম স্মিথ মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলেছেন। খালেদা জিয়ার সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছেন। আবার Keynesian Model অনুযায়ী যে সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা বলেছেন এক্ষেত্রেও ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে দেখা গেছে জাতীয় আয়বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। Capitalist Model অনুযায়ী বাংলাদেশ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে এক্ষেত্রেও দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানেও দেখা যায় অধিকাংশ উত্তরদাতা খালেদা জিয়ার শাসন আমলে যে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সুগম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। উক্ত প্রশ্নমালার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে খালেদা জিয়ার শাসনামালে রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতারা রাজনৈতিক উন্নয়ন আশাতীত বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে একথা বলা যায়, ১৯৯১ সালে একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে গঠিত খালেদা জিয়ার সরকার এবং একই সূত্র ধরে ১৯৯৬ সালে সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথ সুগম হয়েছে। এমনিভাবে আরো কয়েকটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার মন মানসিকতা বজায় থাকলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কোন দুরুহ ব্যাপার নয় এর ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে, রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সেই গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ভিত তৈরী করেছে এবং আশাতীত রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা ঃ

আজাদ আবদুর রহিম ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ প্রকৃতি ও প্রবনতা ঃ ২১ দফা থেকে ৫ দফা।* ঢাকাঃ সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭ ইং।

আজাদ, লেনিন, *ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৭ ইং।

আহমদ, ডঃ এমাজ উদ্দিন, *তুলনামূলক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ* ঢাকা ঃ গোল্ডেন বুক হাউস, [দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৯৮১ ইং।

আহমদ, প্রফেসর সালাউদ্দিন ও অন্যান্য [সম্পাদিত] *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।

আহমদ ফয়েজ, *রাজনীতি - ৯৫* ঃ দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকাঃ মুক্ত ধারা, ১৯৯৬ ইং।

আহমদ, মওদুদ, *বাংলাদেশ ঃ শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল*, ঢাকা ঃ ইউপিএল,১৯৮৭ ইং।

আহমদ, মওদুদ, *বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯২ ইং।

আহমেদ (অবঃ), ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন, *বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬ ইং

আহমেদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫ ইং।

ইসলাম, মেজর(অবঃ) রফিকুল [পিএসসি], *বাংলাদেশ ঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৯ ইং।

ইসলাম, মেজর [অবঃ] রফিকুল [পিএসসি] *স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০* ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৩ ইং।

ইসলাম, সিরাজুল, [সম্পাদিত], *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* ঃ প্রথম খন্ড, [রাজনৈতিক] ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং।

কামাল, মোস্তফা, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা*, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।

কামাল, মোস্তাফা, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট ঃ খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য প্রসংগ*, ঢাকা ঃ শিব্বির প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং।

কবির, শাহরিয়ার, *গণআদালতের পটভূমি*, ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং।

খান (অবঃ) মেজর জেনারেল মনজুর রশীদ, *এরশাদের পতন ও সাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী শাসন কাছ থেকে দেখা*, ঢাকা ঃ অঙ্কুর প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং।

খান, আতাউর রহমান, *প্রধান মন্ত্রীত্বের নয় মাস*, ঢাকা ঃ মোহনা প্রকাশনী, [দ্বিতীয় প্রকাশ] ১৯৯১ ইং

খান, আতাউর রহমান, *স্বৈরাচারের দশ বছর*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০ ইং।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, *গণতন্ত্রের পক্ষে বিপক্ষে*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, [দ্বিতীয় প্রকাশ] - ১৯৯১ ইং।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ [সম্পাদিত] *গণতন্ত্র*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫ ইং।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ [পরিকল্পিত ও সংকলিত] *এরশাদের পতন বিবিসি সহ বিদেশী গণ মাধ্যমের দৃষ্টিতে*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স , ১৯৯২ ইং।

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকা ডানা পাবলিশার্স, ১৯৯৯ ইং

তালুকদার, এস, এম, শাহজাহান, *শহীদ জিয়া বিএনপির অতীত-বর্তমান, অতঃপর*, ঢাকাঃ এশিয়া পাবলিকেশনস্, ১৯৯০ ইং।

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ [সম্পাদিত] *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ ঃ প্রশাসনিক দলিল পত্র*, ঢাকা জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৮ ইং।

দৌলা, আমান-উদ, *একাত্তরের ঘাতকদের কেন বিচার চাই*, ঢাকাঃ অন্যকথা ১৯৯৩ ইং।

দাস, দীনেশ, [সম্পাদিত] *বেগম জিয়ার ৫ বছর* ঢাকাঃ উত্তরা প্রকাশনী, ১৯৯৫ ইং।

বদিউজ্জামান, *রাজপথের রাজনীতি*, ঢাকা ঃ[কাকলী প্রকশনী, ১৯৯৮ ইং।

বেগম, নাজমিব নূর, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, ঢাকা ঃ নলেজ ভিউ, [দ্বিতীয়সংস্করণ] ১৯৮৪ ইং।

ভূঁইয়া, ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, *বাংলাদেশের দলীয় ব্যবস্থাঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা ঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, [দ্বিতীয় সংস্করণ], ১৯৯৩ ইং।

ভূঁইয়া, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ, *সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নের রূপ রেখা*, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, [দ্বিতীয় প্রকাশ] ১৯৯৮ ইং।

ভূঁইয়া, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ, *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো, [দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৯৯৮ ইং।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল, [সম্পাদিত] *গণ আন্দোলন ১৯৮২ - ৯০*, ঢাকা ঃ মুক্তধারা, ১৯৯১ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মতিন, আব্দুল, *খালেদা জিয়ার শাসন কাল ঃ একটি পর্যালোচনা*, ঢাকাঃ র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবিলেকসন্স, ১৯৯৭ ইং।
মান্নান, মোঃ আব্দুল, *তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি*, ঢাকা ঃ করতোয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ ইং।
মামুন, মুনতাসীর ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা ঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫ ইং।
মিয়া, এম, এ, ওয়াজেদ, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৩ ইং।
মিয়া, এম, এ, ওয়াজেদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চাল চিত্র*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৫ ইং।
মুকুল, এম, আর, আখতার, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স, [চতুর্থ মুদ্রন] ১৩৯১ বাং।
মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, *বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯১ ইং।
রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, *বাংলাদেশের তারিখ*, ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ ইং।
রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র* ঃ [প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় খন্ড ও তৃতীয় খন্ড], ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য, মন্ত্রণালয়, ১৯৮২ ইং।
রায়, অজয়, *গণ আন্দোলনে নয় বছর ১৯৮২-৯০* ঢাকা ঃ মুক্তধারা, ১৯৯১ ইং।
রায়, স্বদেশ, *গণ অভ্যুত্থান ৯০*, ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯১ ইং।
হাননান, ডঃ মোহাম্মদ, ঘটনা পঞ্জি ১৯৯৬, ঢাকাঃ পরমা প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।
হাননান, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ ৯৩*, ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ ইং।
হাকিম, এস, আব্দুল, *আন্দোলন ও দেশ পরিচালনায় বেগম খালেদা জিয়া*, ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৪ ইং।
হাবিব, খালেদা, *বাংলাদেশ, নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রী সভা ১৯৭০-৯১*, ঢাকা ঃ প্রকাশক এ, আর, মুরশেদ, ১৯৯১ ইং।
হাসানউজ্জামান, *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ অক্ষর, ১৯৯২ ইং।
হাসান উজ্জামান, *বাংলাদেশ ঃ রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ*, ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯১ ইং।
হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকা ঃ পড়ুয়া, ১৯৯৬ ইং।
হোসেন, ডঃ আনোয়ার, *বাংলাদেশ সংকট সংলাপের রাজনীতি*, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৫ ইং।
হোসেন, ফেরদৌস, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি*, ঢাকা ঃ নির্ঝর পাবলিকেশনস্, ১৯৯৪ ইং।
সাঈদ, আবু আল, আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-৭১, ঢাকা ঃ সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং।

জার্নাল (বাংলা)

জাহাঙ্গীর,বোরহান উদ্দীন খান (সম্পাদিত) সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকাঃ সামাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ঢাঃ বিঃ নং ৬৬ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং।

প্রতিবেদন

* *জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১, নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন*, (জি পি পি ডি শাখা-২-১৪৭২/৯৩-৯৪/(নিঃ)-২২-০৯-৯৪-২০০০ ইং।
* সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, *অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা*, ১৯৯৫, ঢাকাঃ ইউপিএল, ১৯৯৫ ইং।
* *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯১/৯২, ঢাকাঃ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
* *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৩/৯৪*, ঢাকা ঃ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
* *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৬*, ঢাকা ঃ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন, ১৯৯৬ ইং।
* *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০*, ঢাকা ঃ *অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়*। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন, ২০০০ ইং।
* *বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ*, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর, ১৯৯৭ ইং।
* *শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ [শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রকল্প, বাস্তবায়ন ইউনিট, কর্তৃক প্রনীত ও প্রকাশিত] ১৯৯৬ ইং।
* *শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী মূল্যায়ন, চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন* , শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। প্রণয়নে, ডিপিসি গ্রুপ অব কনসালট্যান্ট রিসার্স, বাংলাদেশ (সিডি আর বি) ঢাকা ঃ এপ্রিল ২০০০ ইং।

* *নির্বাচনী ঘোষণা* (নির্বাচন ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) ১৯৯১ ইং।
* *নির্বাচনী ঘোষণা, ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন* '৯৬, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি,এন,পি) ১৯৯৬ ইং।
* *বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের [প্রথম থেকে বাইশতম] অধিবেশনের (১৯৯১-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ,* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

* গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [১৯৯৪ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪ ইং
** গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান [১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত] গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯ ইং

দৈনিক পত্রিকা সমূহ ঃ

১। দৈনিক '*ইত্তেফাক*', ১৯৯০, ১৯৯১ এবং ২০০০।
২। দৈনিক '*ইনকিলাব*', ১৯৯২, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪।
৩। '*আজকের কাগজ*', ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬।
৪। দৈনিক '*বাংলার বাণী*' ১৯৯১ এবং১৯৯২
৫। দৈনিক '*খবর*' ১৯৯২।
৬। দৈনিক '*সংবাদ*'- ১৯৯১, ১৯৯২।
৭। '*প্রথম আলো*', ১৯৯৯ এবং ২০০০।

সাপ্তাহিকী

১। সাপ্তাহিক '*বিচিত্রা*' ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৭।
২। সাপ্তাহিক '*পূর্ণিমা*' ১৯৯১।
৩। '*রোববার*' ১৯৯১, ১৯৯৮।

English :

Ahmed, Sharif Uddin, Edt, *Dhaka Past Present Future*, Dhaka : The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Ahmed, Moudud, *Democracy and the Challenge of Development* [A study of politics and military intervention in Bangladesh] Dhaka : UPL 1995.

Almond, Gabriel *A. Political development in heuristic theory*, Boston : Little, Brown 1990.

Ahmed, Sirajuddin, *'Sheikh Hasina', Prime Minister of Bangladesh*, Dhaka ::

Almond, Gabriel A &, James S Coleman, *The Politics of the Developing Areas*, New Jersey : Princeton University Press, [Second Printing] 1971.

Almond, Gabriel &, G. Bingham, Powell. *Comperative politics : A Development Approach,* Boston : Little, Brown, 1966.

Apter, David E, *The politics of Modernization*, Chicago : University of Chieago Press, 1965.

Binder, Leonard, Iran : *Political Development in a Changing Society,* Berkeley : University of California Press, 1962.

Coleman, James S. [Edited] *Education and political Development*, New, Jersey Princeton University Press, 1965.

Cutright, Philips, *National Political Development in Nelson W. Polsbyets politics and social life*, Boston : Honghton Mifin, 1963.

Dhaka University Institutional Repository

Hakim, Muhammad A, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka : UPL, 1993.

Huda, A.K.M. Shamsul, *The Constitution of Bangladesh*, [Volume-2], Chittagong : Rita court, 1997.

Huntington, Samuel P, *Political Order in Changing Societies*, New Haven : Yale University press, 1968.

Islam, M. Nazrul, *Pakistan and Malaysia : A comparative Study in National Integration*, New Dellhi : Sterling Publishers, 1989.

Islam, M. Nazrul, *Problems of Nation Building in Developing Countries.: The case of Malaysia*, Dhaka : University of Dhaka, 1988.

Jahan, Rounaq,*Pakistan : failure in national integration*, Dhaka : [First Bangladesh Edition] : UPL, 1994.

La Palombara, Joseph and Myron weiner, eds, *Political Parties and Political Development*, Princeton : Princeton University Press, 1966.

Maniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath. Dhaka* : UPL [second edition] 1988.

Pye, Lucian W, *Aspects of Political Development*, Boston : Little, Brown and Company, 1966.

Pye, Lucian, W & Sidney Verba, *Political Culture and Political Development*, New Jersey : Princeton, University Press, USA, [Second Printing] 1967.

Rostow, Walt W. *Politics and the stages of Growth*, Cambridge : cambridge University Press, 1971.

Rahim, Aminur, *Politics and National Formation in Bangladesh*, Dhaka : UPL, 1997.

Sobhan, Rehman, *Bangladesh Problems of Governance*, Dhaka : Dhaka University press, 1993.

Ziring, Lawrence, *Bangladesh from Mujib to Ershed an interpretive study*, Dhaka : University press Ltd. 1992.

Report :

* *The fifth five yea plan 1997-2002*, planning commission, Ministry of Planning, Government of The Peoples Republic of Bangladesh, 1998
* *Trade and Development Reports* 1997, Report by the Secretariat of the United Nation's Conference on Trade and Development, United Nations, New York and Geneva, 1997.

Journal :

* Chowdhury, Mahfuzul Hoque, *Elite and Political Development in Bangladesh : An overview* [Seminar proceding of the third National Conference of the

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh, Political Science Association] Dhaka : Political Science Association, 1995.
* *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities)* Dhaka : Vol. 35, No. 2, December 1990.
* *Perspectives in Social Science : a Compilation Volume of Seminar Paper*, [Center fro Advanvce in Social Sciences, Editor : Sayed Giasuddin Ahmed, Volume 5, October, 998.]
* *Social Science Review*, Vo. XV, No. 2(1998).

Weekly Paper :
* The weekly 'Holiday', 1995.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

শেখ হাসিনার কাছে খালেদা জিয়ার লেখা দ্বিতীয় চিঠি

সভানেত্রী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

প্রিয় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী,
আসসালামু আলাইকুম।

গত ২৮শে অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখে প্রেরিত আমার পত্রের জবাবে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখে আপনি যে পত্র পাঠিয়েছেন-তা আমার হস্তগত হয়েছে। আমার পত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনি জানেন যে, আমি ও আমার সহকর্মীগণ অনেক দিন ধরেই জাতীয় সংসদ এবং বিভিন্ন সভা - সমাবেশে বলে আসছি যে, 'দেশে রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে'। কাজেই, দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কথা আমি বিলম্বে স্বীকার করেছি বলে আপনার পত্রে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত আলোচনার আহবান জানিয়ে সমস্যা সমাধানে আমাদের আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছি।

একটি নির্বাচিত সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যা করে যে স্বৈরশাসন দেশবাসীর উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল, তা থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যে এক সাথে আন্দোলন করেছিলাম - পত্রে তার উল্লেখ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। স্বৈরচারবিরোধী সেই উত্তাল গণআন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন, ময়েজউদ্দিন, জেহাদ, ডাঃ মিলন প্রমুখ দেশপ্রেমিকের নৃশংস হত্যার বীভৎস চিত্র আশা করি এখনও আপনার স্মরণ আছে।

দেশবাসীকে সাথে নিয়ে সেদিন আপনি ও আমি যে আন্দোলন করেছিলাম তার প্রেক্ষিত এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সুস্পষ্ট তফাৎ থাকা সত্ত্বেও আপনার পত্রে "এমনি একটি রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে শব্দগুচ্ছের ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সাংবিধানিক সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারী এক স্বৈরশাসকের অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে সেদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছিলাম। সেদিনের ক্ষমতাসীন সরকারের বৈধতা আমরা কখনও স্বীকার করিনি বলেই তার পদত্যাগ দাবী করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একসাথে আন্দোলন করেছি। সেদিনের সেই প্রেক্ষিত ও বর্তমান প্রেক্ষিতকে এক করে দেখানোর প্রচেষ্টাই আমরা অসঙ্গত মনে করি।

আপনার পত্রে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ সত্য নয়। এসব অভিযোগ খন্ডন এবং মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে তা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। আমরা জানি যে, বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতবাদ রয়েছে, হয়তো অভিযোগও রয়েছে পরস্পরে বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দেশ ও জনগণের আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে এ সবের কোন উল্লেখ না করে শুধু বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমি খোলা মনে আলোচনার জন্য আপনার প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা সবাই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ভাই-বোনদের পবিত্র রক্তে অর্জিত জাতীয় সংসদকে জনগণের আশা- আকাঙ্খা পূরণের কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখতে চাই; বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্রকে অব্যাহত রাখতে চাই; জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হোক- জনগণের এই আন্তরিক আকাঙ্খা পূরণ করতে চাই এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চাই - যাতে দেশের সকল ভোটার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

আমাদের এই সব আকাঙ্খা বাস্তাবায়নের জন্য আমাদেরকে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে মুক্ত মনে কথা বলতে হবে ; একে অপরের কথা শুনতে হবে ; যুক্তি- আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উদার মানসিকতা পোষণ করতে হবে। কোন পূর্বশর্ত দিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা যে ফলপ্রসু হয় না এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে।

আপনার পত্রে আলোচনার লক্ষ্য হিসাবে আপনি "বিরাজমান সংকট থেকে উত্তরণ" কে চিহ্নিত করেন এবং আলোচনার পূর্বে আলোচ্যসূচী স্থির করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পত্রে আপনি এটাও স্বীকার করেছেন যে,, 'সমস্যা এবং সংকট, তা যত জটিলই হোক না কেন, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান সব সময়ই সম্ভব'।

আমরা আপনার বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলতে চাই যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্যাই যেহেতু এই মুহূর্তের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সেহেতু এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য "আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান কে আলোচ্যসূচী হিসাবে গ্রহণ করি। সুতরাং আলোচনার টেবিলে উভয় পক্ষের উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আসুন, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে ফলপ্রসু সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে অর্থবহ আলোচনায় মিলিত হই। আশা করি আপনি আমার এই আন্তরিক আহবানে ইতিবাচক সাড়া দেবেন।

আল্লাহ হাফেজ।
শুভার্থী
(বেগম খালেদা জিয়া)
সূত্র ঃ ঢাকা ঃ ৩ নভেম্বর, ১৯৯৫ ইং আজকের কাগজ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট -২

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল

২ক পরিচ্ছেদ- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ

৫৮খ। (১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩)(১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

৫৮(গ)। (১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তারিখ প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যহতি পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহতি পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগ কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্বব, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্যে হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানবলীকে কার্যকর করা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীনে তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি —

ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য :

খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অংগীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন :

গ) সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন :

ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

Dhaka University Institutional Repository

এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিতও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্তরূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমার্যাদা এবং পারিশ্রামিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমীক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

৫৮ঘ। (১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকাব একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকাব হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্ত রূপে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে ; এবং এইরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫৮ঙ। এই সংবিধানের ৪৮(৩), ১৪১ ক(১) এবং ১৪১ গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮ খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধানসমূহ অকার্যকর হইবে।]

সূত্র : *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান* (১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকাঃ ১৯৯৯, পৃঃ ১৯-২১.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

হরতাল, অসহযোগ আন্দোলন, ধর্মঘট ও অবরোধ (১৯৯১-১৯৯৬)

নিম্নে ১৯৯১-১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ের হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হল ঃ

তারিখ	স্থান/ আওতা	দিনের সংখ্যা	ঘন্টা /সময়	হরতালের কারণ	হরতাল আহ্বানকারী
১	২	৩	৪	৫	৬
হরতাল ১৯৯১					
২১-৭-৯১	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	উপজেলা বাতিলের প্রতিবাদে	উপজেলা চেয়ারম্যানদের আহবানে।
১৪-৯-৯১	দেশব্যপী	পূর্ণ	১২	শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ
৯-১০-৯১	দেশব্যপী	পূর্ণ	১২	ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ
২-১২-৯১	দিনাজপুর	অর্ধ	৮	ছাত্রলীগ নেতা অজয় রায় হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ
৮-১২-৯১	রাজধানী	অর্ধ	৮	পুলিশি হামলার প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ
৯-১২-৯১	রাজধানী	অর্ধ	৬	উপজেলা বাতিলের প্রতিবদে	উপজেলা চেয়ারম্যানদের আহ্বানে।
হরতাল ঃ ১৯৯২					
২-১-৯২	খুলনা	পূর্ণ	১২	খুলনায় সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ
৮-২-৯২	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	ঘুর্ণি দুর্গত শ্রমিকদের বেতন অনুদান সহ কয়েকটি দাবি আদায়ের জন্য	শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশের সি.বি.এ/ নন সিবিএ।
১৮-৫-৯২	রাজধানী	অর্ধ	৮	গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে ও ২৪ ব্যক্তির মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে।	ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ডাকে।
২১-৬-৯২	দেশব্যপী	পূর্ণ	১	ঐ	ঐ
১৫-৮-৯২	দেশব্যপী	অর্ধ	৮	শেখ মুজিবের মৃত্যু দিবসে ও ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে।	আওয়ামী লীগ
২০-৮-৯২	দেশব্যপী	পূর্ণ	১২	রাশেদ খান মেননের হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ সহ ৫ বাম দল।
১৩-১০-৯২	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	ছাত্রলীগ নেতা মাহবুর হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ।
৮-১১-৯২	রাজধানী	পূর্ণ	১২	গোলাম আযমের বিচারও মামলা - প্রত্যাহারের দাবিতে	ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির ডাকে।
৮-১২-৯২	রাজধানী	পূর্ণ	১২	গণ আদালতের রায়, গোলাম আযমের বিচার সহ চারদফা বাস্তবায়নে	ঐ
১৯-১২-৯২	কুমিল্লা	অর্ধ	৮	আওয়ামী লীগ নেতা বাহাউদ্দিনের মুক্তির দাবিতে	সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির ডাকে।
৩-৬-৯২	খুলনা	অর্ধ	৮	খুলনা মহানগর উন্নয়নের দাবিতে	সকল বিরোধী দল।
হরতাল ঃ ১৯৯৩					
৫-১-৯৩	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর উশৃংখলতায়	সর্বদলীয়
১৪-১-৯৩	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	চট্টগ্রামে ১১ জন ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা মামলার আসামী করার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগের ডাকে
১৯-১-৯৩	চট্টগ্রাম	পূর্ণ	১২	আওয়ামী লীগ নেতার হত্যা প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগের ডাকে
২৫-০১-৯৩	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের জন্য	আওয়ামী লীগ

১	২	৩	৪	৫	৬
২৬-০১-৯৩	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের জন্য	আওয়ামী লীগ
৬-২-৯৩	ঢাকায়	অর্ধ	৬	মিরপুর উপনির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগের ডাকে
১০-২-৯৩	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৩-৫-৯৩	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	গোলাম আযমের বিচারও ৪ দফা চুক্তি বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন দাবীতে।	১৪টি বিরোধী দলের ডাকে
৪-৭-৯৩	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	সাংসদ আখতারুজ্জামান চৌধুরীর মামলা প্রত্যাহার ও আওয়ামী লীগ নেতাদের মুক্তির দাবীতে।	আওয়ামী লীগের ডাকে।
১৯-৭-৯৩	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে	আওয়ামী লীগের ডাকে।
১৫-৮-৯৩	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী তে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে।	ঐ
১১-১০-৯৩	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে	আওয়ামী লীগের ডাকে
৩০-১০-৯৩	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	গোলাম আযরের বিচারের দাবীতে	আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি
১৩-১১-৯৩	ঢাকায়	অর্ধ	৮	ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে	আওয়ামী লীগ
হরতাল ঃ ১৯৯৪					
১-২-৯৪	ঢাকা	অর্ধ	৬	লালবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ
২-২-৯৪ ও ৩-২-৯৪	সিলেট	দুই	৪৮	সিলেট বিভাগের দাবীতে	সর্বদল/সিলেটবাসী
২১-৩-৯৪	মাগুরা	পূর্ণ	১২	মাগুরা উপ-নির্বাচনে কারচুপির কারণে পুনঃ নির্বাচনের দাবীতে	আওয়ামী লীগ
২৩-৩-৯৪	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	মাগুরা-২ আসনে পুনঃ নির্বাচনের দাবীতে	ঐ
৩০-৩-৯৪	সাতক্ষীরা	পূর্ণ	১২	গোলাম আযমের জনসভাকে কেন্দ্র করে	জামায়াত ব্যতীত সকল রাজনৈতিক দল।
৩১-৩-৯৪	সিলেট	পূর্ণ	১২	ইলিয়াস আলীর মুক্তির দাবীতে	ছাত্রদল
১০-৪-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে (এই দিনে যমুনা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।)	আওয়ামী লীগ
১৮-০৪-৯৪	বরগুনা	অর্ধ	৮	ছিন্নমূলদের বরাদ্দকৃত জমিতে পুনর্বাসনের দাবীতে	বাস্তুহারা সমিতি
২৬-০৪-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে ও সরকারের পদত্যাগ দাবী	আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি
১৪-৬-৯৪	রাজধানী	অর্ধ	৮	বেসরকারী স্কুল কলেজের ধর্মঘটী শিক্ষকের ৪ দফা দাবি আদায়	বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষক কর্মচারিদের আহবানে
৩০-৬-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ন	১২	গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে	মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমান্ডের আহবানে।
৭-৭-৯৪	বগুড়া	পূর্ণ	১২	উপ নির্বাচনের দিন	বিরোধী দলের আহবান
২৮-৭-৯৪	চট্টগ্রাম	পূর্ণ	১২	চট্টগ্রামে ৫ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে	বিরোধী দলের আহবানে
৩০-৭-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৫-৮-৯৪	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	শেখ মুজিবের মৃত্যু দিবসে	আওয়ামী লীগ
৬-৯-৯৪ ৬-৯-৯৪	চট্টগ্রাম রংপুর	অর্ধ ১	৮ ১২	ছাত্রলীগ নেতা হত্যাকারীদের গ্রেফতারও শাস্তির দাবীতে ও রংপুরে বিভাগ প্রতিষ্ঠার দাবীতে	সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য জাতীয় পার্টি ও রংপুরবাসী।

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬
১১-৯-৯৪	রাজধানী	পূর্ণ	১২	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী ও অবরোধ কর্মসূচিতে বিরোধী দলের পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে।	আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দলের ডাকে।
১২-৯-৯৪	৫টি বিভাগীয় শহরে	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৩-৯-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
২২-১০-৯৪	যশোর	পূর্ণ	১২	ভোট কারচুপির প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ।
২৩-১০-৯৪	৪৬০ টি উপজেলায়	পূর্ণ	১২	উপজেলা ব্যবস্থা পুনর্বহাল	জাতীয় পার্টি
১০-১১-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	৮	শহীদ নূর হোসেন দিবসে	বাম ফ্রন্টের আহবানে
১২-১১-৯৪	ঢাকায়	পূর্ণ	১২	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ও সরকারের পদত্যাগ সহ ৪ দফা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে	বিরোধী দলের আহবানে
১৩-১১-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
২৯-১১-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
৭ ও ৮-১২-৯৪	দেশব্যাপী	দুই	৪৮	ঐ	ঐ
২৯-১২-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
হরতাল ঃ ১৯৯৫					
২-১-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে	৩ প্রধান বিরোধী দলের আহবানে
৩-১-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	ঐ	ঐ
৪-১-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	ঐ	ঐ
২৪-১-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	ঐ	ঐ
২৫-১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৪-২-৯৫	রাজশাহী	অর্ধ	৮	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসী হামলায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্র শিবির
১৫-২-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে	বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট
২৭-২-৯৫	খুলনায়	অর্ধ	৮	ছাত্র শিবির কর্তৃক ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদককে হত্যার প্রতিবাদ	ছাত্র দল ও ছাত্র লীগ
৯-৩-৯৫	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	ছাত্রলীগের ১২ জন নেতার মুক্তির দাবিতে	ছাত্রলীগ
১২ এবং ১৩-৩-৯৫	দেশব্যাপী	দুই দিন	৪৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে	৩ প্রধান বিরোধী দল
১৯-৩-৯৫	কুষ্টিয়া	পূর্ণ	১২	গোলাম আযমের জনসভাকে কেন্দ্র করে	সর্ব দলীয় ছাত্র ঐক্য।
১৫-৩-৯৫	শেরপুর	পূর্ণ	১২	সার সংকটের কারণে	বিরোধী দল।
২৩-৩-৯৫	উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায়	অর্ধ	৬	সার সংকটের কারণে	উত্তরাঞ্চলের বিরোধী দলের ডাকে।
২৫-৩-৯৫	দেশ ব্যাপী	অর্ধ	৬	সার কেলেঙ্কারী সহ সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে	বাম ফ্রন্ট
২৯-৩-৯৫	মাগুরা	অর্ধ	৮	সার সংকটের কারণে	বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬
৩/৪/৯৫	বগুড়া	পূর্ণ	১২	সিমেন্ট সংকটের কারণে	বগুড়া বাসী
৫/৪/৯৫ থেকে ৭/৪/৯০	সিরাজগঞ্জ	তিনদিন	৭২	সার সংকটের কারণে	সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ
৮/৪/৯৫	যশোরে	অর্ধ	৮	ছাত্রলীগ নেতার হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ
৯-৪-৯৫	বিভাগীয় শহরে	অর্ধ	৮	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল।
১০-৪-৯৫	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	ঐ	ঐ
১১-৪-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	বামফ্রন্ট
২৬-৪-৯৫	খুলনা	পূর্ণ	১২	জাতীয় পার্টি নেতার মৃত্যুতে	জাতীয় পার্টির ডাকে
২৭-৪-৯৫	খুলনা	অর্ধ	৮	ঐ	ঐ
২৮-৫-৯৫	যশোর	পূর্ণ	১২	ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক গুলি বিদ্ধ হওয়ার ঘটনায়	ছাত্র মৈত্রীর ডাকে
৪-৬-৯৫	সিরাজগঞ্জ	পূর্ণ	১২	ছাত্রলীগ হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্র লীগের ডাকে
৭-৬-৯৫	নারায়ণগঞ্জ	পূর্ণ	১২	২জন আওয়ামী লীগ কর্মী হত্যার প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ
২০-৬-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	এরশাদের মুক্তির দাবীতে	জাতীয় পার্টি
২৭-৬-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৮	এরশাদের মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে	ঐ
৩-৭-৯৫	বগুড়া	অর্ধ	৮	বগুড়ায় বিভাগের দাবীতে	বাস্তবায়ন পরিষদ
১৩-৭-৯৫	যশোর	অর্ধ	৪	যুবলীগ নেতার মুক্তির দাবীতে	যুবলীগের ডাকে
১৫-৮-৯৫	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	শেখ মুজিবের মৃত্যু দিবসে	আওয়ামী লীগের ডাকে
২৪-৮-৯৫	চট্টগ্রাম	অর্ধ	৮	আঃলীগ নেতা রফিকুল আনোয়ারের মুক্তির দাবীতে	ঐ
২৬-৮-৯৫	ময়মনসিংহ	অর্ধ	৮	বাকসুর ভিপি শাহাদাৎ হোসেন চঞ্চলের গ্রেফতারের প্রতিবাদে	চঞ্চল মুক্তি পরিষদ
১২.৬.৯৫	মানিকগঞ্জ	অর্ধ	৮	ছাত্রলীগ কর্মী হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ।
২৮-৮-৯৫	দিনাজপুর	পূর্ণ	১২	ইয়াসমীন হত্যার প্রতিবাদে	দিনাজপুরের সবগুলো বিরোধী দল
৩০-৮-৯৫	বগুড়া	পূর্ণ	১২	বগুড়ার বিভাগের দাবীতে	বগুড়া বিভাগ বাস্তবায়ন পরিষদ
২-৯-৯৫ এবং ৩-৯-৯৫	দেশব্যাপী	দুইদিন	৩২	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল
৪-৯-৯৫	মিরপুর ঃ (ঢাকা)	অর্ধ	৬	মিরপুর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে	৩ বিরোধী দল
৬-৯-৯৫	রাজাধানী	পূর্ণ	১২	ঐ	৩ বিরোদী দল
১১-৯-৯৫	খুলনা সহ দক্ষিনাঞ্চলের ১০ জেলায়	অর্ধ	৮	খুন, রাহাজানি ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদ	ওয়ার্কার্স পার্টি
১৬-৯-৯৫ থেকে ১৮-৯-৯৫	দেশব্যাপী	তিন	৭২	সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	৩ বিরোধী দল
২৪-৯-৯৫	পাবনায়	অর্ধ	৮	সন্ত্রাসের প্রতিবাদে	পাবনায় ব্যবসায়ীদের ডাকে

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬
৭-১০-৯৫ এবং ৮-১০-৯৫	বিভাগীয় শহরে	দুই	৪৮	সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	৩ বিরোধী দল
১৬-১০-৯৫ থেকে ১৯-১০-৯৫	দেশব্যাপী	চার	৯৬	ঐ	ঐ
৩০-১০-৯৫	রংপুর	পূর্ণ	১২	জমশেদ আলী হত্যার প্রতিবাদে।	জাতীয় পার্টি
১১-১১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল
১২-১১-৯৫	রাজধানী	অর্ধ	৯	ঐ	ঐ
১৩-১১-৯৫	রাজধানী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৪-১১-৯৫	রাজধানী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৫-১১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৬-১১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
৯-১২-৯৫ থেকে ১১-১২-৯৫	দেশব্যাপী	তিনদিন	৭২	প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ, নির্বাচনী তফসিল বাতিল, ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে।	আওয়ামী লীগ, জাপা, জাসদ (রব) জামায়াত।
১৯-১২-৯৫	খুলনা	অর্ধ	৮	যুবলীগ হত্যার প্রতিবাদে খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল	যুবলীগ
২০-১২-৯৫	রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে	অর্ধ	৮	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন শিবির নেতা হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্র শিবির
৩১-৮-৯৫	দিনাজপুর সহ ৬টি জেলা	পূর্ণ	১২	ইয়াসমীন হত্যা ও দিনাজপুরে ৭ জন হত্যার প্রতিবাদে	বিরোধীদল সমূহ
১২-৬-৯৫	মানিকগঞ্জ	অর্ধ	৬	কৃষক লীগ নেতা হত্যার প্রতিবাদে	জাপা ও আঃ লীগ
হরতাল ১৯৯৬ মার্চ পর্যন্ত					
৮-১-৯৬ এবং ৯-১-৯৬	দেশব্যাপী	দুই	৩৬	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে।	আওয়ামী লীগ, জাপা, ও জামায়াত
১৪-১-৯৬	রাজশাহী	পূর্ণ	১২	ছাত্রলীগ নেতা সাইদুল ইসলাম সান্নুর হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ, রাজশাহী
১৬-১-৯৬	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৭-১-৯৬	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
২৪-১-৯৬	সিলেট	পূর্ণ	১২	প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ও সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল।
২৫-১-৯৬	যশোর	অর্ধ	৮	ছাত্রলীগ নেতার হত্যার প্রতিবাদে	ছাত্রলীগ, যশোর
২৭-১-৯৬	খুলনা ও বাগেরহাট	পূর্ণ	১২	প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ও সরকারের পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল
২৮-১-৯৬	খালিশপুর	পূর্ণ	১২	সুমন হত্যার প্রতিবাদে	বিরোধী দলসহ খালিশপুরবাসী।
২৯-১-৯৬	রাজধানী, খুলনা ও বাগেরহাট	অর্ধ	৮	সুমন হত্যার প্রতিবাদে	তিন বিরোধী দল।
১-২-৯৬	বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়	অর্ধ	৮	প্রধানমন্ত্রীর বাংলা একাডেমী আগমনকে কেন্দ্র করে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬
৩-২-৯৬	বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়	অর্ধ	৮	৩১শে জানুয়ারী জগন্নাথ হলে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে	তিন বিরোধী দল
৭-২-৯৬	ফেনী	পূর্ণ	১২	প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে	আওয়ামীলীগ সহ বিরোধী দল
৮-২-৯৬	ফেনী	অর্ধ	৯	ছাত্রলীগ নেতা হত্যার প্রতিবাদে	আওয়ামীলীগ।
১০-২-৯৬	রাজশাহী	পূর্ণ	১২	প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্রে করে সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে	তিন বিরোধী দল
১৪-২-৯৬	দেশব্যাপী	পূর্ণ	২৪	ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন প্রতিহত করাও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা	ঐ
১৫-২-৯৬	দেশব্যাপী	পূর্ণ	২৪	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণ কার্ফু।	ঐ
২৯-২-৯৬	চট্টগ্রাম	পূর্ণ	১২	চট্টগ্রামের মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে	আওয়ামী লীগ
১-৩-৯৬	চট্টগ্রাম	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
২-৩-৯৬	ঐ	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
৪-৩-৯৬	কুমিল্লা	পূর্ণ	১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে ১৫ ফেব্রুয়ারীর স্থগিত আসনের পুনঃ নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য।	তিন বিরোধী দল
৫-৩-৯৬	লক্ষীপুর, ঝিনাইদহ, চাপাই নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, গোপালগঞ্জ	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
৬-৩-৯৬	রাজধানী সহ বৃহত্তম ঢাকা জেলা, সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর	পূর্ণ	১২	তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রতিবাদ ও পুনঃ নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য	ঐ
৭-৩-৯৬	কিশোর গঞ্জ, নারায়ন গঞ্জ	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
৮-৩-৯৬	রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, জামালপুর, নারায়নগঞ্জ	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
২৫-৩-৯৬	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য	ঐ
অসহযোগ আন্দোলন ঃ ১৯৯৬					
২৪-২-৯৬ থেকে ২৭-২-৯৬	দেশ ব্যাপী	৪দিন	৯৬	১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন বাতিল, সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন	তিন দল
২৮-২-৯৬	"	অর্ধ	৮	ঐ	ঐ
৯-৩-৯৬ থেকে ৩০-৩-৯৬	দেশব্যাপী -	২২দিন	- -	ঐ ঐ	ঐ ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অবরোধঃ ১৯৯১-১৯৯৬

তারিখ	আওতা/ স্থান	দিবস/ সংখ্যা	সময়/ ঘন্টা	অবরোধের কারণ	আহবানকারী
২৮-১০-৯১	দেশব্যাপী	পূর্ণ	২৪	পাট ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে রেল ও সড়ক পথ অবরোধ।	পাট ও বস্ত্রকল শ্রমিক সংগঠন।
২৫-১১-৯১	দেশব্যাপী	দুই	৪৮	ঐ	ঐ
২৫-২-৯৩	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	স্কপের বিভিন্ন দাবিতে রাজ পথ রেলপথ অবরোধ	স্কপ
১০-৯-৯৪	ঢাকা	পূর্ণ	১২	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিও সরকারের পদত্যাগের দাবীতে রাজপথ রেলপথ অবরোধ	সকল বিরোধীদল
২৭-৯-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
২৪-১২-৯৪	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১৯-০১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	ঐ	ঐ
১২-০২-৯৫ থেকে ১৫-২-৯৬	দেশব্যাপী	৪ দিন	প্রতিদিন ৮ঘন্টা	শ্রমিক ধর্মঘটে সড়ক পথ রেলপথ অবরোধ	পাট বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের আহবান
১৮-৩-৯৫	ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন স্থানে	পূর্ণ	১২	সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ	কৃষকদের আহবানে
২৩-৩-৯৫	দেশব্যাপী	অর্ধ	৮	চাল, সার ও কাগজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে।	সকল বিরোধী দলের ডাকে।
২৪-৩-৯৫	সিরাজগঞ্জ	পূর্ণ	১২	সার সংকটের কারণে	কৃষকদের আহ্বানে
২৮-৩-৯৫	ঢাকা	পূর্ণ	১২	চাল, কাগজ ও সার সংকটের কারণে	তিন বিরোধীদল
১১-৪-৯৫ এবং ১২-৪-৯৫	দেশব্যাপী	দুই দিন	৪৮	স্কপের বিভিন্ন দাবিতে অবরোধ ও ধর্মঘট	স্কপ
১৭-৯-৯৫ থেকে ২০-৯-৯৫	দেশব্যাপী	চার দিন	৯৬	পাটও টেক্সটাইল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে	পাটও টেক্সটাইল শ্রমিকদের ডাকে
৬-১১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অবরোধ	তিন বিরোধীদল
৩০-১২-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ নির্বাচনী তফসিল বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে।	ঐ
১৩-২-৯৬	দেশব্যাপী	পূর্ণ	২৪	১৫ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে	তিন বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘট

ধর্মঘট ঃ ১৯৯১-১৯৯৬

তারিখ	স্থান/আওতা	দিবস/ সংখ্যা	সময় /ঘন্টা	ধর্মঘটের কারণ	আহ্বানকারী
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯-১২-৯১	দেশব্যাপী	পূর্ণ	১২	জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে	বাস, ট্রাক মালিক সমিতি
৮ থেকে ১৩-২-৯২	দেশব্যাপী	৬ দিন	-	ঐ	ঐ
১-৩-৯২	রাজধানী	পূর্ণ	২	রিক্সা ধর্মঘট	রিক্সা শ্রমিকদের ডাকে
২২-৬-৯২ থেকে ১-৭-৯২	দেশব্যাপী	১০ দিন	-	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিক ও মালিক সমিতির ডাকে।
১৯-১০-৯২	দেশব্যাপী	পূর্ণ	২৪	সুতা বস্ত্রকল শ্রমিক ফেডারেশনের সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে।	সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক ফেডারেশন
১৫ থেকে ১৭-৩-৯৩	দেশব্যাপী	৩দিন	৪৮	স্কপের বিভিন্ন দাবিতে	স্কপ
১১ থেকে ১৩-৫-৯৩	দেশব্যাপী	৩ দিন	৭২	স্কপের বিভিন্ন দাবিতে	স্কপ
৯ থেকে ১২-৯-৯৪	ঢাকা ও উপকূলবর্তী জেলা সমূহ	৪দিন	৯৬	পরিবহন শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে	মালিক সমিতি (সরকার সমর্থক)
১২ থেকে ১৫-২-৯৫	দেশব্যাপী	৪ দিন	৯৬	শ্রমিক ধর্মঘট	পাট, বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের আহ্বানে
২-১-৯৫	দেশব্যাপী	পূর্ণ	২৪	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে
১১ এবং ১২-৪-৯৫	দেশব্যাপী	দুইদিন	৪৮	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে
২৮ থেকে ২৯-৫-৯৫	দেশব্যাপী	দুই দিন	৪৮	ঐ	ঐ
১ থেকে ৫-৭-৯৫	দেশব্যাপী	পাঁচ দিন	১২০	পাট, বস্ত্র ও সুতাকল শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে	পাট, বস্ত্র ও সুতা কল শ্রমিকদের আহ্বানে
২৯ এবং ৩০-৯-৯৫	দেশব্যাপী	দুইদিন	৪৮	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে।
১৩ এবং ১৪-৬-৯৫	চট্টগ্রাম	দুই দিন	৪৮	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে।
১৫-৬-৯৫	সিলেট	পূর্ণ	২৪	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে।
২৮-৬-৯৫	দক্ষিণাঞ্চলে	পূর্ণ	২৪	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে।
৩-১২-৯৫	ঢাকা, টাঙ্গাইল সহ ৩১টি সড়ক পথে	পূর্ণ	২৪	পরিবহন ধর্মঘট	পরিবহন শ্রমিকদের আহ্বানে।
২১-৩-৯৬	ঢাকায়	পূর্ণ	১২	রিক্সা শ্রমিক লীগ নেতা হত্যার প্রতিবাদে	ঢাকা সিটি রিক্সা মালিক চালক সমন্বয় পরিষদ।

সূত্র ঃ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

রাজস্ব বাজেট (১৯৮৫-৮৬ - ১৯৯৫-৯৬)

রাজস্ব আয়	১৯৮৫/৮৬	৮৬/৮৭	৮৭/৮৮	৮৮/৮৯	৮৯/৯০	৯০/৯১	৯১/৯২	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬
মোট কর হতে আয় (ক)	৩২২৮	৩৮৫৩	৪৩৬৭	৪৮৯৬	৫৭৮১	৬৩৮৩	৭৭৪১	৯০৩০	৯৮৮০	১১১১০	১২২০৩
ক) কর আয়											
১। বহিঃ শুল্ক	১২০২	১৫৫০	১৬১৮	১৮২০	২১৬৬	২৩২৮	২৮২০	২৮৩৫	৩০৭০	৩৬৭০	৩৯০০
২। আবগারী শুল্ক	৮৭৩	৯০০	১১৭২	১৪০০	১৭০০	১৭১৩	১৩৬০	৩২০	১৭৫	১৮০	১৮০
৩। আয় কর	৪৫৯	৫৫০	৬৬৪	৭৫০	৮৭৫	১০৭১	১৩০০	১৭২০	১৭৩৫	১২৬০	২৫১০
৪। বিক্রয় কর	৪৪০	৫৫০	৫২৫	৫৪০	৫৩১	৮২৩	-	-	-	-	-
৫। মূল্য সংযোজন কর	-	-	-	-	-	-	১৬৭২	২৫০০	২৭৭৫	৩২৭৫	৩৭৪২
৬। ভূমি রাজস্ব	৫১	৫৬	৮৯	৮৫	১১৪	৬০	৮৫	১০০	১২০	১৫০	১৭০
৭। সম্পূরক শুল্ক							২০	৯৪৫	১২৯০	১৪৫০	১৭০০
৮। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প	১২৫	১৪০	১৭০	১৭০	১৭৭	১৮৭	২২১	৩১২	৩৫৫	৪২০	৪৭৭
৯। যানবাহন আয়	১৪	১৬	২০	২০	৩৫	৩৫	৪০	৫০	৬০	৮৫	১১০
১০। রেজিষ্ট্রেশন	৪৩	৬৫	৬০	৬৩	৭০	৭০	৮০	৯৬	১২০	১৩০	১৫০
১১। মাদক শুল্ক						২০	২৫	২২	২৫	২৫	২৬
১২। অন্যান্য কর ও শুল্ক	২১	২৬	৪৯	৪৮	১১৩	৭৬	৮৫	১৩০	১৫৫	১৬৫	২৬৮
মোট কর হতে আয় (ক)	৩২২৮	৩৮৫৩	৪৩৬৭	৪৮৯৬	৫৭৮১	৬৩৮৩	৭৭৪১	৯০৩০	৯৮৮০	১১১১০	১২২০৩
খ) কর বহির্ভূত আয়											
১৩। সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	২৭৭	২৫৭	১৩৫	১৮৫	১২৮	১৬৩	৩১০	৪২৯	৪১৮	৬৫৪	৫২৬
১৪। সরকারী অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা	৮৫	৯২	৮০	৭০	৫০	২৭৬	৩৮১	৩৬০	৪১৫	২২৭	২১৯
১৫। সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়	২৩৩	২০০	২২৫	২২০	৩৪৫	৩০০	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪৭৫	৪৫০
১৬। অর্থনৈতিক সেবা	৫০	৫৮	৫২	৯২	১২০	১৩৩	১৩২	১৪০	১৬৩	৩০০	৩১১
১৭। সাধারণ প্রশাসন ও সেবা	৬১	৯৯	১২২	১০৪	১০৯	১২৫	১৫৪	১৮১	২২০	২৪২	৩১০
১৮। যমুনা সেতু সারচার্জ ও লেভি	-	৪৫	৫৮	৬০	৬৫	৭০	৮০	৪৫	৫৮	-	২
১৯। টি এন্ড টি বিভাগ (নীট)	২৮	৩৮	৬৫	১১০	৮০	২৪৪	২৮৩	৩২৫	৪৫৯	৬৩৫	৬৫৯
২০। ডাক বিভাগ (নীট)	-২৮	-৩০	-২৮	-৩২	-২৭০	-২৪	-২৯	-৩০	-২৮	-২৮	-৩৬
২১। রেলওয়ে (নীট)	-৫৩	-১০৪	-১৪৯	-১৫০	-১৩৯	-১৪৯	-১২৬	-১০০	-৯৫	-৯০	-১৫৯
২২। কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা	৫৮	৬০	৬১	৭৮	৩৩	৪০	৪৯	৬৪	৬৯	৭৮	৯২
২৩। সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	১৯	৩০	৩৭	৪৪	৪৭	৫৫	৫৫	৭৮	৯৩	১০৮	১৪৩
২৪। যোগাযোগ ও পরিবহন(অন্যান্য)	২৩	২০	২৩	৪২	৪২	৪৮	৩৫	৪২	৪৩	৪৬	৬৮
২৫। অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব	৮৩	৩৬	৬৫	৮৯	১২৭	১৩১	১৩৩	১৪৩	১৮৫	৪০০	৬৪৪
২৬। মূলধন উদ্ভূত রাজস্ব	৬	৫৯	৩১	১৩	১৭	২৪	৯	৩	৫০	৫৩	৫০
২৭। সেচ, পানি সম্পদ, পরিবহন ইত্যাদি।	৩	৪	২	১		৩	-	-			-
মোট কর বহির্ভূত আয় (খ)	৮৪৫	৮৬৪	৭৭৯	৯২৬	৯৯৭	১৪৩৯	১৭৭৬	২০৩০	২৪০০	৩১০০	৩২৭৯
মোট রাজস্ব (ক+খ):	৪০৭৩	৪৭১৭	৫১৪৬	৫৮২২	৬৭৭৮	৭৮২২	৯৫১৭	১১০৬০	১২২৮০	১৪২১০	১৫৫১২
রাজস্ব ব্যয়											
সরকারের বিভাগসমূহ	১৭	৩২	৪৩	৩২	৫২	৫৮	৭৯	৫৭	৬৯	৬৪	১৫১
প্রশাসন ও আইন	২৬	২৮	২৯	৩০	৩৪	৩৩	৪০	৫০	৪৭	৫১	৫২
নির্বাচন	২৩	২৫	২৭	২৮	৩৪	৩৫	৩৯	৪৮	৫৭	৬১	৬২
রাজস্ব সেবা	৯৯	১১৪	১২৮	১৩১	১৭৫	১৭৭	২৪৫	২৬৮	২৭৩	২৯৩	২৯২
সচিবালয়	৫৬	৫৫	৪৪	৪৬	৫২	৫৩	৫৬	৭১	৮১	৮৯	৯৩
বৈদেশিক বিষয়	৫৩	৬২	৯১	৬৭	৭৩	৯৩	১০৫	১০৩	১০৬	১১৭	১১০
প্রশাসন (পুলিশ, বিডিআর বাদে)	১১৪	১৪৯	১৭৫	১৮৯	২১০	১৯৯	২১৯	২৪৫	২৫৩	২৯৪	৩২৪
পুলিশ	১৭২	১৯৮	২৩০	২৪৫	৩০৪	৩০৫	৩৫০	৪১৯	৪৪৯	৪৯০	৫১৯
বাংলাদেশ রাইফেলস	৮২	৯০	১০২	১২৪	১৩০	১৪০	১৭১	২০৫	২০৯	২৩৬	২৪৯
সাধারণ সেবা	৮৯	১১১	১৫০	১৬১	১৭৪	১৮৮	২০৮	২৩৮	২৪১	২৪৮	২৫৩
প্রতিরক্ষা	৫৯৬	৭৩৯	৮৩২	১০১৫	১১৪৯	১১৮০	১৩০১	১৪৯৪	১৬৩৪	১৮৮৭	২০৬৯
শিক্ষা	৬৫১	৭৪৭	৮২০	৯৪৮	১০৯৪	১১৮২	১৩৮২	১৬৭৪	১৭৫৬	২০০৮	২১৪৮
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ	১১৩	২৭৫	৩০৫	৩২১	৩৬৭	৩৮৭	৪৩১	৫১৭	৬০৭	৬৮৫	৭০০
পেনশন ও অবসর ভাতা	৭৫	৯৫	১২৩	১৪৪	১৬৯	২২৪	২৫০	৩০০	৩৭০	৬৫০	৫০৮
সামাজিক ও গোষ্ঠী সেবা	২২৯	৩৩৭	৫২৫	৭২০	৫৬৩	৭০৯	৬২১	৬৮৯	৭২৭	৮০৫	৯৯০
সাধারণ অর্থনৈতিক সেবা	৩৩	৪৬	৫৩	৫৬	৬৩	৬৬	৭৪	৮৬	৯৮	১০৪	১২০
কৃষি ও তৎসম্পর্কীয় সেবা ও পানি সম্পদ	৫৮	১২৮	১৪৯	১৫৬	১৮৮	২০৩	২১২	৩৪৬	৩৯৩	৪৫১	৫৭০
শিল্প, খনি ও জ্বালানী	১১	২২	২২	২৩	২৮	২৬	২৯	৩৩	৩৬	৪৩	৪০
পানি, বিদ্যুৎ ও শক্তি	৩৭	৪৬	৪৭	৭৮	৬৮	৭৯	৮৭	-	-	-	-
যোগাযোগ(রেল, টিএন্ডটি ও পোষ্ট অফিস ব্যতীত)	৫৪	৬৪	৮৬	৯৮	১১৩	১১৮	১৬৭	২০৯	২৪২	২৪৫	২৯৬
বিশেষ ব্যয়	-	-	-	-	-	৬৬	৫	-	-	-	-
ভর্তুকী	১৫৮	৬৯	৬৫	৭০৬	৯৪১	৭৭০	৫৮৯	২৮৭	২৪২	২৯৬	২৮৫
গ্রান্টস ইন এইড কনট্রিবিউশন	২৯৭	৭৯	৮৪	১১৯.	৯৬	১০১	১০৯	১২৪	১৩৫	১৫৯	১৭৩
অভ্যন্তরীণ দায়ের সুদ	২২২	২০৫	২৪০	২৫০	২৮৫	৪১৭	৬৩৫	৫৫০	৫১৯	৬০৬	১০৪০
বৈদেশিক দায়ের সুদ	২০৬	২৪০	৩৫০	৪৮৩	৩৭৭	৪৩৮	৪৭৩	৪৭৫	৫৪৯	৬০০	৭০০
অপ্রত্যাশিত ব্যয়	-	২	১০	-	১	৬৩	২৩	২২	৫৭	১৮	৪০
মোট রাজস্ব ব্যয়	৩৪২১	৩৯৫৬	৪৭৩০	৬১৭০	৬৭৪০	৭৩১০	৭৯০০	৮৫১০	৯১৫০	১০৩০০	১১৮১৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ১৯৯৬ পৃঃ পরিশিষ্ট -১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত বিলের বিবরণীঃ

প্রথম অধিবেশনঃ

নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দানের তারিখ	আইন নম্বর
	১	২	৩	৪
১.	The Supreme Cort Judges (Remuneration and Privileges Amendment) Bill, 1991	২১/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১সালের ১নং আইন
২.	The Hindu Religious welfare trust (Amendment) Bill, 1991	২১/৪/৯১১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ২ নং আইন
৩.	বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৯১	২১/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ৩ নং আইন
৪.	The Eastern Railway servants Benevolent fund (Amendment) Bill, 1991	২২/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ৪ নং আইন
৫.	The Eastern Railway servants Group Insurance (Amendment) Bill, 1991	২৩/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ৫ নং আইন
৬.	The Motor vehicles (Amendment) Bill, 1991	২৭/৪/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৬ নং আইন
৭.	The National Sports Control (Amendment) Bill, 1991	২৭/৪/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৭ নং আইন
৮.	The Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) (Amendment) Bill, 1991	২৮/৪/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৮ নং আইন
৯.	জাতীয় মহিলা সংস্থা, বিল, ১৯৯১	৩/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৯ নং আইন
১০.	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1991	৩/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১০নং আইন
১১.	The Delimitaton of Constituencies (Amendment) Bill, 1991.	৩/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১১নং আইন
১২.	The representation of the people *seats for women Members) Bill, 1991.	৩/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১২নং আইন
১৩.	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) বিল, ১৯৯১।	৩/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৩নং আইন
১৪.	ব্যাংক কোম্পানী বিল, ১৯৯১।	৩/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৪নং আইন
১৫.	The penal code(Amendment) Bill, 1991.	৪/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৫নং আইন
১৬.	The code of criminal procedure (Amendment) Bill, 1991.	৪/৫/৯১	৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৬নং আইন
১৭.	The Arms (Amendment) Bill, 1991	৪/৫/৯১	৫/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৭নং আইন
১৮.	The Speical powers (Amendment) Bill, 1991	৪/৫/৯১	৫/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৮নং আইন

দ্বিতীয় অধিবেশনঃ

১.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পূরক) বিল, ১৯৯১	২৯/৬/৯১	৩০-৬-৯১	১৯৯১সালের ১৯ নং আইন
২.	নির্দিষ্ট করণ (অগ্রিম মঞ্জুরী দান বিল,১৯৯১	২৯/৬/৯১	৩০/৬/৯১	১৯৯১সালের ২০ নং আইন
৩.	অর্থ বিল, ১৯৯১	৩০/৬/৯১	৩০/৬/৯১	১৯৯১সালের ২১ নং আইন
৪.	মূল্য সংযোজন কর বিল, ১৯৯১	৯/৭/৯১	১০/৭/৯১	১৯৯১সালের ২২ নং আইন
৫.	The Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 1991	১৭/৭/৯১	২২/৭/৯১	১৯৯১সালের ২৩ নং আইন
৬.	সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১	৬/৮/৯১	১০/৮/৯১	১৯৯১সালের ২৪ নং আইন
৭.	গণ ভোট বিল, ১৯৯১	৭/৮/৯১	১০/৮/৯১	১৯৯১সালের ২৫ নং আইন
৮.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯১	১৩/৮/৯১	১৩/৮/৯১	১৯৯১সালের ২৬ নং আইন
৯.	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিল, ১৯৯১	১৩/৮/৯১	১৩/৮/৯১	১৯৯১সালের ২৭ নং আইন
১০.	সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল ,১৯৯১	৬/৮/৯১	১৯-৯-৯১	১৯৯১সালের ২৮ নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধিবেশনঃ

১.	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দুর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান বিল, ১৯৯১ ।	[illegible]	৯/১১/৯১	১৯৯১সালের ২৯ নং আইন
২.	The Members of the Bangladesh Public Service Commissions (Terms and conditions of Cerevice) (Amendment) Bill, `91	৪/১১/৯১	৯/১১/৯১	১৯৯১সালের ৩০ নং আইন
৩.	The Comptroller and Auditor-General (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1991	৫/১১/৯১	৯/১১/৯১	১৯৯১সালের ৩১ নং আইন
৪.	The International Financial Organisations (Amendment) Bill, 1991	৫/১১/৯১	৯/১১/৯১	১৯৯১সালের ৩২ নং আইন

চতুর্থ অধিবেশনঃ

১.	বিনিয়োগ বোর্ড (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	২৬/১/৯২	২৯/১/৯২	১৯৯২সালের ১নং আইন
২.	The Local Government (Upazila parished and Upazila Administration Reorganisation) (Repeal) Bill, 1992.	২৬/১/৯২	২৯/১/৯২	১৯৯২সালের ২নং আইন
৩.	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1992.	২৭/১/৯২	২৯-১-৯২	১৯৯২সালের ৩নং আইন
৪.	The Dhaka City Corporation (Amendment) Bill, 1992.	২৭/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ৪নং আইন
৫.	The Chittagong City Corporation (Amendment) Bill, 1992.	২৭/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ৫নং আইন
৬.	The Khulna City Corparation (Amendment) Bill, 1992.	২৭/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ৬নং আইন
৭.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন)বিল-১৯৯২ ।	২৭/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ৭নং আইন
৮.	The Previention of Corruption (Amendment) Bill, 1992.	২৮/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ৮নং আইন
৯.	The Paurashava (Amendment) Bill, 1992.	২৮/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ৯নং আইন
১০.	The Local Government (Union Parishads) Bill, 1992.	২৮/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ১০নং আইন
১১.	The Co-operative societies (Amendment) Bill, 1992.	২৯/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ১১নং আইন
১২.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা বিল, ১৯৯২	২৯/১/৯২	৩০/১/৯২	১৯৯২সালের ১২ নং আইন
১৩.	The Suprime Court Judges (Amendment) Bill, 1992.	৪/২/৯২	৯/২/৯২	১৯৯২ সালের ১৩ নং আইন
১৪.	The President`s (Remuneration and Privileges (Amendment) Bill, 1992.	৯/২/৯২	১৩/২/৯২	১৯৯২ সালের ১৪ নং আইন
১৫.	The Prime Ministers (Remuneration and Privileges (Amendment) Bill, 1992.	১০/২/৯২	১৩/২/৯২	১৯৯২ সালের ১৫ নং আইন
১৬.	The speaker and Deputy speaker (Remuneration Privileges) (Amendment) Bill, 1992.	১০/২/৯২	১৩/২/৯২	১৯৯২-সালের ১৬ নং আইন
১৭.	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill,1992	১১/২/৯২	১৩/২/৯২	১৯৯২ সালের ১৭ নং আইন
১৮.	The Member`s of Parliament (Remuneration and allowances) (Amendment) Bill, 1992.	১৬/২/৯২	১৮/২/৯২	১৯৯২ সালের ১৮ নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধিবেশন ঃ নাই।

৬ষ্ঠ অধিবেশনঃ

১.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পূরক) বিল, ১৯৯২।	২৯/৬/৯২	৩০/৬/৯২	১৯৯২ সালের ১৯নং আইন
২.	নির্দিষ্ট করণ (অগ্রিম মঞ্জুরী দান) বিল, ১৯৯২।	২৯/৬/৯২	৩০/৬/৯২	১৯৯২ সালের ১৯নং আইন
৩.	অর্থ বিল, ১৯৯২।	৩০/৬/৯২	৩০/৬/৯২	১৯৯২ সালের ২১নং আইন
৪.	ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) বিল ১৯৯২।	১৩/৭/৯২	১৭/৭/৯২	১৯৯২ সালের ২২নং আইন
৫.	রাজশাহী মহানগরী পুলিশ বিল, ১৯৯২।	১৪/৭/৯২	১৭/৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৩নং আইন
৬.	The Presidential Security Force (Amendment) Bill, 1992.	১৫/৭/৯২	১৭/৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৪নং আইন
৭.	অর্থঋণ আদালত (সংশোধন) বিল,১৯৯২।	১৫/৭/৯২	১৭/৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৫নং আইন
৮.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯২।	২৭/৭/৯২	৩০/৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৬নং আইন
৯.	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট বিল, ১৯৯২।	২/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ২৭নং আইন
১০.	The Water Supply and Sewerage Authority (Amendment) Bill, 1992.	৩/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ২৮নং আইন
১১.	The Bangladesh Academy for Rural Development (Amendment) Bill, 1992	৩/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ২৯নং আইন
১২.	The Bangladesh Export Processing Zone`s Authority (Amend) Bill, 1992	৩/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩০নং আইন
১৩.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯২।	৪/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩১নং আইন
১৪.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯২।	৫/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩২নং আইন
১৫.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯২।	৫/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৩নং আইন
১৬.	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২।	৫/৮/৯২	৯/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৪নং আইন
১৭.	The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy (Amendment) Bill, 1992.	১১/২/৯২	১৭/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৫নং আইন
১৮.	The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Bill 1992.	১০/৮/৯২	১৭/৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৬নং আইন

সপ্তম অধিবেশনঃ

১.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২	১৩/১০/৯২	২০/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৩৭নং আইন
২.	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২	১৪/১০/৯২	২০/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৩৮নং আইন
৩.	খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) বিল, ১৯৯২	২১/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন
৪.	The Bangladesh Shilpa Bank (Amendmend) Bill, 1992	২৫/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৪০নং আইন
৫.	The Public Examination (Offences) (Amendment) Bill, 1992	২৮/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৪১নং আইন
৬.	The Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Bill, 1992	২৮/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৪২নং আইন
৭.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিল, ১৯৯২	১/১১/৯২	৬/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৩নং আইন
৮.	সন্ত্রাস মুলক অপরাধ দমন বিল, ১৯৯২	১/১১/৯২	৬/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৪নং আইন
৯.	The Local Government (Union Parishads) (Second Amendment) Bill, 1992	৩/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৫নং আইন
১০.	The Paurashava (Second Amendment) Bill, 1992	৩/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৬নং আইন
১১.	The Supreme court Judges (Remuneration and Privileges) Second Amendment) Bill, 1992	৩/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৭নং আইন
১২.	The Supreme court Judeges (Travelling Allowances) Amendment) Bill, 1992	৩/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

১৩.	আদালত (অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা আদেশ) (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	৪/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৯নং আইন
১৪.	আভ্যন্তরীন নৌযান শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) বিল, ১৯৯২।	৪/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫০নং আইন
১৫.	The Excises and Salt (Amendmend) Bill, 1992	৫/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫১নং আইন
১৬.	The Paurashava (Third Amendment) Bill, 1992	৬/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫২নং আইন
১৭.	চিংড়ি চাষ অভিকর বিল, ১৯৯২	৬/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫৩নং আইন
১৮.	The Honse Building Finance Corporation (Amendment) Bill, 1992	৬/১১/৯২	৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫৪নং আইন

অষ্টম অধিবেশনঃ

১.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।	২/২/৯৩	২/২/৯৩	১৯৯৩ সনের ১নং আইন
২.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।	২/২/৯৩	২/২/৯৩	১৯৯৩ সনের ২নং আইন
৩.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।	২/২/৯৩	২/২/৯৩	১৯৯৩ সনের ৩নং আইন
৪.	The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha (Amendment) Bill, 1993.	২/২/৯৩	২/২/৯৩	১৯৯৩ সনের ৪নং আইন
৫.	The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1993.	১৪/২/৯৩	২৫/২/৯৩	১৯৯৩ সনের ৫নং আইন
৬.	The Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 1993.	১৪/২/৯৩	২৫/২/৯৩	১৯৯৩ সনের ৬নং আইন
৭.	The Chittagong City Corporation (Amendment) Bill, 1993.	২৩/২/৯৩	১০/৩/৯৩	১৯৯৩ সনের ৭নং আইন
৮.	The Dhaka City Corporation (Amendment) Bill, 1993.	২৪/২/৯৩	১০/৩/৯৩	১৯৯৩ সনের ৮নং আইন
৯.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন(সংশোধন) বিল,১৯৯৩	২৪/২/৯৩	১০/৩/৯৩	১৯৯৩ সনের ৯নং আইন
১০.	The Khulna City Corporation (Amendment) Bill, 1993	২৪/২/৯৩	১০/৩/৯৩	১৯৯৩ সনের ১০নং আইন
১১.	The Insurance (Amendment) Bill, 1993	৯/৩/৯৩	১৪/৩/৯৩	১৯৯৩ সনের ১২নং আইন
	গৃহীত বেসরকারী বিলঃ			
১২.	The Members of Parliament (Remuneration and allowances) (Amendment) Bill, 1993	৪/৩/৯৩	১০/৩/৯৩	১৯৯৩ সনের ১১নং আইন

দশম অধিবেশনঃ

১.	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল,১৯৯৩।	৬/৬/৯৩	৮/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৩নং আইন
২.	The Bangladesh (Freedom Fighters) welfare Trust (Amendment) Bill, 1993.	৭/৬/৯৩	৮/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৪নং আইন
৩.	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বিল, ১৯৯৩।	৭/৬/৯৩	৮/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন
৪.	The securities and Exchange (Amendment) Bill, 1993.	৭/৬/৯৩	৮/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৬নং আইন
৫.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পূরক) বিল, ১৯৯৩।	২০/৬/৯৩	২০/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৭নং আইন
৬.	অর্থ বিল, ১৯৯৩।	২৮/৬/৯৩	৩০/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৮নং আইন
৭.	নির্দিষ্ট করণ বিল; ১৯৯৩।	১৩/৭/৯৩	৩০/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ১৯নং আইন
৮.	The Local Government (Union Parishads) (Amendment) Bill, 1993.	১৬/৭/৯৩	২২/৯/৯৩	১৯৯৩ সনের ২০নং আইন
৯.	পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৯৩।	১৪/৭/৯৩	২২/৭/৯৩	১৯৯৩ সনের ২১নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধিবেশনঃ

১.	The Industrial Relations (Amendment) Bill, 1993	১৩/৯/৯৩	২৭/৯/৯৩	১৯৯৩ সনের ২২নং আইন
২.	The Supreme Court Judges (Leaves Pension and Privileges) (Amendment) Bill, 1993.	১৯/৯/৯৩	২৭/৯/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৩নং আইন
৩.	The Bangladesh Jute corporation (Repeal) Bill, 1993.	২১/৯/৯৩	৩০/৯/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৪নং আইন
৪.	The Acqusisition and Requisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1993.	২২/৯/৯৩	৩০/৯/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৫নং আইন
৫.	The Ministers Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1993.	২৬/৯/৯৩	৩০/৬/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৬নং আইন
৬.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিল, ১৯৯৩ইং।	২৭/৯/৯৩	৩০/৯/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন

দ্বাদশ অধিবেশনঃ

১.	The Electricity (Amendment) Bill, 1993.	২৩/১১/৯৩	৫/১২/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৮নং আইন
২.	The Land Development Tax (Amendment) Bill, 1993.	২৯/১১/৯৩	৫/১২/৯৩	১৯৯৩ সনের ২৯নং আইন
৩.	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।	২৯/১১/৯৩	৫/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩০নং আইন
৪.	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।	১/১২/৯৩	৭/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩১ নং আইন
৫.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।	১/১২/৯৩	৭/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩২নং আইন
৬.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৯৩।	১/১২/৯৩	৭/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের৩৩ নং আইন
৭.	পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) বিল, ১৯৯৩।	৬/১২/৯৩	১১/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের৩৪নং আইন

ত্রয়োদশ অধিবেশনঃ

১.	ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) বিল,১৯৯৪	২/৩/৯৪ইং	৭/৩/৯৪	১৯৯৪ সালের ১নং আইন
২.	অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) বিল, ১৯৯৪	৬/৩/৯৪	৭/৩/৯৪	১৯৯৪ সালের ২নং আইন

চতুর্দশ অধিবেশনঃ

১.	প্রচলিত আইন ও আইন গত দলিল (অভিযোজন) বিল, ১৯৯৩।	৯/৫/৯৪	১৭/৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৩নং আইন
২.	বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী (সংশোধন) বিল, ১৯৯৪।	৯/৫/৯৪	১৭/৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৪নং আইন
৩.	The Post Office (Amendment) Bill, 1994.	১০/৫/৯৪	১৭/৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৫নং আইন
৪..	The Highways (Amendment) Bill, 1994.	১১/৫/৯৪	১৭/৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৬নং আইন
৫.	The Post Officers (special Provisious) (Amendment) Bill, 1994.	১১/৫/৯৪	১৭/৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৭নং আইন
৬.	জাতীয় সংসদ সচিবালয় বিল, ১৯৯৪।	১১/৫/৯৪	১৭/৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৮নং আইন

পঞ্চদশ অধিবেশনঃ

১.	তফসিলভূক্ত দরগাহ্ (পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) রহিত করণ বিল, ১৯৯৪।	৭/৬/৯৪	১৩/৬/৯৪	১৯৯৪ সনের ৯নং আইন
২.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পুরক) বিল,১৯৯৪।	২০/৬/৯৪	২৬/৬/৯৪	১৯৯৪ সনের ১০নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

৩.	অর্থ বিল, ১৯৯৪।	২৮/৬/৯৪	০১/৭/৯৪	১৯৯৪ সনের ১১নং আইন
৪.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯৪।	২৯/৬/৯৪	০১/৭/৯৪	১৯৯৪ সনের ১২নং আইন
৫.	The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) (Amendment) Bill, 1994.	০৩/৭/৯৪	১৩/৬/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৩নং আইন
৬.	The Bangladesh Bank (Amendment) Bill, 1994.	৫/৭/৯৪	১৩/৭/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৪নং আইন
৭.	The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Bill, 1994.	১১/৭/৯৪	১৩/৭/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৫নং আইন

ষষ্ঠদশ অধিবেশনঃ

১.	The Government and Autonomous Bodies Employees Benevolent Fund and Group Insurance ordinance (Amendment) Bill, 1994.	৩০/৮/৯৪	৭/৯/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৬নং আইন
২.	The Public Corporations (Management Co-ordination) (Amendment) Bill, 1994.	৩১/৮/৯৪	৭/৯/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৭নং আইন
৩.	কোম্পানী বিল, ১৯৯৪।	৫/৯/৯৪	১১/৯/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন
৪.	The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 1994.	৬/৯/৯৪	১১/৯/৯৪	১৯৯৪ সনের ১৯নং আইন

সপ্তদশ অধিবেশনঃ

১.	The Acquisition and Requisition of Immovable property (Amendment) Bill, 1994.	২৩/১১/৯৪	১/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২০নং আইন
২.	সন্ত্রাস মুলক অপরাধ দমন (বিশেষ বিধান) বিল, ১৯৯৪।	২৩/১১/৯৪	০১/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২১নং আইন
৩.	The Bangladesh Export Processing zons Authority (Amendment) Bill, 1994.	২৭/১১/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২২নং আইন
৪.	The Representation of the people (Amendment) Bill, 1994.	৩০/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২৩নং আইন
৫.	The Election Polls (Amendment) Bill, 1994.	৪/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২৪নং আইন
৬.	The Banglaeesh Shishu Academy (Amendment) Bill, 1994.	৫/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২৫নং আইন
৭.	কোষ্ট গার্ড বিল, ১৯৯৪।	৬/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সনের ২৬নং আইন

অষ্টাদশ অধিবেশনঃ

১.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিল, ১৯৯৫।	৫/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ১নং আইন
২.	The Bangladesh Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1995.	৫/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ২নং আইন
৩.	আনসার বাহিনী বিল, ১৯৯৫।	৬/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ৩নং আইন
৪.	ব্যাটালিয়ন আনসার বিল, ১৯৯৫।	৬/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ৪নং আইন
৫.	গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বিল, ১৯৯৫।	৬/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ৫নং আইন
৬.	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৫।	৭/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫সনের ৬নং আইন
৭.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৫।	৭/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ৭নং আইন
৯.	The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Bill, 1995.	৮/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সনের ৯নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

ঊনিশতম অধিবেশনঃ

১.	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Amendment) Bill 1995	[illegible]	৩/৫/৯৫	১৯৯৫ সনের ১০নং আইন

বিশতম অধিবেশনঃ

১.	নিশ্চিতকরণ (সম্পূরক) বিল,১৯৯৫।	২৫/৬/৯৫	২৮/৬/৯৫	১৯৯৫ সনের ১১নং আইন
২.	অর্থ বিল, ১৯৯৫।	২৯/৬/৯৫	৩০/৬/৯৫	১৯৯৫ সনের ১২নং আইন
৩.	নিশ্চিতকরণ বিল, ১৯৯৫।	২৯/৬/৯৫	৩০/৬/৯৫	১৯৯৫ সনের ১৩নং আইন
৪.	বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ১৯৯৫।	৩/৭/৯৫	৮/৭/৯৫	১৯৯৫ সনের ১৪নং আইন
৫.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিল, ১৯৯৫।	৪/৭/৯৫	৮/৭/৯৫	১৯৯৫ সনের ১৫নং আইন
৬.	The Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Bill, 1995.	৫/৭/৯৫	১৬/৭/৯৫	১৯৯৫সনের ১৬নং আইন
৭.	The Dhaka University (Amendment) Bill, 1995.	৯/৭/৯৫	১৬/৭/৯৫	১৯৯৫ সনের ১৭নং আইন
৮.	নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) বিল,১৯৯৫।	১১/৭/৯৫	১৬/৭/৯৫	১৯৯৫ সনের ১৮নং আইন

একুশতম অধিবেশনঃ

১.	The Chittagong Port Authority (Amendment) Bill, 1995.	১০/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ১৯নং আইন
২.	The Mongla Port Authority (Amendment) Bill, 1995.	১০/৯/৯৫	১৬//৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ২০নং আইন
৩.	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বিল,১৯৯৫।	১১/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ২১নং আইন
৪.	International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (Amendment) Bill, 1995.	১২/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ২২নং আইন
৫.	The President's (Amendment) Bill, 1995.	১২/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ২৩নং আইন
৬.	The Companies Profits (Workers Participation) (Amendment) Bill, 1995.	১৩/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫সনের ২৪নং আইন
৭.	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল,১৯৯৫।	১৩/৯/৯৫	২০/৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ২৫নং আইন
৮.	The Special Security Force (Amendment) Bill, 1995.	২৪/৯/৯৫	২৭/৯/৯৫	১৯৯৫ সনের ২৬নং আইন

বাইশতম অধিবেশনঃ

১.	জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বিল,১৯৯৫	১৮/১১/৯৫	২০/১১/৯৫	১৯৯৫ সনের ২৭নং আইন

সূত্র ঃ *বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের (প্রথম থেকে বাইশতম) অধিবেশনের (১৯৯১ - ১৯৯৫) কার্যাবাহের সারাংশ,* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ-৬

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)

নির্বাচনী ঘোষণা

(নির্বাচন ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১)

শহীদ জিয়ার ১৯ দফার আলোকে এবারের নির্বাচনী কর্মসূচীঃ

দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত জিয়ার ১৯ দফা ওয়ারী নির্বাচনী কর্মসূচীর মধ্যে আছেঃ

১. **সাংবিধানিক ও প্রশাসনিকঃ**

২. দুর্নীতি মুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠা। প্রশাসন যন্ত্রকে গতিশীল ও দুর্নীতি মুক্তকরণ। সরকারী কর্মচারীদের জন-সেবায় নিয়োজিত করণ পদক্ষেপ গ্রহণ। শৃঙ্খলা ভংগকারী ও দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। সর্বপ্রকার কালা কানুন বাতিল করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৪. বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণ। সব দল ও মতের স্ব স্ব মতাদর্শ প্রচারে স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ।

৫. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। বিদেশী আগ্রাসনের হাত হইতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শহীদ জিয়ার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।

৬. নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ ও সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলা। প্রতিবেশী দেশ সমুহ, বিশেষতঃ মুসলিম দেশ সমুহের সংগে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন।

৭. প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠন পূর্বক উন্নয়নমুলক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় কার্য্যক্রমের গ্রাম পর্যায়ে দায়িত্ব প্রদান করা।

৮. সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ এবং গণ প্রচার মাধ্যম সমুহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. অনগ্রসর উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল সমুহের উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ।

১০. মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।

১১. শিক্ষাব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন পূর্বক ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। নিরক্ষরতা দুরীকরণ ও বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ণ। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সমাজের মুল ধারায় সংগে সম্পৃক্ত করণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১২. বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে সেশনজট রোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরীক্ষা সমুহ যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হইবার নিশ্চয়তা বিধান।

১৩. শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

১৪. দেশের বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পূর্বক সকলের জন্য অন্ততঃ মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

১৫. শ্রমিকদের অবস্থা উন্নতি সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুষ্ঠ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন।

১৬. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করণ।

খ) অর্থনৈতিকঃ

১. অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান-জনগণের এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ লওয়া।

২. মুক্ত ও প্রতিযোগিতা মুলক অর্থনীতি চালু এবং দেশী বিদেশী পূঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়ন।

৩. শিল্পায়ন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত হিসাবে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ।

৪. দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করণ এবং নারীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য কর্ম-সংস্থানমুখী প্রকল্প গড়িয়া তোলা।

৫. শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জরুরী ভিত্তিতে প্রতি বিভাগের একটি করে আধুনিক শিশু হাসপাতাল স্থাপন।

৬. মানব সম্পদের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের আনুপাতিক বৃদ্ধি ও দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি।

৭. বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করিতে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কৃষককে সহজ শর্তে ঋণ দানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং কৃষি ও সেচ কাজের সাহায্যার্থে বৈদ্যুতিক সংযোগের সুবিধা দেওয়া। গরীব চাষীদের ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ করা। খালকাটা প্রকল্প সমুহ পুনঃ চালু করণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. সড়ক-রেল-নৌ যোগাযোগ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের মত অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

Dhaka University Institutional Repository

যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণ।

৯. বেসরকারী খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও ইহার পক্ষে যাবতীয় বাধা ও জটিলতা দূরীকরণ।

১০. প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাধিক ও সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার দ্বারা আগামী ৪র্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক দ্রুত সম্পন্ন যোগ্য প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণ, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান, জনসংখ্যা রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১. জাতীয় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে যেমন বিদ্যুৎ, টেলিফোন, রেলওয়ে ও শিল্প ইউনিট সমূহে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিয়া দক্ষ ও গতিশীল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিযোগীতা সৃষ্টি ও জবাবদিহি করনের ব্যবস্থা নেওয়া।

১২. মুদ্রাস্ফীতি রোধে দ্রব্যমুল্য স্থিতিশীল রাখিবার দৃঢ় অথচ বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করতঃ জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল নিশ্চিত করা। ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩. বৈদিশিক মুদ্রার ঘাটতি পুরণে অপ্রচলিত পণ্য রফতানি বৃদ্ধিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমঘণ রপ্তানী স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান। অপ্রয়োজনীয় অথবা স্বল্প প্রয়োজনীয় ও বিলাস সামগ্রী আমদানী সীমিত করণ ও ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করণ।

১৪. বাংলাদেশে সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের পথ প্রশস্থ করণ।

১৫. শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের স্বল্পব্যয় অথবা বিনামুল্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান ও সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পূঁজি জোগান দিয়া আত্ম-কর্ম-সংস্থানে উৎসাহিত করিয়া বেকার সমস্যার সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৬. সুসম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াসের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিত করণ।

১৭. সকল ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের উৎসাহ প্রদান। অনুৎপাদনশীল ব্যয় ও অপচয় রোধ। সরকারী ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে কড়াকড়িভাবে বাজেটের নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা পূণঃপ্রতিষ্ঠা।

১৮. জাতীয় স্বার্থ ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন শর্তে বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি। অগ্রাধিকার খাত সমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহ দান।

১৯. উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ভূমিকার সঠিক মুল্যায়ন ও ইহাদেরকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো সক্রীয়ভাবে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রতিবন্ধকতার দূরীকরণ।

২০. উপরে বর্ণিত কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য এবং যত সত্ত্বর স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে বি, এন, পি আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ অনুৎপাদন খাতে ব্যয় হ্রাস এবং বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সম্পদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া এবং বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসুচীর আয়তন সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্জিত কর্ম সংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টি করিয়া সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সম্পদ বিতরণের পদক্ষেপ নেওয়া।

খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঃ

১. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আলোকে আমাদের সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো। দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাকে অব্যাহত গতিতে চালনা করিয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এদেশমুখী করা এবং বাংলাদেশী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিভা বিকাশের বাংলা একাডেমীর ভূমিকাকে আরও অর্থবহ করা।

২. জীবনের সর্বক্ষেত্র সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। সকল ধর্ম ও মতাবলম্বীদের তাহাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে চলিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান। ইহা ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ঘোষণা পত্র গঠনতন্ত্র ও পার্টি আদর্শ, পুস্তিকায় উল্লেখিত যাবতীয় কর্মকান্ডে জাতিকে উদ্বুদ্ধকরণ ও এই কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

খ) মানবাধিকারঃ

বি,এন,পি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণার পর্যায় ক্রমিক বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে এবং এই লক্ষ্যে বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ সমুহে বাংলাদেশকে পক্ষ করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বি, এন, পি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায় ক্রমিক বাস্ত বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

প্রশ্নমালা

গবেষণা শিরোনামঃ

খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নঃ একটি পর্যালোচনা''

(শূণ্যস্থান পূরণ করুন এবং প্রযোজ্য স্থানে (✓) টিক চিহ্ন দিন)

১. **ব্যক্তিগত তথ্যাবলী ঃ**

১.১ নাম ঃ ১.২ বয়স ঃ

১.৩ পেশা ঃ ১.৪ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

২. **রাজনৈতিক তথ্যাবলী ঃ**

২.১ আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

২.২ আপনি যদি কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য না হন তবে আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৩. **পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী ঃ**

৩.১ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯১ কি নিরপেক্ষ হয়েছে?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৩.২ "পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে'' তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রীর এ বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৩.৩ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পি'র জয় লাভের কারণ হিসেবে আপনি কি মনে করেন?

☐ খালেদা জিয়ার আপোষহীন নেতৃত্ব

☐ বি এন পি'র দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি আস্থা স্থাপন

☐ আওয়ামী লীগের অতীত শাসনের অভিজ্ঞতায় ভীতির কারণে

☐ অন্যকোন কারণে। ☐ ....

৪. **খালেদা জিয়ার প্রশাসন সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ**

৪.১ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া কি সফল হয়েছেন?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৪.২ যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে কেন সফল হয়েছে?

☐ প্রশাসনিক দক্ষতার গুণে ☐ রাজনৈতিক বিচক্ষনতার গুণে

☐ উপযুক্ত পরামর্শদাতার সাহায্যে ☐ আমলাদের সাহায্যে।

৪.৩ যদি উত্তর না হয় তবে কেন সফল হতে পারেন নাই?

☐ প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে ☐ রাজনৈতিক বিচক্ষনতার অভাবে

☐ উপযুক্ত পরামর্শদাতার অভাবে ☐ আমলাদের সহযোগিতার অভাবে

☐ অন্যকোন কারণে। ☐ ....

৪.৪ খালেদা জিয়ার প্রশাসনে দলীয় করণ ছিল-

☐ সর্বক্ষেত্র ☐ আংশিক ভাবে

☐ প্রয়োজন অনুযায়ী ☐ মোটেই না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ খালেদা জিয়ার শাসনামলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে-

☐ আশাতীত ☐ গড়পড়াতা

☐ আশানুরুপ নয় ☐ মোটাই নয়।

৪.৬ গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্নটি সরকার যথাযথভাবে মিমাংসা করতে পেরেছিল কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৪.৭ বি এন পি সরকারের পতন আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উঃ ☐ সরকার পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায়

☐ উপনির্বাচনে কারচুপির অপবাদে

☐ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যথাসময়ে না মানার কারণে

☐ কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে উথাপিত হওয়ায়

☐ ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার দাবি অনুযায়ী আওয়ামী লীগের ব্যাপক কারচুপির কারণে।

☐ সরকারী আমলা কর্মচারীদের বিরোধিতার কারণে

☐ ....।

৫. সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলীঃ

৫.১ সংসদীয় কার্যক্রমে সরকারী দল হিসেবে বি এন পি'র ভূমিকা কেমন ছিল?

উঃ ☐ গঠনমূলক ☐ নেতিবাচক

৫.২ সংসদীয় কার্যক্রমে বিরোধীদলের ভূমিকা কেমন ছিল?

উঃ ☐ গঠনমূলক ☐ নেতিবাচক

৫.৩ ৫ম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কি কেবল বিরোধীতার জন্য বিরোধিতা করতেন?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৫.৪ ৫ম জাতীয় সংসদ অকার্যকর করার ক্ষেত্রে কে দায়ী?

উঃ ☐ সরকারী দল ☐ বিরোধী দল ☐ উভয় দলই

৫.৫ বিরোধীদলের লাগাতার সংসদ বয়কট সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য হুমকি সৃষ্টি হয়েছিল কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৫.৬ সংসদ থেকে বিরোধী দলের 'পদত্যাগ' যথাযথ ও সময়োপযোগী ছিল কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৫.৭ তত্ত্বাবধায়ক সরকার " প্রশ্নে বিরোধী দলের ১৭৩ দিনের হরতাল পালন যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত ছিল কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৫.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু জাতীয় সংসদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব ছিল কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৫.৯ ৫ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারার জন্য দায়ী কে?

উঃ ☐ সরকারী দল ☐ বিরোধী দল ☐ উভয়ই।

৫.১০ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি অনিবার্য ছিল?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৫.১১ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হয়েছে কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৬. সংসদীয় গনতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী ঃ

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ সংসদীয় গনতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র স্থায়ীরূপ পেয়েছে কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৬.২ সংসদীয় গনতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন কোন দলের অবদান সবচেয়ে বেশী?

উঃ ☐ বি এন পি' ☐ আওয়ামী লীগ

☐ জাতীয় পার্টি ☐ সকল দলের

৬.৩ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনে বি এন পি'র ভূমিকা ছিল-

উঃ ☐ জাতীয় স্বার্থে ☐ দলীয় স্বার্থে

☐ ব্যক্তি স্বার্থে

৬.৪ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে কি?

উ ঃ ☐ 'হ্যাঁ' ☐ 'না'।

৬.৫ সার্বিক ভাবে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে-

উঃ ☐ আশাতীত ☐ গড়পড়তা

গড়পড়তার নীচে ☐ রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটেনি।

আপনার সাথে আলাপ করে খুবই উপকৃত হলাম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

সুপারভাইজারঃ

প্রফেসর এম, সাইফুল্লা ভূইয়া
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষকঃ

এস .এম, ওয়াহিদুজ্জামান বি, সি,এস (শিক্ষা)
(প্রভাষক রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
এম, ফিল ফেলো
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা
এবং
এম ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।